নৃত্যে-ভারত

মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরী

কথক নৃত্যের অধ্যাপিকা
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়।



প্রকাশক
রবি রায় চৌধুরী
২৯০ বি, বাঙ্গুর এভিনিউ,
কলিকাতা-৫৫

পরিবেশক
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর—১৯৬৮

প্রচ্ছদপট
শ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদ রায়

অলঙ্করণ
শ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদ রায়
শ্রীসুশীল সরকার
ও
শ্রীমান্ চন্দন রায়চৌধুরী

মুদ্রাকর
রণজিৎ কুমার সামুই
বাণীশ্রী প্রিণ্টার্স,
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা—৬।

উৎসর্গ

পরমপূজ্য বাবা ও মাকে—

মঞ্জু

ভূমিকা

আলোচ্য গ্রন্থটির লেখিকা শ্রীমতী মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী আমাকে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিতে বলেছেন বলে আমি খুশী হয়েছি। তাঁকে দক্ষ নৃত্যশিল্পের শিক্ষয়িত্রী হিসাবেই এতদিন জানতাম; তিনি যে অতিরিক্ত ভাবে নৃত্যশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তিলাভ করেছেন, জানতাম না। বর্তমান গ্রন্থখানি আমার ধারণায় এ বিষয়ে তাঁর অনন্য সাধারণ অধিকারের পরিচয় দেবে।

অতীতে নৃত্যচর্চা ভারতে ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্মের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হিসাবে বা বিশুদ্ধভাবে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসাবে, উভয়রূপেই তার স্বীকৃতি ছিল। এই চর্চার ফলেই ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতিকেন্দ্রে স্থানীয় মানুষের রুচি ও মতিগতি ভেদে এতগুলি বিভিন্ন রীতিব নৃত্য গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে তার চর্চা নানাকারণে শিথিল হয়ে এসেছিল। তবে সৌভাগ্যের কথা, তা আবার স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সেটা সম্ভব হয়েছে কয়েকজন গুণী নৃত্য সাধকের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত এবং সক্রিয় উৎসাহদানে। ফলে নৃত্যচর্চা এখন আর অপাংক্তেয় নয়, তা শিক্ষার অঙ্গ, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমেও তা সম্মানের আসন অধিকার করেছে।

নৃত্যশিল্পে অধিকার স্থাপন করতে একদিকে যেমন দক্ষ গুরুর প্রয়োজন, অপরদিকে ভাল পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন। বাংলাভাষায় এই ধরণের পাঠ্যপুস্তক যে একেবারেই রচিত হয়নি তা নয়, তবে উচ্চস্তরের ছাত্রদের জন্য গভীরতর ও ব্যাপকতর আলোচনা সমন্বিত গ্রন্থের অভাব এখনও দূর হয় নি। আমার মনে হয়, বর্তমান গ্রন্থখানি সেই অভাব পূরণ করবে।

আমার এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে আলোচ্যগ্রন্থের কিছু পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গ্রন্থখানি ষোলটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। তাতে নৃত্যশিল্পের নানা অঙ্গ আলোচিত হয়েছে। মোটামুটি দেখা

যায়, আলোচ্যবিষয়গুলি তিনটি মূল বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমভাগে অবশ্যজ্ঞাতব্য কতকগুলি নৃত্য সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য। এই বিভাগে আলোচিত হয়েছে নৃত্যের ইতিহাস, নৃত্য সম্পর্কিত মৌলিক চিন্তা, শিল্প হিসাবে নৃত্যের রসবিচার প্রভৃতি। তারপর দ্বিতীয় বিভাগে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্যের সঙ্গে সাধারণভাবে সংযুক্ত কতকগুলি বিষয়। যেমন নৃত্যে রূপসজ্জা, আঙ্গিক অভিনয়ের রীতি এবং বিভিন্ন হস্তমুদ্রার পরিচয়। তৃতীয় বিভাগে ভারতের বিভিন্ন নৃত্যরীতির পৃথকভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে যেমন ভারতের চারটি প্রতিষ্ঠিত নৃত্যরীতির বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন ওড়িষি নৃত্য এবং আধুনিক নৃত্য-রীতি সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আধুনিক নৃত্য আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যরীতির ও ব্যাখ্যা আছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখিকা শুধু তথ্য দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, যেখানে প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানে তুলনা-মূলক আলোচনা দিয়েছেন এবং অতিরিক্তভাবে বিভিন্ন মত সম্বন্ধে সমালোচনা করে নিজের মন্তব্যও স্থাপন করেছেন। মোটামুটি গ্রন্থখানিতে যেমন আলোচ্যবিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনার চেষ্টা হয়েছে, তেমন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টাও লক্ষিত হয়। এইখানেই এই গ্রন্থের উৎকর্ষ।

সুতরাং এমন আশা পোষণ করা অসঙ্গত হবে না যে, গ্রন্থখানি শিল্পরসিক সমাজে সমাদর লাভ করবে। যিনি শিক্ষার্থী তিনি যেমন উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এটি ব্যবহার করতে পারবেন, তেমন যিনি ভারতীয় নৃত্যসম্বন্ধে সবিস্তার জানতে ইচ্ছুক তিনি ও গ্রন্থখানি পাঠ করে উপকৃত হবেন।

রবীন্দ্রভারতী
১লা আষাঢ়, ১৩৭৫

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

আমার কথা

পৃথিবীর সভ্যতার উন্মেষের স্তরে স্তরে নৃত্যের বিকাশ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্ম, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতির সহিত নৃত্যের নিবিড় সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগে নৃত্য আংশিকভাবে চিত্তবিনোদনের জন্য করা হইয়া থাকে। অনেকে ইহাকে কলাবিদ্যা হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। অতি প্রাচীনযুগে ইহা ধর্মের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। সেইজন্য দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক সুসভ্য দেশগুলিতেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্যের প্রচলন ছিল। সুসভ্য দেশগুলির ভিতর মিশর ছিল অন্যতম। তাহার সভ্যতার নিদর্শন আজও মরুভূমির বুকে বিরাজ করিতেছে। মিশরে এইরূপ বহু দেবদাসী ছিল যাহারা শোভাযাত্রায় নানাপ্রকার উপচার বহন করিত এবং নৃত্য করিত। 'ক্রেটন্ কোরাসের' দলের গায়কগণ অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রীক দেবতা এ্যাপোলোর মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। রিয়ার সম্মানার্থে ফিজিয়ান্ কেরিব্যান্টিস্ করতাল ও ড্রামের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন। এমন কি, রোমানগণ যদিও চূড়ান্ত বিলাসী ছিলেন, তথাপি ধর্মানুষ্ঠান ব্যতীত নৃত্য দেখিতেন না। রোমে মার্সের বাৎসরিক উৎসবে স্যালির পুরোহিতগণ ভক্তিমূলক গীত ও নৃত্য করিতেন। ইহুদীদের ভিতরও মিরিয়াম্ ভক্তিমূলক গানের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন। এমন কি, খৃষ্টানদিগের ভিতরও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কার্পাস্ খৃষ্টি অক্টেভ্ ব্যালে কর্তৃক সিভিল গির্জায় নৃত্যগীতের আয়োজন করা হইত। ইহাতে বারো হইতে সতের বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকগণ অংশ গ্রহণ করিত। সুতরাং এইভাবে বিচার করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, সমগ্র বিশ্বে নৃত্যের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। ধর্মই নৃত্যকে এই মর্যাদার আসনে

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল এবং সকল প্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভারতের মত সুসভ্যদেশেও নৃত্যের একটি বিশেষ স্থান ছিল।

এ্যারিস্টটল্ নৃত্যের সৌন্দর্য দেখিয়া ইহাকে কাব্যের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের বিজয় কেতন দিকে দিকে জয়বার্তা ঘোষণা করিল। মানুষের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিল। ফলস্বরূপ ধর্ম হইতে নৃত্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সুতরাং ইহার সংযমের সেতুটি ভাঙ্গিয়া পড়িল। নৃত্যের এই রূপ দেখিয়া সমাজের বিভিন্ন সমালোচকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। শরীর বিজ্ঞানীরা বলিতে লাগিলেন, নৃত্য হইতেছে মানুষের দেহে পুঞ্জীভূত অতিরিক্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। ইহা একটি সুন্দর ব্যায়াম। মনস্তাত্ত্বিকগণ বলেন, ইহার দ্বারা মানবিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। দার্শনিকগণ বলেন, নৃত্যের ভিতর দিয়া পরমাত্মার প্রকাশ। নৃত্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কিন্তু কোন বিশ্লেষণই কার্যকরী হইয়া নৃত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত ধনী সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্যই নৃত্যের অস্তিত্ব রহিয়া গেল। মধ্যযুগে বিশ্বের সর্বত্রই নৃত্যের এইরূপ পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়।

মধ্যযুগে অভিজাত শ্রেণীর ভিতর বিলাস হিসাবে নৃত্যের প্রচলন হয়। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইএর ব্যালেতে অংশ গ্রহণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সময়ে পাশ্চাত্যে নৃত্য বিপুল জনসমাদর লাভ করে। যে সকল নৃত্য পাশ্চাত্যের বিভিন্নদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার ভিতর প্রাগের 'Polka', ব্যাভেরিয়ার 'Waltz', দক্ষিণ আমেরিকার 'Tango' প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারা যায়। সামাজিক নৃত্য বলিতে বলরুম্ নৃত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের সান্নিধ্যলাভের অপার সুযোগ দেওয়া হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যালে নৃত্য সমগ্র

বিশ্বে খ্যাতিলাভ করে। নিঝিনিস্কি, পাভলোভা, কার্সাভিনা প্রভৃতি ব্যালে নর্তক-নর্তকী হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

ভারতীয় নৃত্যের বিবর্তনও এইরূপভাবে হইয়াছে। আমি আলোচ্যগ্রন্থে ঐতিহাসিক পটভূমিতে ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্নস্তর অতিক্রমণ ও বিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

পিতামাতা ও স্বামীর অনুপ্রেরণায় আমি এই পুস্তকটি লিখিতে আরম্ভ করি। বিশেষ করিয়া আমার পিতার (শ্রীসোমনাথ ভাদুড়ীর) প্রেরণা, উৎসাহ ও অভয়বাণীর কথা স্মরণ করিয়া আমি শত বাধা সত্ত্বেও আট বৎসর পূর্বে এই কার্যে লিপ্ত হই। আমার স্বামীর (শ্রীরবি রায় চৌধুরীর) অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই কার্য আমার পক্ষে আরও সহজ হইয়া উঠে। শ্রীবঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় পুস্তকটির আবয়বিক গঠন সম্বন্ধে সদুপদেশ দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। আমার কাকার (শ্রীসদানন্দ ভাদুড়ী, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ) নিকট কয়েকটি অমূল্য উপদেশের জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সংস্কৃত গ্রন্থগুলি হইতে অনুবাদ করিতে, প্রুফ দেখিতে এবং কোন কোন স্থানে ভাবগুলিকে পরিস্ফুট করিতে তিনি আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সর্বশ্রী নদীয়া সিং, গোবিন্দন্ কুট্টী, মরুথাপ্পা পিল্লাইয়ের নিকট যথাক্রমে মণিপুরী, কথাকলি ও ভরতনাট্যম্ নৃত্যের আবয়বিক গঠন সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। আমার মণিপুরী নৃত্যের শিক্ষাগুরু শ্রীনদীয়া সিং মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলোচনা করিয়া আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন। রেখাঙ্কনে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ রায় ও শ্রীসুশীল সরকার। আমার পুত্র শ্রীমান চন্দন কর্তৃকও হস্তভেদের কয়েকটি মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছে। বালিকা শিক্ষা সদনের গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে গ্রন্থা-

গারের পুস্তকগুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে দিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া আমাকে যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। চারুকলা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহানুভূতি ও উৎসাহ আমাকে বিশেষ প্রেরণা দিয়াছে। পুস্তকটিতে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে যাহা বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও আমি এড়াইতে পারি নাই। আশা করি, পাঠকগণ নিজগুণে এই ত্রুটিগুলি ক্ষমা করিবেন।

মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী

সূচীপত্র

নৃত্যের ইতিহাস



"সর্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্বশিল্প-প্রবর্তকম্।
নাট্যাখ্যং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্॥"

নৃত্যের ইতিহাস

ভারতের মাটীর অনুতে অনুতে নৃত্যের ছন্দ দোলা দেয়। বিভিন্ন জাতির সমাবেশ, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন পরিবেশ সত্বেও ভারতবাসীর সঙ্গীতপ্রিয়তা আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিছুমাত্র কমে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। চারুকলা সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলিতেছে, ফলস্বরূপ বর্ত্তমান যুগে বহু কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত চেষ্টায় গবেষণার কার্য্য অগ্রসর হইতেছে।

প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নৃত্যকলা সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজিতে হইলে হয়ত আমরা পাইব না। কিন্তু ইহার উপাদান ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। পাথরের গাত্রে, শিলালিপি, তাম্রফলক, পাণ্ডুলিপি মন্দিরের গাত্রে খোদিত মূর্তি, লিপি ও বাদ্যযন্ত্রগুলি নিশ্চল নীরব ভাষায় শতাব্দীর সাক্ষ্য বহন করিয়া আসিতেছে। ইহাদের কেবলমাত্র দেখিয়া, অনুভব করিয়া এবং প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র ও ঐতিহাসিক নৃপতিগণের সাংস্কৃতিক পরিচয় লইয়া ইতিহাস রচনা করিতে হইবে, সুতরাং ইতিহাস সম্পূর্ণ নির্ভুল না হইলেও ইহাতে নৃত্যের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিকতা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি।

ভারতের ইতিহাস রচনার কাল হইতে আধুনিক কালকে কয়েকটি যুগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম হইতেছে প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ। প্রস্তর যুগ, ধাতুযুগ, সিন্ধুনদের সভ্যতা প্রভৃতিকে আমরা এই যুগের অন্তর্গত করিতে পারি। ইহা অন্ধকারে আবৃত। ইহার

বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সেই যুগের নৃত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না।

প্রস্তরযুগে মানুষের আদিম উল্লাসের প্রকাশ ছিল নৃত্য। সে নৃত্য কোন শাস্ত্র মানিত না, তাহাতে কোন তাল লয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিও ছিল না। ছিল শুধু ছন্দে ছন্দে প্রাণের উল্লাস ও মনের বৃত্তিগুলিকে প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা। কোন গান ছিল না, কোন ভাষা ছিল না, ছিল শুধু অভিব্যক্তি। এইভাবে প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির খেয়ালখুশীর শিকার ভাষাহীন, অসহায় মানুষ নিজ মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করিত নৃত্যের ভিতর দিয়া। ইহাই নৃত্যের আদিম অবস্থা। ইহাই লোকনৃত্য এবং শাস্ত্রীয় নৃত্যের বীজ, সুতরাং আমরা সহজেই বলিতে পারি যে, নৃত্য হইতেছে মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তির আঙ্গিক প্রকাশ। আদিম অসভ্য যুগ হইতে মানুষের ক্রমবিবর্তনের সহিত প্রকাশ ভঙ্গিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতবাসী যে চিরকাল নৃত্যকলাকে বিশেষ ভালবাসিয়াছে এবং প্রাধান্য দিয়াছে তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জদরো ও হরপ্পায় যে সকল ভগ্নস্তূপ পাওয়া গিয়াছে তাহার ভিতর একটি নর্তক ও নর্তকীর মূর্তিও আছে। ইহা ব্যতীত সাতটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশী, তন্ত্রীযুক্ত বীণা, বিভিন্ন চামড়ার বাদ্যযন্ত্রও পাওয়া গিয়াছে। সেই যুগের সঙ্গীত বিষয়ে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না। তবে নৃত্যের সহিত যে বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার প্রচলন ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই যুগের অধিবাসীগণ নাগরিক জীবন অতিবাহিত করিতেন এবং সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইঁহারা ছিলেন শঙ্কর ও কালীর উপাসক অর্থাৎ মূর্তি পূজার উপাসক। শুধু ইহাই নহে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহু প্রাচীন নাগজাতি বসবাস করিতেন। ইঁহারা বৃক্ষ ও শিবের পূজা করিতেন। মহেন-জো-দড়োর শীলমোহরে বৃক্ষকে আবেষ্টন করিয়া

নাগদম্পতির উৎকীর্ণ মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই যুগে বৃক্ষ, সর্প, জীবজন্তু পূজার প্রচলনও ছিল।

ভারতের আদিবাসী সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডাগণকে প্রস্তরযুগের মানবের বংশধর বলিয়া মনে করা হয়। যদিও পৃথিবীর বিবর্তনের সহিত আকৃতি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি অনেক বিষয়ে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইঁহাদের নৃত্যকে মনোবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত আঙ্গিক বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। দ্রাবিড় যুগের নৃত্যকলা সম্বন্ধে কোন অনুমানই চলে না। তবে ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে, নৃত্যের সহিত সঙ্গীত সহযোগিতা করিত এবং পায়ে মল জাতীয় গহনা তালরক্ষা করিত। নৃত্যের সাহায্যে দেব-দেবীরও পূজা হইত। ইহার সাক্ষ্য দেয় শঙ্কর এবং অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তিগুলির নৃত্যভঙ্গিমা। দ্রাবিড়গণের এইরূপ সঙ্গীত, শিল্পকলা ও চিত্রকলার প্রতি আসক্তি দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা শিক্ষায় উন্নত ও সভ্য শিল্পী ছিলেন। পাশ্চাত্যগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীগণ উদ্দীপ্ত, ভাবপ্রবণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বটে, কিন্তু বর্ণ ও সৌন্দর্যের উপাসক। অবশ্য ইহা শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে! ভারতের সমসাময়িক মেসোপটেমিয়া ও স্থমের সভ্যতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই যুগে যে এইসকল দেশেও নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে দেশে সভ্যতা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল, সেই দেশে শিল্পকলার চর্চা এবং সঙ্গীতপ্রিয়তাও প্রবল ছিল, অধিবাসিগণও উন্নত নাগরিক জীবন অতিবাহিত করিতেন।

ইহার পরবর্তী যুগকে আমরা বৈদিক যুগ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বে আর্যগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাবের নিকটবর্তী স্থানে দ্রাবিড় সভ্যতাকে ধ্বংস ও

দ্রাবিড় জাতিকে বিতাড়িত করিয়া বসতি স্থাপন করেন। সেই সময় আর্য ও অনার্যদিগের ভিতর প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ইতিহাস আমরা প্রাচীন কাব্যে, মহাকাব্যে, পুরাণ প্রভৃতিতে পাই। এমন কি প্রথম যে নাটক মঞ্চস্থ হইয়াছিল, তাহার বিষয়বস্তুও ছিল দেবাসুরের যুদ্ধ। দেবতা ও দানবগণই যথাক্রমে আর্য ও অনার্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। অবশ্য পরবর্তীযুগে আর্য ও অনার্য সভ্যতা এমন পরস্পর মিলিয়া গিয়াছিল যে, ইহার প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। "দেবায়তন ও ভারত সভ্যতায়" ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা আছে—"বৈদিক যুগের শেষভাগে সূত্রের যুগে ভারতে মূর্তি পূজার সূত্রপাত হয়। অনার্য প্রভাবিত ব্রাহ্মণ্য ভারতে তাহার বিকাশ এবং বিস্তার। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে শিল্পের পর্যায়ে তক্ষণ ও ধাতুমূর্তি, কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত এবং নৃত্যকেই বুঝাইত" (পৃঃ-২৩)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রণেতা মহর্ষি ঐতরেয়ের কল্যাণে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলনে চৌষট্টিকলার সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহাই হউক, এই সময় আর্যগণ বেদের সংস্কার করেন। এই বেদ ভারতবাসীর জীবনে সঞ্জীবনী সুধার কাজ করিয়াছে। 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'তে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলিয়াছেন—"ভারতীয় শিল্প ও মাধুর্য্যের বিকাশের পিছনে আছে সুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদের সাহিত্যের প্রেরণা।" বেদের দর্শন ভারতীয়দের কর্মে প্রেরণা জাগাইয়াছে, শান্তির বাণী শিখাইয়াছে, সৌন্দর্যের উপাসক করিয়াছে এবং শিল্প ও সঙ্গীতের জ্ঞান দিয়াছে। বৈদিক যুগের সঙ্গীত পরবর্তী যুগের সঙ্গীতকে প্রেরণা দিয়াছে। সামবেদ হইতে সামগানের সৃষ্টি হইয়াছে। 'সামে'র অর্থই হইল গান। সঙ্গীতের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে বেদের সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত। বেদ চারিটি ভাগে বিভক্ত—ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। প্রত্যেক বেদের তিনটি অংশ—(১) মন্ত্র অথবা সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ(৩) আরণ্যক ও উপনিষদ। সংহিতাতে দেবতাগণের স্তুতি করিয়া মন্ত্র আছে অর্থাৎ বৈদিক ঋক-এর

সঙ্কলন করা হইয়াছে। 'ব্রাহ্মণে' কর্মকাণ্ডের উল্লেখ আছে, 'আরণ্যকে' দার্শনিক তথ্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং উপনিষদে আত্মজ্ঞানের কথা আছে। বেদের এই সকল শাখাগুলিকে শিক্ষার জন্য যে ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে প্রাতিশাখ্য বলে। ছন্দোগ্য উপনিষদে গান, বাদ্য ও নৃত্যের উল্লেখ আছে। প্রাতিশাখ্যে তাল, লয়, মাত্রা ও ছন্দ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। চারটি বেদ হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি। সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে আছে যে, সত্যযুগ অতীত হইবার পর ত্রেতা-যুগের প্রারম্ভে জনগণ অধর্ম আচরণের ফলে দুঃখ পাইতেছে দেখিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রধানতঃ শূদ্র ও স্ত্রীগণের শিক্ষার জন্য পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করেন। কারণ, বেদ অধ্যয়নে শূদ্র ও স্ত্রীগণের অধিকার ছিল না। তদনুসারে ব্রহ্মা ঋকবেদ হইতে পাঠ্য, সামবেদ হইতে গান, যজুর্বেদ হইতে অভিনয়, এবং অথর্ববেদ হইতে রস গ্রহণ করিয়া নাট্যবেদ সৃষ্টি করিলেন। ইহা পঞ্চম বেদ বলিয়া অভিহিত হইল এবং ইহাতে সর্বজনের সমান অধিকার রহিল। সুখভোগে অভ্যস্ত দেবগণ নাট্যবেদের গ্রহণ, ধারণ ও জ্ঞান প্রয়োগে অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়, ইন্দ্র এ বিষয়ে ঋষিগণের উপযুক্ততার উল্লেখ করেন। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা, ভরত মুনিকে নাট্যবেদের প্রথম উপদেশ প্রদান করেন এবং ভরত মুনি ব্রহ্মার আদেশে তাঁহার শত পুত্রকে ইহা শিক্ষা দেন। আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভরত উপরোক্ত কাহিনীটি বিবৃত করেন। তিনি একাধারে দেবতাগণের মঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যকার, ত্রৈযত্রিক ও সূত্রকার ছিলেন। ভরত তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা এই নৃত্য মর্তে প্রচার করেন। 'অভিনয় দর্পণে' আছে যে, পুরাকালে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ভরতকে নাট্যবেদ প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার পর ভরত গন্ধর্ব, অপ্সরাগণসহ শম্ভুর সম্মুখে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অনন্তর হর স্বপ্রযুক্ত হইয়া উদ্ধত

প্রয়োগ স্মরণ করিয়া স্বগণের অগ্রণী তণ্ডুর দ্বারা ভরতকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং প্রীতিবশতঃ পার্বতীর দ্বারা লাস্যের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তণ্ডুর নিকট হইতে তাণ্ডবের জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ উহা মর্তে শিক্ষা দেন। বাণরাজ-দুহিতা উষা—পার্বতীর নিকট লাস্য শিক্ষা করিয়া দ্বারাবতীর গোপীগণকে, গোপীগণ সৌরাষ্ট্র দেশের রমণীগণকে এবং এই রমণীগণ অন্যান্য দেশের নারীগণকে শিক্ষা দেন। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, নাট্যশাস্ত্রের মূল উপাদান বেদ।

বৈদিক যুগে যে নৃত্য-গীতের বিশেষ প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যজ্ঞের সময় উদ্গাত্রীগণ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যজ্ঞবেদী পরিক্রমণ করিতেন। অনেক সময় পুরনারীগণ এই পরিক্রমণে যোগদান করিতেন। প্রজ্ঞানন্দ স্বামী ইহাকে সমবেত নৃত্যের প্রথম সূত্রপাত বলিয়াছেন।

বৈদিক যুগে মুনি-ঋষিগণ যজ্ঞমণ্ডপ নির্মাণ করিয়া হোম করিতেন। গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। উদাত্ত কণ্ঠে সুরের লহরী তুলিয়া তাঁহারা দেবতার স্তুতি করিতেন। কখনও পাঠ্যে, কখনও সঙ্গীতে, কখনও স্বর্গীয় রসধারায় প্লাবিত হইয়া তাঁহারা বেদ গান করিতেন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যগুলিতে আছে যে, সামগগণ যখন গান করিতেন—পুরনারীগণ করতালি দিয়া নৃত্য করিতেন। সামগগণের গানের সঙ্গে নর্তকগণ বংশদণ্ড উন্নত করিয়া নৃত্য করিতেন। যজ্ঞাদি উৎসবের পর অবভৃথস্নান নামে একটি উৎসব হইত। এই উৎসবে রাজা ও রাণীর সঙ্গে পুরুষ ও নারী উভয়েই নৃত্য-গীত-বাদ্যের সহিত স্নান করিতে যাইতেন। কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতা সংবাদে নৃত্য ও গীতের উল্লেখ আছে।

দ্রাবিড় যুগে মানুষ নাগরিক জীবন অতিবাহিত করিত; কিন্তু বৈদিক যুগে মানুষ গ্রাম্যজীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

এবং সমস্ত সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাব দেখা ছিল। ইহার কারণ, আর্যগণ প্রাকৃতিক আশ্চর্য লীলাশক্তি অনুভব করিয়াছিলেন। আর্যগণ প্রাকৃতিক মহাশক্তির অমিত তেজ গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করিলেন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বশক্তি এবং সকল দেবদেবী সেই পরমপিতা পরমব্রহ্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এবং ইহাও প্রচার করিলেন যে, সৌরমণ্ডলের প্রধান প্রধান দেবতা সূর্য. বৃষ্টি, বজ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি পরমব্রহ্মের বিকাশ। সেই জন্য অগ্নিদেবকে পরিক্রমা করিয়া অথবা করতালি দিয়া অথবা বংশদণ্ড উন্নীত করিয়া নৃত্যের প্রচলন হইল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ও বৈদিক যুগে কী ধরণের নৃত্য প্রচলিত ছিল, তাহার কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু বুঝা যায় যে, সঙ্গীতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নৃত্য হইত।

ইহার পর মহাকাব্যের যুগ। ইহার সঠিক নির্দিষ্ট সময় নিরূপণ করা যায় না। এই বৈদিকোত্তর যুগে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, পুরাণ প্রভৃতিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। 'কুশী লব' কথাটি রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের যমজ পুত্র কুশ ও লবের নাম হইতে আসিয়াছে। কুশ ও লব মহাকবি বাল্মীকির অমর কাব্য 'রামায়ণ'কে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয়ের সাহায্যে অযোধ্যার রাজসভায় শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে নিবেদন করিয়াছিলেন এবং এই অমৃতধারা প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত করিয়াছিল। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে "কুশীলবের' অর্থ করা হইয়াছে নট অথবা চারণ। মহাভারতে নৃত্যের বহু উল্লেখ আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ও হরিবংশে আসারিত নৃত্যের যে বিবরণ আছে, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যে তাহার উল্লেখ আছে। ইহা ব্যতীত 'হল্লীসক' 'ছালিক্য' প্রভৃতি নৃত্যের উল্লেখও আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের নৃত্যসভার সুন্দর বর্ণনা আছে এবং এই নৃত্যসভায় অপ্সর অপ্সরা, কিন্নর-কিন্নরীগণ

নৃত্য প্রদর্শন করিতেন। বৃহন্নলা কর্তৃক রাজকন্যা উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা দিবার বর্ণনা আছে। রামায়ণ মহাভারতের যুগে নৃত্যের স্বরূপ যে কিরূপ ছিল তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। তবে নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং তাহা যে সর্বশ্রেণী কর্তৃক সমাদৃত হইত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে বৈদিক ও মহাকাব্যের যুগে সামাজিক ও ধর্ম সংক্রান্ত পরিবর্তন সুরু হইয়া গিয়াছিল। বৈদিক সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্মে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন ঘটিতে সুরু হইয়াছিল। শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবায়তন ও ভারত সভ্যতাতে' আছে যে এই সময় হইতে যক্ষ, যক্ষী, মনসা প্রভৃতির উদ্ভব হয়। ধর্মক্ষেত্রে উভয়জাতির মিলনের ফলে হিন্দু-জাতি ও সভ্যতার উন্মেষ। আর্য ও অনার্য সংস্কৃতি ও শিল্পের মিলনের ফলে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের উন্মেষ।' এই সকল স্থাপত্য-শিল্প নৃত্যের ইতিহাস রচনায় অমূল্য সম্পদ। সিন্ধু দ্রাবিড় সভ্যতার সহিত অসুর অর্থাৎ অষ্ট্রীক ও বৈদিক সভ্যতার মিশ্রণের ফলে রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদের সৃষ্টি এবং যজ্ঞ ও পূজার প্রচলন হইয়াছিল।

মহাকাব্যের যুগে জাতিপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিভাগে মনুষ্য সমাজ বিভাজিত হইয়াছিল। এই যুগে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল এবং কোন পর্দাপ্রথা ছিল না।

মহাকাব্যের যুগে বৈদিকযুগের দেবতাদিগের প্রাধান্য কমিয়া গিয়াছিল। বৈদিক যুগের প্রাকৃতিক দেবতাগণের পরিবর্তে দেব-দেবী স্থানলাভ করিয়াছিলেন। বৈদিকযুগের একেশ্বরবাদের পরিবর্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাগণের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কাশী, কোশল, মগধ, বিদেহ প্রভৃতি রাজ্যের স্থাপনা হইয়াছিল।

পূর্বদিকে অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি রাজ্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সকল নামগুলি পরবর্তীযুগে নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই উপরোক্ত দেবতাগণ সঙ্গীতেও বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে শঙ্কর নৃত্যের জনক বলিয়া পূজিত হন। পূর্বরঙ্গে আর্য, অনার্য ও বৈদিক দেবতাগণকে নৃত্যের প্রারম্ভে পুষ্পাঞ্জলি ও নমস্কার করিবার বিধি আছে।

মহাকাব্যের যুগের পর ভারতের এক যুগসন্ধিক্ষণ। এই সময় চীন, ভারতবর্ষ, ইরাণ, গ্রীস সর্বত্র ধর্ম এবং সমাজ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সেই মহাসন্ধিক্ষণে সমাজ-সংস্কারক, ধর্মসংস্কারক, দার্শনিক ও চিন্তাবীরদিগের আবির্ভাব ঘটে। ধর্মসংস্কার, দর্শন প্রভৃতির সহিত সঙ্গীতও একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। যদিও ধর্মযুদ্ধ চলিতেছিল, তথাপি সঙ্গীত সকল ধর্মেই প্রিয় ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, হিন্দুধর্মে ও বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীতের স্থান ছিল। তবে হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ ও যাগযজ্ঞ, পশুবলি বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত যেন সমাজ হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণগণ সঙ্গীতকে অপাংক্তেয় করিয়া তুলিলেন। ইহা কেবলমাত্র শূদ্র প্রভৃতি জাতির ভিতর সীমাবদ্ধ হইল। ইহার কারণ ব্রাহ্মণগণ সকল কোমল বৃত্তিকে দমন করিয়া কেবলমাত্র শুষ্ক আচার বিচার লইয়াই রহিলেন। ললিতকলার উৎস হইতেছে সুকুমার বৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধ। যখনই এক বিশেষ শ্রেণীর ভিতর ইহার অভাব হইল, তখনই সেই স্থান হইতে সঙ্গীত দেবী নির্বাসিতা হইলেন। মনুসংহিতায় মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ইহা ব্রাহ্মণদিগের জন্য নহে। এই কঠোর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল বৌদ্ধধর্ম। ব্রাহ্মণ্যধর্মের হিংসার বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধর্মের ক্ষেত্রে ও শাসনের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনিল।

১) বিহার, ২) উত্তর বাংলা

সমাজে একটি প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হইলেও সঙ্গীতের প্রতিপত্তি অপ্রতিহত রহিল এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল।

জাতকে সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতকে বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের ইতিহাস আছে। এই জাতকগুলি তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, কৃষ্টি প্রভৃতির উপর আলোকপাত করে। নৃত্যজাতকে আছে যে, নৃত্যের ছন্দ-পতন হওয়াতে ময়ূর হংসরাজ-কন্যার স্বামী হইতে পারিল না। ইহা ব্যতীত মৎস্য জাতক, গুপ্তিল জাতক, ভেরীবাদক জাতক ইত্যাদিতে নৃত্যগীত, বাদ্য ও অভিনয়ের উল্লেখ আছে। জাতক হইতে এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নৃত্য ও গীতের প্রতিযোগিতা হইত। কিন্নর, কিন্নরী, অপ্সর, অপ্সরা, নট-নটী, দেবদাসী প্রভৃতি নৃত্য, গীত ও বাদ্য-পটীয়সীগণের কথা তৎকালীন সাহিত্যে বিশেষ স্থানলাভ করিয়াছিল। আমরা আম্রপালি প্রভৃতি নটীগণের কথা জানিতে পারি, যাহারা সামাজিক পীড়নে নটী-জীবন গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবে তাহারা নটী-জীবন ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। থেরিগাথা অথবা থেরগাথাতে নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে। জাতকে নটীগণের জীবনী লইয়া বহু কাহিনী আছে। অবদান শতকে নটী 'শ্রীমতী' বোধিস্বত্বা-বদান কল্পলতায় নটী বাসবদত্তা, মহাবস্তুবদানে সুন্দরী প্রধানা শ্যামার উল্লেখ আছে। সঙ্গীত এই সময় একটি বিশেষ শ্রেণীর ভিতর প্রচলিত ছিল এবং তাহারা নট-নটী আখ্যা লাভ করিয়াছিল।

পাণিনির ব্যাকরণে সঙ্গীতকার শিলালি ও কৃশাশ্বের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা নটশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সঙ্গীত ইঁহাদের পেশা ছিল। পাণিনির সময় নির্ধারণ লইয়া বহু মতবিরোধ আছে। পণ্ডিত সমশ্রেয়ী পাণিনির সময় নির্ধারণ করিয়াছেন খৃষ্টজন্মের ২৩০ বৎসর পূর্বে। জার্মাণ পণ্ডিত বুহ্লার কথাসরিতের উপর ভিত্তি করিয়া পাণিনির সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসর পূর্বে। ভাষ্যকার পতঞ্জলি তাহার মহাভাষ্য কংসবধ ও বালিবধ নামক দুইটি নাটকের উল্লেখ করেন।

ইহাতে নৃত্য গীতের উল্লেখ আছে। সুতরাং নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের বহুল প্রচার না থাকিলে সংগীত তদানীন্তনকালের সাহিত্যে ও ব্যাকরণে স্থান পাইত না। পতঞ্জলির উদ্ভবকাল অনুমান করা হয় খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে। যাহা হউক, বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিকাল অনুমান করা হয় খৃঃ পূঃ ছয় শতকে।

এই সময় উত্তর ভারত অনেকগুলি ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল যাহাদিগকে 'মহাজনপদ' বলা হইত। এইগুলি হইতেছে কাম্বোজ, গান্ধার, পাঞ্চাল, কুরু, সুরসেন, মৎস্য, কোশল, কাশী, মগধ, অঙ্গ, বৎস, চেদি, অবন্তি, অস্মক, বজ্জী ও মল্ল। ইহার ভিতর কয়েকটি মহাজনপদ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। গান্ধার দেশ সঙ্গীতের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা ব্যতীত নাট্যশাস্ত্রে দেশাচার হিসাবে চারপ্রকার অভিনয়ের ধারা বর্ণিত আছে। সুতরাং পূর্ব হইতে এই সকল রাজ্যে সঙ্গীতের প্রচলন ছিল, যাহাকে ভরত দেশী সঙ্গীত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভরত এই চারটি ধারাকে বলিয়াছেন—দাক্ষিণাত্য, আবন্ত, ঔড্র্মাগধী ও পাঞ্চাল-মধ্যম। দাক্ষিণাত্য, কোশল, কলিঙ্গ, দ্রাবিড় এবং মহারাষ্ট্র অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ, অর্থাৎ ভারতের দক্ষিণপূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিম অংশ প্রথম ধারাটি (style) অবন্তী, বিদিশা, সৌরাষ্ট্র মালয়া, সিন্ধু অর্থাৎ মধ্য ও পূর্বাংশের অধিবাসিগণ দ্বিতীয় ধারাটি, অঙ্গ, বঙ্গ, বৎস, মগধ, পুণ্ড্র, নেপাল, অন্তগিরি, বাহিরগিরি, মল্লবর্ষ, ব্রহ্মহত্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, বিদেহ ও তাম্রলিপ্তের অধিবাসিগণ তৃতীয় ধারাটি এবং পাঞ্চাল, সুরসেন, কাশ্মীর, হস্তিনাপুর, বহ্লীক, মদ্র চতুর্থ ধারাটি অনুসরণ করিত। ইহা ব্যতীত নাটকে আরও পাঁচ প্রকারের অন্ত্যজ-জাতির ভাষা ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক বিবরণ···গান্ধার—আফগানিস্থান, দক্ষিণাপথ—দাক্ষিণাত্য, কোশল—অযোধ্যা হইতে বারাণসীর উত্তর পর্য্যন্ত, দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র—বোম্বাই প্রদেশ, অবন্তী—আধুনিক উজ্জয়িনী, বিদিশা—আধুনিক বেরার, সৌরাষ্ট্র—গুজরাট, মালয়া—উজ্জয়িনী পূর্বপ্রান্ত।

যথা—সবরী, আভরী, চাণ্ডালী, শকারী এবং দ্রাবিড়ী। সুতরাং সেই যুগে ভারত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ও আত্মকলহে লিপ্ত থাকিলেও প্রত্যেক রাজ্যই সঙ্গীতের সমাদর করিত।

ইহাদের ভিতর মগধ রাজ্যটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ইহার প্রথম রাজা ছিলেন বিম্বিসার। ইনি যে রাজবংশের সূচনা করিয়াছিলেন তাহা মৌর্য্যবংশ বলিয়া পরিচিত। খৃঃ পূঃ ৩২০ হইতে ১ম শতাব্দী পর্যন্ত মৌর্যগণ রাজত্ব করেন। মৌর্যরাজাদিগের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। সেইজন্য সেই সময় বহু থের-থেরীদিগের গাথা প্রভৃতি রচিত হয় এবং তাহাতে নৃত্য গীতের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। মৌর্যদিগের শেষ রাজা অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য দেশবিদেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। ইহার ফলে ভারতের সহিত অন্যান্যদেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় হইয়াছিল। বৌদ্ধশ্রমণ, ভিক্ষু ও শ্রেষ্ঠীগণের সাহায্যে এই বিনিময় ব্যাপকতা লাভ করে।

মৌর্যবংশের পতনের পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার ভিতর উত্তর ভারতের শুঙ্গবংশ, কাম্ববংশ এবং দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন বংশ, চেদি বংশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

মৌর্য্যবংশের পর শুঙ্গবংশীয়গণ রাজত্ব করেন। ইঁহাদের রাজত্বকালে সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত ছিল।

শুঙ্গবংশের পতনের পর কাম্ববংশের উদ্ভব হয়। শুঙ্গবংশীয় রাজগণ ২নং সাঁচিস্তুপের নির্মাণ শুরু করেন এবং কাম্ববংশীয় রাজগণের সময় বারহুত নির্মিত হয়।

দক্ষিণের সাতবাহন বংশ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভরত নাট্যমের ইতিহাস আলোচনা

সিন্ধু—সিন্ধু, অঙ্গ—ভাগলপুর জিলা, বঙ্গ—বাংলা, বৎস—বৎস রাজের রাজত্ব, অযোধ্যার অন্তর্গত কৌশিম্বী ইহার রাজধানী।

করিবার সময় ইহার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। মৌর্যবংশ পতনের পর দাক্ষিণাত্যে এই বংশের উদ্ভব হয়।

এই সময় উত্তর ভারত বিদেশী দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রথমতঃ গ্রীনীয়নগণ ভারত আক্রমণ করেন এবং ইহার পর শকগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া রাজত্ব করেন। শকগণের পর পার্থিয়ানগণও রাজত্ব করেন। এইরূপে উত্তরভারত, ইতিহাসের সূচনা হইতেই, বারম্বার বিদেশীগণ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ইহার পর চীনের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে ইউচীগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া রাজত্ব করেন। ইহারা কুষাণবংশীয় বলিয়া পরিচিত। কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্ক সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার সময় অশ্ব ঘোষ নাগার্জ্জুন প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার ছিলেন।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সভ্যতার প্রথম যুগে জনসাধারণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিতর নৃত্য বিশেষ প্রিয় ছিল।

ইহার পর গুপ্তযুগের সূচনা। ৩২০ খৃঃ হইতে ৪৬৭ খৃঃ পর্য্যন্ত গুপ্তযুগের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের প্রথমার্ধ ঐশ্বর্যে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। সঙ্গীতের যে বিশেষ প্রসার ছিল তাহা তৎকালীন মুদ্রা, ভাস্কর্য্য ও সাহিত্য হইতে জানা যায়। সমুদ্রগুপ্তের সময় সমাজে স্ত্রী ও পুরুষগণ স্বাধীন ভাবে নৃত্য ও গীতের চর্চা করিতে পারিতেন। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ও সঙ্গীত সমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হইত। ফা-হিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে গুপ্তযুগের শিল্প ও সংস্কৃতির বিবরণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ৭ম, ৮ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে বহু

মগধ—বিহার, পুণ্ড্র—উত্তর ভারত, অস্তগিরি ও বাহিরগিরি—উড়িষ্যা, মল্লবর্ষ—মালদহ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—কামরূপ, বিদেহ—প্রাচীন মিথিলা, তাম্রলিপ্ত—মেদিনীপুর জেলার তমলুক। পাঞ্চাল—মিরাট জেলা। সুরসেন—মুত্রা জেলা, মদ্র—মাদ্রী। বহ্লীক—ব্যাকট্রিয়ার প্রদেশসমূহ।

গুণী, জ্ঞানী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় পৃথিবী বিখ্যাত অজন্তা, ইলোরার গুহাগুলি নির্মিত হয়। ইহা হইতে তৎকালীন শিল্পকলার একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

গুপ্ত রাজত্বের সময় হুণদিগের আক্রমণ সুরু হইয়াছিল। এই সকল বৈদেশিক আক্রমণ ইতিহাসে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ, ভারতীয় নৃত্যের আলোচনাকালে দেখা যায় যে, ভারতের দুই অঞ্চলের ভিতর একটি ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার কারণ, উত্তর ভারতকে বারম্বার বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিতে হইয়াছিল।

বিভিন্ন ধর্মের উত্থান পতনের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতি ওতঃপ্রোতো-ভাবে জড়িত। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ইহার আলোচনা করা সঙ্গত। গুপ্তযুগের সময় হিন্দুধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। নৃত্যে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যকলায়, ভাস্কর্যে হিন্দুধর্মের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল। এমন কি হিন্দুধর্ম কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। শ্রেণীগত হিসাবে নর্তকী ও নৃত্যের ধারার ভিতরও প্রভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল: হিন্দুধর্ম চারিটি ভাগে বিভক্ত হয়। স্মার্ত্ত—যাঁহারা প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের সাহিত্যকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাক্ত—ইঁহারা অনেক নাম, রূপ ও দেবতার পূজা করিতেন। ইঁহাদের সম্প্রদায়ে পশু-বলিদান, এমন কি নর-বলিদানও প্রচলিত ছিল। শৈব—ইঁহারা শিবের উপাসনা করিতেন, বৈষ্ণব—ইঁহারা বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। নৃত্যের উপর এই সকল সম্প্রদায়েরও প্রভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়।

ইহার পর থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের উদ্ভব হয়। পুষ্যভূতি রাজা হর্ষবর্ধনের সময় নৃত্যগীতের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। সম্রাট নিজেও নাট্যরসিক ছিলেন। তাঁহার লিখিত রত্নাবলী ও নাগানন্দ দুইটি উল্লেখযোগ্য নাটক। হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকর বর্ধন সঙ্গীত ও

ললিত কলার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে প্রমোদ গৃহ, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল এবং নট, নটী, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি গুণিগণ রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া থাকিতেন।

অনেক ঐতিহাসিকগণের মতে হুণদিগের পরবর্তী আক্রমণকারী গুর্জর ও প্রতিহার। ইহাদিগের বংশোদ্ভব ছিলেন রাজপুতগণ। রাজপুতগণের বাসস্থান রাজস্থানে কথক নৃত্যের বহুল প্রচলন ছিল। কেহ কেহ বলেন শকজাতি হইতে রাজপুতগণের উদ্ভব হইয়াছে। কাহারও মতে রাজপুতগণ সূর্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। উত্তর ভারতে ১০২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজপুতানায় ভাট ও চারণগণ নৃপতিগণের প্রাচীন কীর্তি অভিনয়ের সহিত গাহিতেন।

ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অথবা ইতিহাস জানিতে হইলে প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্র অথবা গুহাশিল্প, মন্দির, চিত্রশিল্পগুলি কম মূল্যবান নহে। সঙ্গীত শাস্ত্রগুলির ভিতর নাট্যশাস্ত্র, অভিনয় দর্পণ, সঙ্গীত রত্নাকর, সঙ্গীত দামোদর, সঙ্গীত মকরন্দ ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

অশোকের রাজত্বের সময় গুহাশিল্পের সূচনা হইয়াছিল। অশোকের স্তম্ভ ও স্তূপগুলি প্রস্তর-শিল্পের প্রথম নিদর্শন এবং ইহাতে নৃত্যের কতকগুলি দৃশ্য আছে, যাহাতে প্রমাণিত হয় যে সেই প্রাচীন যুগেও নৃত্যের বিশেষ সমাদর ছিল। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত ১নং সাঁচিস্তূপের উত্তর পশ্চিম স্তম্ভে নর্ত্তকীর একটি মূর্তি আছে। ইহাতে বাদ্যযন্ত্রের সমবেশও দেখা যায়। ব্র্যাকেট মূর্তিগুলির ভিতর বনদেবীর যে মূর্তিটি আছে, তাহাতে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ও নৃত্যের মাধুর্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। শুঙ্গ রাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ধ্র রাজত্ব পর্যন্ত এই স্তূপ নির্মাণ কার্য অব্যাহত ছিল। শুঙ্গ রাজত্বের অবসানের পর কাম্ববংশের উদ্ভব হইলে বারহুত, ভোজ ও বুদ্ধগয়ার মন্দিরের নির্মাণ কার্য সুরু হয়।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে নির্মিত বারহুতের ভাস্কর্যে নর্ত্তক ও নর্ত্তকী-দিগের সমবেত নৃত্যের একটি দৃশ্য আছে। গৌতম যখন তপস্যার দ্বারা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় দেবতাগণ গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনায় তাঁহার কেশচূড়া বেদীর উপর স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছিলেন এবং এই উপলক্ষে স্বর্গের দেবসভায় অপ্সরা এবং গন্ধর্বগণ নৃত্যগীতের দ্বারা এই উৎসব পালন করিতে-ছিলেন। এই দৃশ্যে নর্তকগণ নৃত্য করিতেছে এবং ৮জন বাদ্যকর সঙ্গীত পরিবেশন করিতেছে। তাহার মধ্যে চারজন হার্প জাতীয় বাদ্য বাজাইতেছে, একজন মৃদঙ্গ বাজাইতেছে এবং একজন গান গাহিতেছে। এই সকল নর্তকীগণের নামও খোদিত আছে। ইহারা হইতেছে মিশ্রকেশী, সুভদ্রা, পদ্মাবতী ও অম্বুসা।

অন্ধ্রবংশের স্মরণীয় কীর্তি হইতেছে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত অমরাবতী। ইহাতে ভগবান বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত খোদিত আছে। পরবর্তীকালে অন্ধ্ররাজত্বের সময় নির্মিত উড়িষ্যার খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, রাণী গুহায় নর্তক, নর্তকী, বাদ্যকরের মূর্তিও আছে।

কুষাণ রাজত্বের সময় উত্তর ভারতে একটি নূতন শিল্পধারার প্রবর্ত্তন হইল। গ্রীক, রোম্যান ও ভারতীয় শিল্পের সংমিশ্রণে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব হইল। গান্ধার শিল্প গুপ্তশিল্পের পূর্ববর্তী ধারা। ২০৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সিরিয়ার গ্রীকরাজ এ্যান্টিয়োকস পাঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং ব্যাকট্রিয়ার (বহ্লীক অর্থাৎ হিন্দুকুশ ও অক্ষুনদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ) গ্রীকগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই গ্রীকগণই ক্রমশঃ পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং তাঁহাদের সংস্কৃতির বহু নিদর্শন রাখিয়া যান। ইহারই ফলে গান্ধার শিল্পের সৃষ্টি। গান্ধার পদ্ধতিতে ভারতীয় ও গ্রীক-শিল্পের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল। মথুরা এবং অমরাবতীর শিল্প নিদর্শনের উপর গান্ধার শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। গান্ধার অঞ্চলে এই শিল্পের নিদর্শন সর্বাধিক। কারণ ইউচিগণই কুষাণ বংশের

প্রতিষ্ঠাতা এবং গান্ধার অঞ্চলেই তাঁহাদের রাজ্য ছিল। পুরুষপুর অথবা পেশোয়ার ছিল রাজধানী। কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্ক সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার গান্ধার রাজ্যও সঙ্গীতের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ইঁহার সময় অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার ছিলেন।

দক্ষিণে চালুক্য রাজগণের রাজত্বকালে গুহাশিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। খৃঃ পূঃ ১ম হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতক পর্যন্ত অজন্তার নির্মাণ কার্য চলে। এক রাজার জীবনে ইহার সমাপ্তি সম্ভব হয় নাই। এক রাজা অন্য রাজার আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করেন। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত অজন্তা গুহায় গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের নৃত্য ও গীতের একটি চিত্র দেখা যায়। ইহার দৃশ্যাবলী মহাজন জাতক হইতে লওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গন্ধর্ব ও অপ্সরার দ্বৈত ও একক চিত্রাবলীও অঙ্কিত আছে।

চালুক্যগণের রাজত্বকালে (৫৫০-৭৫০খৃঃ) অহীহোলের দুর্গামন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের স্তম্ভে অনেক নর্তক নর্তকীর মূর্তি খোদিত আছে। চালুক্যরাজগণের রাজত্বকালে ৭০০ খৃষ্টাব্দে এলোরা মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। অষ্টম শতাব্দীর রাষ্ট্রকূট রাজাদিগের সময়ও ইহার নির্মাণ কার্য চলে। এই সময় এ্যালিফ্যাণ্টার মন্দির নির্মিত হয়। এলোরা মন্দির কৈলাসনাথ অর্থাৎ নটরাজ শিবের উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল। দরজার গাত্রে নটরাজ শিবের মূর্তি সহজেই দর্শকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিদাম্বরম্ মন্দিরের নটরাজ মূর্তির সহিত ইহার যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত নৃত্যরত মূর্তির সহিত দর্শকদিগের মূর্তিও রহিয়াছে। পল্লববংশীয় রাজগণ ৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহাদের দ্বারা কৃত মামাল্লাপুরমের বিখ্যাত শিবের মন্দির চারুকলার অন্যতম নিদর্শন। একটি বিষয়ে লক্ষনীয় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বের ভিতর পরস্পর বিদ্বেষ

নানাভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চারু ও কারুকলার উপর সকলেরই যে গভীর আকর্ষণ ছিল তাহা তাঁহাদের কার্যাবলীর ভিতরই প্রকাশ পাইয়াছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে অনেক নৃত্যরত গন্ধর্ব ও অপ্সরা-দিগের মূর্তি আছে, যাহা নৃপতিগণের গভীর সঙ্গীতপ্রীতির পরিচয় দেয়।

১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমরা ভারতের মধ্যযুগ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। ১০০০ খৃষ্টাব্দ খাজুরাহের কন্দর্প-দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে খোদিত নারীমূর্তিগুলির ভিতর নৃত্যের একটি লীলায়িত ভঙ্গি দেখা যায়। রাজস্থানের নৃত্যরত গণেশের মূর্তিটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গঙ্গবংশীয় রাজগণ কর্তৃক নির্মিত পুরীর মন্দির এবং সোমনাথ ও কোনার্ক মন্দিরের নাটমণ্ডপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রত্যেক প্রাচীন মন্দিরেই একটি করিয়া নাটমণ্ডপ দেখা যায়। এই সকল নাটমণ্ডপগুলি ইহাই প্রমাণিত করে যে, সেই যুগে সঙ্গীতের বিশেষ প্রচলন ছিল এবং ইহা প্রত্যেক মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চিত্তবিনোদনের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল। ভারতের রাজগণ এই সকল মন্দির ও ভাস্কর্যের ভিতর নিজেদের গৌরব, মহিমা, ঐশ্বর্য ও শিল্পপ্রীতিকে প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু একটি বিষয়ে লক্ষনীয় যে, সমগ্র ভারতের প্রস্তর মূর্তিগুলির ভিতর একটি যোগসূত্র বর্তমান। উত্তর ভারতের মন্দিরগাত্রে খোদিত অথবা স্তূপ ও স্তম্ভের মূর্তিগুলির সহিত দক্ষিণ ভারতের মূর্তিগুলির বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। দ্বাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চিদাম্বরমের নির্মাণ কার্য চলে। পাণ্ড্যরাজগণ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। এই মন্দিরের গাত্রে ১০৮টি নৃত্যের করণ খোদিত আছে। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত মাউণ্ট আবুর 'নেমিনাথ' মন্দিরের ছাদে খোদিত নারীমূর্তিগুলির ভিতরও এইরূপ নৃত্যের করণ দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত বিজয়নগরের বিঠল স্বামীর মন্দিরে

পাথরের বেদীর গাত্রে পূর্ববর্তী শিল্পধারার ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া নৃত্যরতা বাদ্যরতা সুন্দরী নর্তকীদিগের নৃত্যের ভঙ্গি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে। নিমিনাথের মন্দিরে ও চিদাম্বরম্ মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ ১০৮টি



কোনার্ক মন্দির (নাটমণ্ডপ)

করণের ভিতর কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। অঙ্গহার, করণ, পদবিক্ষেপ, গতি ও হস্তভেদের মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং ইহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নহে যে, সমগ্র ভারতে মার্গ নৃত্যের ভিতর একটি সমতা ছিল। এই সমতা আমরা ভারতের যে কোন প্রান্তের যে কোন মন্দির গাত্রে অথবা গুহাশিল্পের নর্তক নর্তকীর নৃত্যভঙ্গির ভিতর লক্ষ্য করি। তবে ইহা স্বীকার্য যে, মার্গ নৃত্যের ধারার (style) ভিতর দেশভেদে সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকিতে পারে। ভরত অভিনয় সম্বন্ধে ভারতের চার প্রান্তে প্রচলিত চারটি ধারার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, নৃত্য সম্বন্ধেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যাহাই হউক, বিভিন্ন প্রান্তের মন্দিরগুলির নর্তকীদিগের নৃত্যভঙ্গিমা ও তাহাদের ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মার্গনৃত্য অভিজাত শ্রেণীর ভিতর

ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কারণ ভারতীয় রাজগণই বংশপরম্পরায় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং এই প্রবহমান সঙ্গীতের ভিতর কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না।

নৃত্যের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রগুলি বিশেষ মূল্যবান। এই সকল সঙ্গীত শাস্ত্রগুলিতে প্রাচীন ভারতের নৃত্য, নাট্য, গীত ও বাদ্য সম্বন্ধে প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায়। শুধু সঙ্গীতশাস্ত্রে নহে, কাব্য নাটকেও প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির মানদণ্ডরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচনাকাল লইয়া বহু মতবিরোধ আছে। কেহ বলেন খৃষ্টপূর্ব যুগে ভরতের উদ্ভব হইয়াছিল; কাহারও মতে ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচনার কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত। তবে ইহা ঠিক যে, ভরতের পরবর্তীকালে নাট্যশাস্ত্রে সংযোজনা হইয়াছিল এবং অনেকে অনুমান করেন, কোহলই এই সংযোজনার কার্য করিয়াছিলেন।

ভরতের পরবর্তী সঙ্গীত শাস্ত্রকার ছিলেন কোহল। অনুমান করা হয়, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। তৎকৃত 'সঙ্গীত মেরু' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখও পাওয়া যায়। পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রকার দত্তিল তাঁহার 'দত্তিলম' গ্রন্থে নৃত্য-গীতের আলোচনা করিয়াছেন।

ইহার পর আমরা মহাকবি কালিদাসের দুইটি অমর কাব্যের উল্লেখ করিতে পারি। বিক্রমোবর্শীর চতুর্থ অঙ্কে নৃত্যের উল্লেখ আছে। রঘুবংশে কালিদাস আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের কথা বলিয়াছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রমের নায়িকা নৃত্যগীত পটীয়সী ছিলেন।

ডাঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার মতানুসারে নারদকৃত 'সঙ্গীত মকরন্দ' ১১০০ খৃষ্টাব্দে রচিত। রামকৃষ্ণ তেলাঙের মতে শার্ঙ্গদেবকৃত 'সঙ্গীত রত্নাকর' ১২১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণ' অথবা তাঁহার অভ্যুদয়কাল খৃষ্টীয়

২য় অথবা ৩য় হইতে ৫ম অথবা ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্ণয় করা হয়। ইহা ব্যতীত শারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশন' ধনঞ্জয়ের 'দশরূপ' শুভঙ্করের 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণের নাম উল্লেখ করিতে হয়। নৃত্যে ভরত ও নন্দিকেশ্বরের দুইটি ধারা প্রচলিত ছিল। অনেকের মতে ভরত অপেক্ষা নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণ বেশী প্রাচীন। নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণে বাহ্যিক প্রকাশ ও রীতিনীতির উপর বেশী দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ভরত রসানুভূতি অথবা রসসৃষ্টির উপর অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন।

নাট্যশাস্ত্রকার হিসাবে কোহল ও মতঙ্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকে মনে করেন নাট্যশাস্ত্রের শেষ অংশ কোহল কর্তৃক রচিত। ভরত কোহলের নাম বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত বহু সঙ্গীত-গুণী সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ইঁহারা হইতেছেন তুম্বুরু, যাষ্টিক, নন্দিকেশ্বর, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি। ইঁহাদের পরবর্তী গুণী ছিলেন মতঙ্গ। মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশীতে' সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ভরতের পরবর্তীকালে মতঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীত জগতে একটি নব জাগরণ আনিয়াছিলেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দের গুণী শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকরে' নৃত্যের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। ইহা যদিও ভরতের নাট্য-শাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়াছে, তথাপি ইহার ভিতর তৎকালীন যুগের দেশী নৃত্যপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

৭৫০ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতে মুসলমান আক্রমণ সুরু হয়। মুসলমানগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া লুটপাট করিয়া চলিয়া যাইতেন। স্থায়ীভাবে রাজত্ব করিতেন না। ইহাতে হিন্দু সংস্কৃতি বিপদের সম্মুখীন হইলেও বিপর্যস্ত হয় নাই। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে সুলতানী যুগের সুরু হয়। সুলতানী যুগে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান

সংস্কৃতির যে মিলন আরম্ভ হয়, মোগলযুগে আকবরের রাজত্বে তাহার চরম বিকাশ হইয়াছিল। এইরূপে উত্তর ভারতে এক নূতন সংস্কৃতির জন্ম হইল। দক্ষিণ ভারতকেও যদিও মুসলমান আক্রমণ বারবার প্রতিহত করিতে হইয়াছিল, তথাপি দক্ষিণ ভারত রক্ষা পাইল। কারণ হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের রক্ষক হিসাবে বিজয়নগরের নৃপতিগণের দান অতুলনীয়। শুধু তাহাই নহে, অনেকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি বাঁচাইবার জন্য দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের রক্ষক হিসাবে শিবাজীর আবির্ভাব হইল। ১২০০ শতাব্দী হইতে ভারতের দুর্ভাগ্য ঘনাইয়া আসিল। সমগ্র ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া আত্মকলহে লিপ্ত হইল। বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভারত বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে ভারতের রাজগণ নিজ নিজ রাজ্য রক্ষা করিতে এবং যুদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ইহার ফলে শিল্পকলার সমাদর কমিতে থাকে। অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিতর ইহার প্রচলন বন্ধ হইয়া যায় এবং ইহা একটি পৃথক শ্রেণীব ভিতর সীমাবদ্ধ হয়। তাহার ফলে ইহার স্বর্গীয় রূপটি বিকৃত হইয়া যায়। মুসলমান নবাবদিগের জলসাঘরে নাচওয়ালীদিগের আগমন হয় এবং দাক্ষিণাত্যের দেবদাসীগণ নৃপতিগণের চিত্তবিনোদন করিতে আরম্ভ করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজদিগের আগমনে সঙ্গীতশিল্পের মান আরও নিম্নগামী হইল—এবং বিলুপ্তির পথে যাইতে বসিল। কিন্তু যে দেশের তনুতে তনুতে নৃত্যের ছন্দের অনুরণন, সেই দেশের নূপুরের ধ্বনি স্তব্ধ হইতে পারে না। রাজনৈতিক বিপ্লব, আত্মকলহ, বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়াও ভারতবাসী কলাদেবীর আরাধনা করিতে ভুলে নাই। ভারতীয় নৃত্য বিভিন্ন-ধারায় বিভিন্ন নাম লইয়া ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ইহা উত্তর ভারতে 'কথক', পূর্বভারতে 'মণিপুরী', দক্ষিণ ভারতে 'ভরতনাট্যম্' ও 'কথাকলি' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

এই সকল বিভিন্ন নৃত্যের ইতিহাস বিচার করিলে দেখা যাইবে, এই সকল নৃত্যশৈলী কিরূপে সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ইহার উপর বৈদেশিক শক্তি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উত্তর ভারতে মুসলমান প্রভাব, দক্ষিণ ভারতে আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণ এবং পূর্বভারতে মোঙ্গল, চীন প্রভৃতি জাতির প্রভাব আছে। বেলুচিস্থান, সীমান্তপ্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবে তুর্ক ইরাণ জাতির বংশধরগণের বাসস্থান। অনুমান করা হয়, দ্রাবিড় ও মোঙ্গল জাতির সংমিশ্রণে বাংলা ও উড়িষ্যার অধিবাসিগণের উদ্ভব হইয়াছে। তরাই, নেপাল, আসাম ও ভুটানের অধিবাসিগণের উদ্ভব হইয়াছে মোঙ্গল জাতি হইতে। প্রত্যেক অঞ্চলই এক একটি জাতির বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের কৃষ্টির উপর সেই সেই জাতির প্রভাব পড়িয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন প্রাদেশিক নৃত্য-কলাগুলির ইতিহাস আলোচনাকালে ভারতীয় নৃত্যকলার উপর বৈদেশিক প্রভাবের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

* *

*

নৃত্যে দর্শন ও সাহিত্য



"জয়ত্বদভ্রবিভ্রমভ্রমদ্ভুজঙ্গমশ্বসদ্-
বিনির্গমক্রমস্ফুরৎকরালভালহব্যবাট্।
ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিদ্ধ্বনন্মৃদঙ্গতুঙ্গমঙ্গল-
ধ্বনিক্রমপ্রবর্তিত-প্রচণ্ডতাণ্ডবঃ শিবঃ॥"

নৃত্যে দর্শন ও সাহিত্য

ভারতীয় নৃত্য ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য ভারতীয় নৃত্যের বিনাশ হয় নাই। ইহা রূপান্তরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই। কারণ ইহার মূল অত্যন্ত গভীরে নিহিত। নৃত্য সম্বন্ধে এইরূপ গাম্ভীর্যপূর্ণ দার্শনিক ব্যাখ্যা অন্য কোন দেশের নৃত্যে আছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতীয় নৃত্যের উদ্ভব হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ বেদ হইতে; কিন্তু অন্য কোন দেশের নৃত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে এইরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করা হয় না। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রকারগণও শংকরকেই ভারতীয় নৃত্যের স্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা নৃত্যের গুরুকে প্রণাম জানাইয়াছেন অতি সুন্দরভাবে—

"আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ববাঙ্ময়ম্।
আহার্যং চন্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্॥"

সেই শক্তিমান, যিনি সর্বত্র প্রকাশমান, যিনি পঞ্চভূতে বিরাজিত, যিনি রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে নিজেকে বিকশিত করিয়াছেন, সেই ত্রিগুণাতীত শিবকে নমস্কার। তিনি নৃত্যের ভিতর দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, জগৎ লয় করিতেছেন, কখনও বা জগতের স্থিতি করিতেছেন। কালের চক্র ঘুরিতেছে এবং তাহার তালে তালে শিব নৃত্যের ভিতর দিয়া তাঁহার কার্য সম্পাদন করিতেছেন। ইহাই ভারতীয় নৃত্যের মূল সুর। ভুবন তাঁহার আঙ্গিক অভিনয়ের ফলস্বরূপ। তাঁহার মুখোচ্চারিত প্রথম ওঁকারধ্বনি বায়ুতরঙ্গে প্রবাহিত হইয়া নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র জাগতিক শব্দের সৃষ্টি করে। অতএব বিশ্বের সমস্ত শব্দসমূহ তাঁহার অভিনয় হইতে উদ্ভূত।

চন্দ্র তারাদি তাঁহার আভরণ। সেই ত্রিকালজ্ঞ, কালজয়ী, মহাকাল শিব যে নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা জাগতিক নৃত্য নহে; তাহা মহা-জাগতিক নৃত্য। সেইজন্য জগৎ হইয়াছিল আঙ্গিক অভিনয়, অপার্থিব বস্তু চন্দ্র তারাদি হইয়াছিল ভূষণ এবং মহাজগতের সকল মিলিত শব্দ হইয়াছিল তাঁহার বাচিক অভিনয়ের ফলস্বরূপ। সেইজন্য ভারতীয় নৃত্য ভারতবাসীর নিকট কেবলমাত্র আমোদ প্রমোদ নহে; অথবা সময় অতিবাহিত করিবার জন্য নিমিত্ত মাত্র নহে। ইহা এক অদ্ভুত অনুভূতি, অদ্ভুত সত্ত্বা। এই অদ্ভুত অনুভূতিকে আমরা রূপময় করিবার চেষ্টা করি এবং সর্বগত করিয়া আর্টের সৃষ্টি করি। সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইতেছে আর্ট। একমাত্র স্রষ্টাই আর্ট সৃষ্টি করিতে পারেন। নৃত্যের সহিত আর্ট ও সৌন্দর্যের নিবিড় সম্বন্ধ। নৃত্যের ভিতর আর্টের বিকাশ বুঝিতে হইলে প্রথমে আর্টের বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

অনেকে বলেন, পরম-ব্রহ্মের উপলব্ধি হইতে এই অনুভূতির স্পন্দন হয়। অনেকে বলেন, এই অনুভূতি সৌন্দর্যের আস্বাদন করায়। সৌন্দর্য ও আর্ট পরস্পর নিত্য-সম্বন্ধী।

সৌন্দর্য ও আর্ট বলিতে কি বুঝায়? ইংরেজ দার্শনিক বম্‌গার্টেন বলিয়াছেন যে, সৌন্দর্য হইতেছে সম্পূর্ণতা। ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সৌন্দর্যের লক্ষ্য হইতেছে—আনন্দ দেওয়া ও অন্তরের ইচ্ছাকে জাগরিত করা। প্রকৃতিতে সৌন্দর্য প্রতিফলিত হইয়াছে। সুতরাং আর্টের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে প্রকৃতিকে অনুকরণ করা। অর্থাৎ এক কথায় বলিতে পারা যায়, সৌন্দর্যকে অনুভব করিয়া স্বগত করা। উইঙ্কিলম্যান বলিয়াছেন যে, আর্টের সূত্র এবং উদ্দেশ্য হইতেছে সৌন্দর্যের প্রকাশ। তিনি তিন প্রকার সৌন্দর্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ভিতর ভাবের সৌন্দর্য হইতেছে আর্টের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং ভাবের সুষ্ঠু অভিব্যক্তি হইতেছে সৌন্দর্য। হেগেল বলিয়াছেন, ভগবান

সৌন্দর্যরূপে প্রকৃতি ও আর্টের ভিতর বিরাজমান। হেগেল সর্ব-শক্তিমানের এই প্রকাশের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই সর্বশক্তিমান পুরুষ দুইপ্রকারে নিজেকে ব্যক্ত করেন—(১) বস্তু ও বিষয়ের ভিতর দিয়া (২) প্রকৃতি ও আত্মার ভিতর দিয়া; অর্থাৎ চেতন ও অচেতন অথবা স্থাবর ও জঙ্গমের ভিতর দিয়া। সুতরাং চেতন পদার্থের ভিতর দিয়া ভাবের প্রকাশের নাম সৌন্দর্য এবং এই সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আত্মা ও আত্মার সহিত যাহা সংযুক্ত তাহাই সুন্দর। সুতরাং আত্মিক সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব হইতেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রকৃতির ভিতর এই যে আত্মিক সৌন্দর্যের সন্ধান পাই, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং আত্মার বিকাশ হইতেছে সৌন্দর্যের প্রকাশ। দর্শন ও ধর্মের মিলনে ভাবের যে অভিব্যক্তি হয় তাহাই আর্ট। ইতালীয় সৌন্দর্যের উপাসক প্যাগানো বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির ভিতর যে সৌন্দর্য বিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে তাহাকে সংহত করাই আর্ট। এই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার শক্তি হইতেছে রুচি এবং ইহাদিগকে একত্রীভূত করিয়া সংহত করার শক্তি হইতেছে আর্টের প্রতিভা।

ভারতীয় দার্শনিকগণ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে একই কথা বলিয়াছেন। তবে তাঁহারা আরও সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ভরতমুনি রসসৃষ্টির দ্বারা আর্টের সার্থকতা বিচার করিয়াছেন। এই রসসৃষ্টিকেই তিনি প্রকারান্তরে সৌন্দর্য বলিয়াছেন। এই সৌন্দর্য হইতেছে আনন্দানুভূতি। তিনি বলিয়াছেন, রসানুভূতি উৎপন্ন হয় কোন সুন্দর প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র অথবা মানুষ, জীব জন্তু এবং লতাপাতার রঙ্গীন চিত্র হইতে। ছবি কেবলমাত্র রঙ ও রেখা দ্বারা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়া আমাদের মনে আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করে। এই আনন্দানুভূতি আমাদের মনে সুপ্তভাবে রহিয়াছে। তাহা উদ্বেলিত হইয়া রসসৃষ্টি করে। যেথায় রসসৃষ্টি সফল হয়, সেথায় আর্টও সার্থক হয়। যদিও অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন যে, লোকবৃত্তির অনুকরণই

হইতেছে আর্ট; কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ইহা অবিকল অনুকরণ না হইয়া সদৃশকরণ হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত শিল্পীর নিজস্ব অবদান থাকিবে। এই অবদানটুকুই সৃষ্টি অথবা আর্ট। রস সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইয়া অভিনবগুপ্ত নাট্যকেই রস বলিয়াছেন; নাট্য কোন জিনিসের অনুকরণ নহে, অথবা নটবিদ্যা নহে। অঙ্গভঙ্গী অথবা বিভাবও নহে। তবে ইহা কি? ইহা সকল মনুষ্য হৃদয়ে স্থায়ী ভাবে রহিয়াছে। কিন্তু যখন ইহা কাব্য, নাট্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া মনুষ্যহৃদয়ে এক চমৎকার আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করে, তখনই ইহা আর্ট হয়। ইহা সত্য যে, কোন জিনিষের যথাযথ অনুকরণ আর্ট নহে। কারণ তাহাতে সৃষ্টির আনন্দ কোথায়? এক এক মনীষী এক এক প্রকারে আর্টকে অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু সকলের বক্তব্যের ভিতর দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা লক্ষণীয় যে, সকলের ভিতর একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র রহিয়াছে। সকলেই অনুভব করিয়াছেন যে, আর্ট হইতেছে পরমাত্মার সৌন্দর্যেরই প্রতিবিম্ব। ব্রাহ্মণের রচয়িতা ঐতরেয় শিল্প সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীক্ষিতিমোহন সেনের ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি—"শিল্পীরা তাঁদের শিল্পসৃষ্টির দ্বারাই দেবতার স্তব করছেন। সৃষ্টিতে যে দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প তাই বুঝতে হবে। যিনি এইভাবে শিল্পকে দেখেছেন, তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা। শিল্প-সাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলে।" **Ruskin** বলিয়াছেন "All great art is the expression of man's delight in god's work, not his own. Michael Angelo বলিয়াছেন—"The true work of Art is but a shadow of the divine perfection. I. H. Holland বলিয়া-

ছেন—"Artists are nearest to God. Into their souls he breathes his life ...." সুতরাং ইহা স্বীকার্য যে আর্ট বাস্তব জগতের অবিকল অনুকরণ নহে। আর্টের স্থান অতি উচ্চে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি; সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা। টলষ্টয়ও এই কথা বলিয়াছেন—"To evoke in oneself a feeling one has once experienced and having evoked it in oneself then by means of movements, lines, colours, sounds of forms expressed in words, so to transmit that feeling that other experience the same feeling—that is the activity of art."

ভারতীয় নৃত্যে এই আর্টের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে কি না তাহাই বিচার্য বিষয়। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যশিল্পীগণ নৃত্যের ভিতর যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ও তাহার রস অনুভব করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের আত্মিক বিকাশের বহিঃপ্রকাশ। তাঁহারা ভগবানের পদতলে দেহ মন সমর্পণ করিয়া ইহাকে দেবতার ভোগ্য করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা এই যে সূক্ষ্ম আনন্দানুভূতি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ইহার ভিতর কামনা বা ভোগের আকাঙ্খা ছিল না। সুতরাং এই সাত্বিক আনন্দানুভূতি হইতে তাঁহারা রসসৃষ্টি করিয়া আর্টের সৃষ্টি করিতেন, যাহার রসাস্বাদন করিয়া রসিক মন পুলকিত হইত। সুতরাং ভারতীয় নৃত্যের উৎপত্তি হইতে আমরা এই ধারণা করিতে পারি যে, ইহা পরমব্রহ্মের মহাস্পন্দনের সূক্ষ্ম ও সুন্দর অনুভূতি।

এই সৌন্দর্যানুভূতির ভিতর সৃষ্টির স্পৃহা রহিয়াছে। মুক্ত মন ইচ্ছামত কল্পনার জাল বুনিয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হইতে শিল্পের সৌন্দর্যের এইখানেই প্রভেদ এবং এইখানেই শিল্পীর

স্বাতন্ত্র্য। ডাঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক অনূদিত—'হেগেল রচিত ললিতকলা দর্শনের ভূমিকা' নামক প্রবন্ধে আছে যে—"শিল্পের সৌন্দর্য—সৃষ্টি করা সৌন্দর্য—মনের নূতন জন্ম। যে পরিমাণে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ব্যাপার থেকে আত্মা ও আত্মিক সৃষ্টি বড়, সেই পরিমাণেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে শৈল্পিক সৌন্দর্য মহত্তর।" এই সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস সকল দেশের আর্টের ভিতরই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভারতীয় নৃত্যের আর্টের ভিতর এই সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছে বলা যায়। ভারতীয় নৃত্য রূপে গুণে অধিকতর মহিমান্বিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এই প্রকাশ এত উজ্জ্বল, এত সুষমামণ্ডিত যে ইহা অজ্ঞাতসারে সকলের মনকে আকর্ষণ করিতেছে। ইহার কারণ এই রঙ্গময়ী নৃত্য পঞ্চেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিয়া ক্ষান্ত হয় না; ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অতীত আরও কিছু আমাদের দেয়, যাহা অনির্বচনীয়। এই প্রয়োজনের অতিরিক্তকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'সৌন্দর্য'। আলঙ্কারিক ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ বলিয়াছেন যে, সৌন্দর্যানুভূতি অলৌকিক জগতের সন্ধান দেয়। ভারতীয় শাস্ত্রও অনির্বচনীয় ব্রহ্মকে সত্য, শিব ও সুন্দর বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এই আর্ট সেই চির সুন্দরকেই নানাভাবে ব্যক্ত করিতেছে।

ভারতীয় নৃত্য একাধারে দৃশ্য কাব্য ও শ্রাব্য কাব্য। ইহা অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়া আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে এবং আমাদের বাস্তবজগতের অনুভূতিকে সাময়িকভাবে লুপ্ত করিয়া অনির্বচনীয় এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগায়। ইহাই ভারতীয় নৃত্যে আর্টের বৈশিষ্ট্য। নৃত্যে বাচিকাভিনয়ের অভাব পূরণ করে গীত। এই সকল গীতে স্থায়ীভাবকে সঞ্চারিভাবের সাহায্যে বহু প্রকারে ব্যক্ত করিয়া রসের সঞ্চার করা হয়। এই সকল গীতে নানা প্রকার রাগ রাগিনী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সহিত এই সকল রাগরাগিনীর রূপ পরিবর্তিত হয় এবং এই রাগমালা

নৃত্যকে একটি গভীর পরিবেশের ভিতর লইয়া যায়। ইহার সহিত চলে ছন্দের বিচিত্র খেলা। এই বিচিত্র ছন্দের খেলার ভিতর রহিয়াছে জগতের স্পন্দন। কারণ ভারতবাসী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, মহাকালের রথের চক্র বিবিধ ছন্দে ঘুরিতেছে। এক কথায় বলা চলিতে পারে, ভারতীয় নৃত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ভারতীয় দর্শনের উপর যাহা শিল্পীর আত্মিক বিকাশের পথে প্রধান পথ প্রদর্শক। সেইজন্য আর্ট হিসাবে ইহা আজও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে।

ভারতীয় নৃত্য ভাবসম্ভারে এত সমৃদ্ধ যে, ইহা অনায়াসেই দর্শকের মনকে রসে, ভাবে আপ্লুত করিয়া তোলে। ইহার প্রধান কারণ— ভারতীয় নৃত্যে মুখাভিনয় একটি প্রধান অঙ্গ। একটি ভাবকে প্রকাশ করিতে শুধু দৈহিক অঙ্গভঙ্গীই (Gesture, posture) নহে, মুখের ভাবও (expression) একটি প্রধান অঙ্গ। ভাব, মুদ্রা, করণ, অঙ্গহার, বিভিন্ন সাজসজ্জা, বিষয়বস্তু, সাহিত্য প্রভৃতি যে ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তাহা দর্শককে লোকোত্তর জগতের সন্ধান দেয়। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে, সাজপোষাকের বর্ণসম্ভারে, ভাবগাম্ভীর্যে, প্রাণের আকুতিতে, আত্মিকবিকাশে ভারতীয় নৃত্য সম্পূর্ণ সার্থক আর্ট।

নৃত্যকে আমরা কতদূর উচ্চপর্যায়ে স্থান দিয়াছি তাহা নটরাজের নৃত্যের বর্ণনা হইতেই বুঝা যায়। নটরাজ হইতেছেন নটের রাজা। দক্ষিণ ভারতীয় নটরাজ মূর্ত্তিটি ভারতীয় নৃত্যের দার্শনিক ব্যাখ্যার মূর্ত্ত প্রকাশ। নটরাজ নৃত্য করিয়াছিলেন অপস্মর নামক একটি অসুরের উপর। দৈত্য অপস্মর হইতেছে মায়া (Forgetfulness)। শিব মায়াকে বিনষ্ট করিয়া জীবকুলকে রক্ষা করিতেছেন। মহাজাগতিক নৃত্যের স্রষ্টা নটরাজ সনাতন শক্তির উৎস পঞ্চক্রিয়ায় নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই পঞ্চক্রিয়া হইতেছে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ। দৈত্য অপস্মরকে পদতলে বিনষ্ট করিয়া তিনি সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন; অতএব তিনি পালক। দক্ষিণ

হস্তে বরাভয় দান করিতেছেন। বামহস্তে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ও মুক্তজটাজালের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, তিনি এই জগৎকে ধ্বংস করিতেছেন। বামপদ ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ ঈষৎ নমিত। ইহার অর্থ, তিনি অনুগ্রহ করিতেছেন। এইভাবে শঙ্কর নৃত্যের ভিতর দিয়া নিজেকে বহুপ্রকারে বিকশিত করিয়াছেন। কখনও তাঁহার তাণ্ডব রূপ, কখনও সংহার রূপ, কখনও বা শান্ত রূপ। তাঁহার এই রূপের ছটা প্রকৃতির ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নারদ কৃত 'সঙ্গীত মকরন্দে' শিবের সন্ধ্যানৃত্যের বর্ণনা আছে। একদা প্রদোষকালে হিমালয় পর্বতের উপর শিব নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই দিব্য নৃত্যে দেবদেবীগণ সঙ্গীত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাল ধরিয়াছিলেন, হরি মৃদঙ্গ বাজাইয়াছিলেন এবং ভারতী স্বয়ং বীণা বাজাইয়াছিলেন। চন্দ্র ও সূর্য বাঁশী বাজাইয়াছিলেন। সিদ্ধ, অপ্সর, কিন্নরগণ ছিলেন শ্রোতৃমণ্ডলী। নন্দী, ভৃঙ্গী প্রভৃতি মাদল বাজাইয়াছিলেন এবং নারদ স্বয়ং সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিলেন। ভারতীয় নৃত্যের উদ্ভব এবং ইহার বিকাশেও আধ্যাত্মিকতা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এবং এই জন্যই ভারতীয় নৃত্যের সহিত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের নৃত্যের তুলনা করা যায় না।

পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে যে, বিভিন্ন ধর্ম-বিরোধের ভিতরও ভারতীয় নৃত্যের বিনাশ হয় নাই। তাহার কারণ, ভারতবাসীগণ নৃত্যের অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ মর্মটি উপলব্ধি করিতেন এবং ইহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। ইহা কিরূপে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিযোগিতার ভিতর বাঁচিয়া রহিল, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে শাক্ত শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহাকে ভক্তি যুগ বলা যাইতে পারে। এই সকল সম্প্রদায়ের উদ্ভবে হিন্দু দর্শনের মূল সুর যদিও বিকৃত হয় নাই, তথাপি ধর্মকে অবলম্বন করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য বিভিন্ন পন্থা অনুসৃত হইল। ইহার প্রভাব আসিয়া নৃত্যের উপরও পড়িল।

দেশভেদে, কালভেদে, এবং ভৌগোলিক প্রভাবে নৃত্যের রূপ নানা-ভাবে পরিবর্তিত হইল। ইহার উপর বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব পড়িল এবং দেবদাসীগণও সেই প্রভাব হইতে মুক্ত হইলেন না। দেবদাসীগণও শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য এক হইলেও মত ও পথ ভিন্ন হইল। এমন কি ভারতের সন্ন্যাসীগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগবানকে পাইবার একমাত্র পন্থা সঙ্গীত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন - "ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার এই অভ্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ সঙ্গীত। ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য নারদকে ভগবান বলিতেছেন—নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগিদের হৃদয়েও বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ ভজন গান করেন, আমি সেখানেই অবস্থান করি। মনুষ্যমনের উপর সঙ্গীতের প্রচণ্ড প্রভাব—উহা মুহূর্তে মনকে একাগ্র করিয়া দেয়।" সুতরাং আমরা সহজেই বলিতে পারি যে, ভক্তি-সাধনার প্রধান পথ হইতেছে সঙ্গীত।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে মণিপুরের নৃত্য যেমন ভাবময় তেমনি মাধুর্যময়। মৈথীগণ বিশেষ বিশেষ ধর্মোৎসবে মণিপুরী নৃত্য দেখিয়া নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেন। কারণ ভগবানকে স্মরণ ও কীর্তন করিবার ইহাই তাঁহাদের রীতি।

মণিপুরী নৃত্যের ভিত্তিও বৈষ্ণবধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য ইহা সাধনভক্তির পথ ও ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। সাধন ভক্তির পথে অগ্রসর হইয়া কত সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্-ভাগবতে হিরণ্যকশিপুকে প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধ ভক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুতে অর্পিত হয়, তবে তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি।

'ভঙ্গি পারেং' এবং 'লাইহারাওবা' নৃত্যের সময় নর্তক নর্ত্তকীগণ শুদ্ধ মন লইয়া নৃত্য আরম্ভ করেন এবং দর্শকগণও তদ্গতচিত্ত হইয়া এই অপরূপ নৃত্যলীলা দর্শন করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করেন। তাঁহাদের নৃত্যে ভক্তিরসই প্রধান। মৈথীগণ মনে করেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত নৃত্য করিলে দেবতার আশীর্বাদ লাভ করা যায়। নৃত্য দেবতার পূজার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মতনই অপরিহার্য। মণিপুরী নৃত্য দর্শক ও নর্তকের উপর একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কারণ ভক্তিমার্গের নববিধ লক্ষণের ভিতর প্রথম লক্ষণটি দর্শকগণ অনুসরণ করেন এবং দ্বিতীয়টি নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণ অনুসরণ করেন। তদ্গতচিত্তে শ্রবণ ও কীর্তনাদির দ্বারা ভক্তির উৎপত্তি হয় এবং সেই ভক্তি শেষ পরিণতি লাভ করে প্রেমে। তাহাদের এই নৃত্য দর্শকবৃন্দের মনে ভগবৎপ্রেমের অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। প্রেমভক্তি রস দিয়া ভগবানের এই যে আরাধনা, তাহাতে নর্তক, দর্শক উভয়েই অংশ গ্রহণ করেন। মৈথীগণ যখন নৃত্য উপভোগ করেন, তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহারা ভগবানের সেবিকাদিগের সান্নিধ্য লাভ করিতেছেন। ধর্ম ও নৃত্য তাঁহাদের নিকট এক হইয়া গিয়াছে। নৃত্য তাঁহাদের নিকট ধর্মের মত পবিত্র, ফুল চন্দনের মত নির্মল। তাহাতে কোন ক্লেদ নাই, কোন মালিন্য নাই। এইরূপে আমরা ভরতনাট্যম, কথাকলি প্রভৃতি নৃত্যকেও ধর্মের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখি।

ভারতীয় নৃত্যে রসাভিনয়ের জন্য ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সাহিত্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। মণিপুরী নৃত্য বৈষ্ণব সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়াছে। ইহার কারণ, বাংলার গৌরব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য প্রেমানন্দ ঠাকুর মণিপুরে যাইয়া

মহাপ্রভু প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেন। মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মৈথীগণও গ্রহণ করেন। এইরূপে বাংলা ও মণিপুরের ভাবের আদান-প্রদান হয় এবং গীতের ভিতরও বাংলা ও মৈথী ভাষার সংমিশ্রণ হয়। কিন্তু মণিপুরের প্রাচীন আদি লোক-নৃত্যগুলিতে মৈথীভাষাই ব্যবহৃত হয়। আধুনিক গবেষণার ফলে ভারতে যে চারিটি আদি ভাষার কথা জানা যায়, তাহা হইতেছে—অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোটচীন ও আর্য। তাহার ভিতর আসামে প্রচলিত ভাষাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে ভোটচীন ভাষা-গোষ্ঠী হইতে। এই ভাষাগুলি অনার্য ভাষা। মণিপুরের আদি লোকনৃত্যে এখনও পর্যন্ত মৈথীভাষার সহিত এই ভাষার সংমিশ্রিত গানগুলি প্রচলিত আছে। কিন্তু মণিপুরের পরিবর্তিত রূপ বাংলার সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা সাহিত্যকে অবলম্বন করে। এইরূপে ইহা বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। বাংলা কীর্তনের ন্যায় মণিপুরেও কীর্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা করিতে হয়।

বৈষ্ণবসাধনা ভাবের সাধনা। ভাবের পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে আমাদের মনে ভাবের তন্ময়তা আসে। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব রসতত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের মহিমা প্রকাশ করাই বৈষ্ণব কবিগণের উদ্দেশ্য। ইহা জাগতিক প্রেম নহে। জাগতিক প্রেমের ঊর্ধ্বে অপ্রাকৃত প্রেম। যাগ, যজ্ঞ, জপ তপের ভিতর দিয়া মর্তের মানুষ দেবতার নাগাল পাইত না। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ভগবান মর্তে নামিয়া মানুষের পর্যায়ে আসিলেন। ঠাকুর তাহাদেরই ধূলার ধরণীতে বন্ধু, সখা, ব্যথার ব্যথীরূপে আবির্ভূত হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের ব্যবধান তিরোহিত হইল এবং অন্তরের মধ্যে বিশ্বমানবতার এক মহান ধ্বনি শ্রুত হইল। বৈষ্ণব পদাবলী ইহারই ফল। মণিপুরী নৃত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে বৈষ্ণব সাহিত্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচলিত ভরতনাট্যমকে 'দাসী-

অট্টম' বলা হইত। নামের ভিতরই নৃত্যের মূলভাবটি প্রকাশ পাই-তেছে। অর্থাৎ দেবতার দাসী হইয়া তাঁহারই চরণে প্রণতা হইয়া আমার বলিতে যাহা কিছু সব নিবেদন করিলাম। আমার বলিতে আর কিছু নাই। এই যে সঙ্গীতচাতুর্য ইহাও ভগবানের পায়ে নিবেদন করিলাম। দেবতাই স্বামী, প্রভু ও জীবনসর্বস্ব। নৃত্যের সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই পবিত্র ভাবটি সঙ্গীতের মাধ্যমে মূর্ত হইয়া ওঠে। ইহাতে যে সকল সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার ভাবার্থ হইতেছে যে, নায়িকা তাহার নায়কের (দেবতার) সহিত বিচ্ছেদের বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। অবশ্য অনেক সময় নায়ক দেবতা না হইয়া রাজাও হন। এই সকল পদে দেবতা এবং রাজার স্তুতি ও গুণাবলী বর্ণনা করা হয়।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে তামিল ও তেলেগু সাহিত্য। তামিল ও তেলেগু সাহিত্য যেমন প্রাচীন তেমনি সমৃদ্ধ। সাতবাহন রাজত্বের শেষার্ধে তামিল ভাষায় সঙ্গম সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সঙ্গম-যুগে নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীতের উপর কতকগুলি পুস্তক রচিত হয়। এইগুলি হইতেছে অগস্তম্, মৃদুনুল, পঞ্চমরপুমথিভনর প্রভৃতি। তবে প্রাচীন তামিল সাহিত্যের ভিতর 'শিলপ্পাদিকারম্' একটি সুপ্রাচীন তামিল নাট্যগ্রন্থ। ইহাতে সঙ্গীতের প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায়। তামিল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে দ্রাবিড় ভাষা হইতে। পাণ্ড্য ও পল্লবযুগে এই ভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ভক্তি-বাদ সম্বন্ধে এই সময়ে বহু কবিতা লেখা হইয়াছিল। চালুক্য ও হোয়সল রাজত্বে কন্নড় ভাষা, পূর্বচালুক্য কাকতীয় ও তেলেগু এবং চোলের রাজত্বে তেলেগু ভাষা, চোল এবং পাণ্ড্য রাজত্বের সময় তামিল ভাষা বিশেষ উন্নত হয়। এই সকল রাজাদিগের রাজত্বকালে সাহিত্য যেরূপ উন্নত হইয়াছিল, তাহার সহিত নৃত্যেরও ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছিল। তেলেগু ভাষার বহু পদ ভরতনাট্যম্ নৃত্যে দেখা যায়। 'তেলেগু' শব্দটিরও একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। 'তেলেগু' শব্দটি

আসিয়াছে 'ত্রিলিঙ্গ' শব্দ হইতে। ইহার অর্থ এই যে, দেশ তিনটি লিঙ্গের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই তিনটি লিঙ্গ হইতেছে 'কলহস্তী,' 'শ্রীশৈলম্' এবং 'দক্ষরাম'। এই জন্য দেশটি 'তেলিঙ্গা' নামে অভিহিত এবং পরে ইহার নাম 'তেলেগু' হইয়াছে। তেলেগু অথবা তামিল সাহিত্যের উপর ধর্মের প্রভাব অধিক পরিমাণেই বিদ্যমান। শিল্পও ইহার প্রভাব মুক্ত হইতে পারে নাই। তেলেগু ভাষা অনেক প্রাচীন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে পাথরে উৎকীর্ণ এই ভাষার শিলালিপি ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেছে।

দক্ষিণ ভারতের 'ভাগবতমেলা'-নাটক এবং 'কুচ্চিপদী' নৃত্যনাট্য তামিল ও তেলেগু সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধানতঃ দুইজন ভক্তের অনুপ্রেরণায় এই নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি হয়। পুরাণ অথবা ভাগবতের চিন্তাধারা ইহার ভিতর ব্যক্ত করা হইয়াছে। পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তি যুগের মধ্যাহ্নে ইহাদের অভ্যুদয়। পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে, ভক্তির উদ্ভব দ্রাবিড় দেশে, বৃদ্ধি কর্ণাটে, মহারাষ্ট্রে স্থিতি এবং গুজরাটে জীর্ণতা। দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের প্রচার করিয়াছিলেন রামানুজ। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বৈষ্ণব ধর্মে একটি যুগান্তর আনে। ইহারই ফলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভক্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেইজন্যই তৎপরবর্ত্তীকালে তথাকার সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্যগুলি ভক্তিপ্রধান হইয়া ওঠে। যাঁহারা ভাগবত মেলা নাটক ও কুচ্চিপদী নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইতেছেন তীর্থনারায়ণ জাতি এবং সিদ্ধেশ্বর স্বামী যোগী।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মার সময় জৈনবাদ ও বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে ভক্তিবাদের উদ্ভব হয় এবং উহা প্রবল আকার ধারণ করে। এই ভক্তিবাদীগণের দলপতি ছিলেন নয়নার এবং আলভারগণ। তাঁহাদের ভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলি পরবর্ত্তী যুগে 'দেবরাম' এবং 'দিব্যপ্রবন্ধম্' নাম লইয়া তামিল সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে। ভরতনাট্যম্

নৃত্যে সাহিত্যের মূল উৎসই ভক্তি এবং সেই জন্যই এই নৃত্যে ভক্তিবাদ প্রবল। ভারতনাট্যমের সাহিত্যকে 'লিরিক' বলা চলিতে পারে। 'লিরিক' অর্থাৎ গীতিকাব্য স্বল্প পরিসরে হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করে।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কথাকলি নৃত্য মালয়ালম্ সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কথাকলি নৃত্য যদিও মন্দির-নৃত্য, তথাপি ভরতনাট্যম্ অথবা মণিপুরী নৃত্যের মত আত্মনিবেদনের ভাবটি ইহাতে নাই। পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে আয়োজিত উৎসবে এই নৃত্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের প্রত্যেক মন্দিরে 'কথাকলি' মণ্ডল আছে এবং তাহাতে কথাকলি নৃত্য হইয়া থাকে। কথাকলি নৃত্যে শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি ব্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত ভক্তি অন্তরালে প্রবহমান।

মালয়ালম্ সাহিত্যকে বিশেষ প্রাচীন বলা যাইতে পারে না। সঙ্গম যুগের তামিল ভাষার অনেক শব্দ মালয়ালমে পাওয়া যায়, যাহা পরবর্তী যুগে তামিলভাষা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মালয়ালম ভাষার উৎপত্তি লইয়া মতবিরোধ আছে। কেহ বলেন, 'কোডম্ তামিল' হইতে ইহার উৎপত্তি, কেহ বলেন, সংস্কৃত ভাষা হইতে। তবে ইহা ঠিকই যে, ইহাতে প্রাচীন দ্রাবিড় ও সংস্কৃতভাষার সংমিশ্রণ রহিয়াছে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কথাকলি নৃত্যে সাহিত্য ছিল না। কালিকটের রাজা স্যাম্বুরিণ কৃষ্ণগোপালকে স্বপ্ন দেখিয়া কৃষ্ণনাট্যম্ রচনা করেন। এই সময়ে সংস্কৃতে অনেক নাটক রচিত হয়। এই যুগকে কথাকলি নৃত্যের যুগসন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। কারণ সাহিত্য নৃত্যনাট্যে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। কৃষ্ণনাট্যম্ স্বপ্নাদিষ্ট বলিয়া ইহার কোন সংস্কার হয় নাই। কোট্টরাকারার রাজা রামনাট্যম্ রচনা করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চাক্কিয়ার কুত্তু এবং—নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদিগের প্রচেষ্টায় মালয়ালম্ সাহিত্যে একটি জোয়ার আসে। ইহার পূর্বে কুডিয়াট্টম্ অপেক্ষাকৃত সরল সংস্করণ ছিল এবং নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা

'নাগানন্দম্', 'আশ্চর্য চূড়ামণি' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইত। চাক্কিয়ারগণ নৃত্যাভিনয়কে পুষ্ট করিবার জন্য গদ্যে ও পদ্যে অনেক চম্পূ (গদ্যপদ্যময়ী কবিতা) রচনা করেন। এই সকল চম্পূতে সংস্কৃতের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এইগুলি সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে লেখা এবং গদ্যাংশগুলিও কাব্যময়। পৌরাণিক কাহিনী হইতে ইহার আখ্যানভাগ গৃহীত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত রামায়ণ চম্পূ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথাকলি নৃত্যনাট্যের এইরূপ ২০০টি জনপ্রিয় চম্পূ সাহিত্যে যোজনা করা হইয়াছে। কথাকলি নৃত্য বিশেষভাবে বাস্তবধর্মী। মহাকাব্যোচিত লক্ষণগুলি ইহাতে পরিস্ফুট। মহাকাব্যগুলি দেশের এবং জাতির ঐতিহ্য ও গৌরবকে প্রকাশ করে। ভারতের দুই মহাকাব্যে ভারতের আদর্শ, ঐতিহ্য, ভারতের দর্শন, গৌরব সবই প্রকাশ পাইয়াছে। কথাকলি নৃত্যনাট্যের ভিতরও এইরূপ একটি আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, মঙ্গলের সহিত অমঙ্গলের দ্বন্দ্ব; এবং শেষ পর্যন্ত ন্যায় এবং মঙ্গলের জয় মানবমনকে ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে এবং মঙ্গলের পথে চালনা করিতে চাহে। অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয় ঘোষণা করিয়াই ইহা ক্ষান্ত হয়।

কথক নৃত্যের সাহিত্য সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলা কঠিন। ইহার সাহিত্য উর্দ্দু, ব্রজভাষা, ভোজপুরী, মৈথিলী ও মাগধী ভাষায় সংমিশ্রণ। রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে এবং নানাজাতির প্রভুত্বের ফলে, মনে হয় এই নৃত্য কোন একটি বিশেষ ভাষাকে অবলম্বন করিতে পারে নাই। সমগ্র উত্তর ভারতে একমাত্র কথক নৃত্যই প্রচলিত ছিল। সুতরাং এই নৃত্যধারা বিশাল উত্তরাখণ্ডের প্রায় সকল ভাষায় সাহিত্যকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। পূর্বে কথক নৃত্যে গজল, ঠুংরী অথবা দাদরা গানের সহিত 'ভাও বাৎলানো' (অভিনয়) হইত। নবাবী যুগে উর্দু ভাষার উপর 'গজল' গানের আমদানী হইয়াছিল। উর্দু ভাষার মাধুর্য গজল গানের সহিত নৃত্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হইত। অযোধ্যার সঙ্গীত বিশারদ নবাব ওয়াজিদ আলি

ঠুংরী গানের সৃষ্টি করেন। 'ঠুমক' কথাটি হইতে ঠুংরীর উদ্ভব। ঠুমকের অর্থ হইতেছে লাস্য সহকারে পদবিক্ষেপ। ঠুংরী গানে ব্রজভাষা, উর্দু ও হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হয়। কথক নৃত্যে বৃন্দাদীন মহারাজের কয়েকটি ভজন গানও সন্নিবেশিত হইয়াছে। উত্তর ভারতের মন্দিরে যে সকল নৃত্য হইয়া থাকে, সেইগুলির অধিকাংশ কথক নৃত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি। কথক নৃত্যের রাসলীলা সাধারণতঃ ব্রজভাষা, ভোজপুরী, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষাতে অভিনীত হইয়া থাকে। কথক নৃত্যের সাহিত্য মিশ্রভাষায় রচিত। অবশ্য ভক্তশ্রেষ্ঠ সুরদাস, তুলসীদাস ও মীরাবাঈয়ের রচনাও কথকনৃত্যের সাহিত্যকে অনেকাংশে পুষ্ট করিয়াছে। যদিও এই নৃত্যধারা একটি বিশেষভাষাকে অবলম্বন করিতে পারে নাই, তথাপি হিন্দুদিগের প্রেমের ঠাকুর রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই ইহার মূল সুর।

ভারতের লোকনৃত্যেরও ধর্ম আছে, সাহিত্য আছে। লোক নৃত্য কবে, কখন এবং কোথা হইতে সৃষ্ট হইল তাহার কোন নির্দিষ্ট তারিখ অথবা ইতিহাস নাই। সামাজিক নীতিভেদে ও ভৌগোলিক আকৃতি ভেদে ইহা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহা মার্গ নৃত্য নয় বলিয়া সমগ্র সমাজের রূপটি ইহাতে প্রতিফলিত হয়। লোক নৃত্য প্রকৃতির সামগ্রিক রূপটির সহিত জড়িত, সামাজিক ক্রিয়া কর্মের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মানব জীবনের বিকাশের পথে পরিপূর্ণ সহায়ক, আবার কখনও গ্রাম্যজীবনের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। বাংলার গাজন, গম্ভীরা, ধর্মমঙ্গল কাব্যের নৃত্যাভিনয় প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। ইহা ব্যতীত এক শ্রেণীর সম্প্রদায় আছেন, যাঁহাদের ধর্মোম্মাদনার প্রকাশ হয় নৃত্যের মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বাউল, কীর্ত্তন প্রভৃতি উল্লেখ করিতে পারি। ঝুমুর গানে 'চিকন কালার' কথা আছে, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ডারী। উত্তর ভারতের সর্বত্র লোক-নৃত্যের ভিতর 'নটখট কাহ্নাইয়ার' কথা আসিয়া পড়ে। দক্ষিণ ভারতের লোকনৃত্যেও 'কৃষ্ণজী' সর্বত্রই বিদ্যমান।

লোকনৃত্য লোকসাহিত্যকে আশ্রয় করিয়াছে। লোকসাহিত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নহে। ইহা সমগ্র সমাজের সৃষ্টি। লোক-পরম্পরায় ইহা চলিয়া আসিতেছে। লোকসাহিত্য সমাজের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া রচিত। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্য, বিভিন্ন গাথা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুগের পরিবর্তনে অনেক সময় ইহাও হয়ত পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহা মানবমনকে চিরকাল রসসিঞ্চিত করিতেছে—যাহার ফলে লোক-সঙ্গীত, অথবা লোকনৃত্য এখনও শ্রোতৃবৃন্দ ও দর্শকবৃন্দের মনে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, নূতন শক্তির সঞ্চার করে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভারতবাসীর চক্ষে নৃত্য হইতেছে সেই সত্য শিব সুন্দর প্রেমময় ভগবানকে ভক্তের আত্ম নিবেদনের একটি সুন্দরতম পথ। এই প্রেমের সাধনায় নিষ্ঠাবান ভারতীয় নৃত্যশিল্পী জাগতিক সর্বপ্রকার আবিলতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া অনাবিল বিশ্বপ্রেমের সন্ধানলাভে ধন্য হন। সেইজন্যই নৃত্যশিল্পীগণ বিশ্বপ্রেমিক।

ললিতকলা ও সমাজ

ভারতীয় সমাজের আদিতে ভারতীয় সঙ্গীত যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের ইতিহাস স্তব্ধ, অতীত বাক্যহারা; অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অন্ধকার ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সভ্যতা যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল মাত্র, তখন হইতে ভারতবাসীর সঙ্গীত-প্রিয়তা দৃষ্ট হয়। তবে সে সঙ্গীতের রূপ অজানা। তাহা অতীতের অতল অন্ধকারময় গহ্বরে নিহিত।

প্রাচীন শাস্ত্রগুলি হইতে বুঝা যায় যে, যাঁহারা সঙ্গীতের চর্চা করিয়া সঙ্গীতকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমাজের এক শ্রেণীর নিকট হইতে শুধুমাত্র ঘৃণা ও অমর্যাদাই পাইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু এই অমর্যাদার কারণ কি? যে সঙ্গীতের উৎস দেবলোক এবং যে সঙ্গীত-পূজারীগণ দেবতাদিগের অনুগৃহীত ছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘৃণা ব্যতীত আর কিছুই বর্ষিত হয় নাই কেন?

সকল নাট্যশাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, নৃত্যের জন্ম হইয়াছিল দেবলোকে। কিন্তু আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দেবভোগ্যা নৃত্যকুশলা অপ্সরা কিন্নরীগণ কোন মর্যাদা পাইতেন না। ত্রিভুবনের ভিতর দেবলোক শ্রেষ্ঠস্থান এবং দেবতাগণই সেখানে বাস করিবার অধিকারী। মহাদেবাদিদেব শিব নৃত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা এবং ভরত মুনি যথাক্রমে প্রচারকর্তা ও ধারক হইয়াছিলেন। ইন্দ্রের দেবসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন অপ্সর-অপ্সরা, কিন্নর-কিন্নরী ও গন্ধর্বদিগের দল। ইঁহারা নৃত্যগীতে বিশেষ পারদর্শী

ছিলেন এবং দেবতাদিগের মনোরঞ্জন করাই ইঁহাদিগের প্রধান কার্য ছিল। এই সকল চিরযৌবনা, সুন্দরী অপ্সরাদিগের গার্হস্থ্য জীবন যাপনের অধিকার ছিল না। ভারতের প্রাচীন মন্দির, বিহার, চৈত্য ও গুহাশিল্পে ইঁহাদের শিল্পকলা চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তরে খোদিত মূর্তিগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইঁহারা সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। ইঁহারা হৃদয়কে একটি বিশেষ পথের সন্ধান দিয়াছিলেন; সেই পথ হইতেছে সৌন্দর্যের পথ। হেনরিচ্ জিমার এই মূর্তিগুলির সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্লেষণ ভারতীয় দর্শনের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহজীবনে সংকার্য করিয়া পরজীবনে স্বর্গে যাইয়া মানবমন প্রাণ ভরিয়া স্বর্গীয় সৌন্দর্য সুধা পান করিতে পারিবে। সৎকার্যের ফলস্বরূপ ইহাই তাহাদের প্রাপ্য। এই সকল অপ্সর-অপ্সরাগণ সৌন্দর্যের সুধা ভাণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া কৃতী মানবদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। রক্ষণশীল হিন্দুগণ ইহার অন্য অর্থ করিয়া থাকেন। হিন্দুদর্শনে বলা হইয়াছে যে, মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে (ভগবানকে পাইবার চেষ্টা করিতে হইলে) সকল রিপুকে দমন করিয়া প্রলোভন ত্যাগ করিতে হইবে। এই সকল সৌন্দর্য ও ভোগবিলাসের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া মোক্ষের পথে যিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন, তিনি ভগবানকে পাইবার যোগ্য। এই সকল কিন্নর-কিন্নরীগণ আত্মদান করিয়া অপরকে আনন্দ দান করিতেন; কিন্তু জীবনকে পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারিতেন না। প্রতিটি মঙ্গলকার্যে আনন্দ দানের জন্য তাঁহাদের উপস্থিতি কাম্য ছিল; কিন্তু তাঁহারা সামাজিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ প্রভৃতিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এমন কি, প্রেমনিবেদনও দেবতাদিগের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। দেবতা ও দেবতাদিগের অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রেম নিবেদন করা নিষিদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ উর্বশী ও পুরুরবার প্রেমের আখ্যানটির

উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরুরবার প্রতি আসক্তিবশতঃ দেব-নর্তকী উর্বশীকে নিদারুণ দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেবতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অপ্সরা মেনকাকে বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করিয়া নিজেকে উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র হৃদয়ের সকল কোমল বৃত্তিকে দমন করিয়া মাতৃত্ব বিসর্জ্জন দিয়া কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইঁহারা নারীর যাহা কাম্য তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।"

এই সকল সামাজিক মর্যাদা হইতে বঞ্চিত ললনাগণ ইন্দ্রাদির হাতের ক্রীড়নক ছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের শিল্পচাতুর্য বিশেষভাবে সমাদৃত হইত।

নৃত্য শুধুমাত্র অপ্সর-অপ্সরা অথবা কিন্নর-কিন্নরীদিগের ভিতরই প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। দেবকুলের শ্রেষ্ঠা দেবীগণের ভিতরও প্রসারিত ছিল। শিবজায়া পার্বতী নৃত্যকুশলা ছিলেন এবং লাস্য নৃত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাণকন্যা উষা ছিলেন নৃত্যপটীয়সী, সরস্বতী সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। এমন কি বিষ্ণুও মোহিনীরূপ ধরিয়া বিশেষ নৃত্য-চাতুর্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শিব নৃত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সকল দেব-দেবী, অপ্সর-অপ্সরা, দেবলোক, ইন্দ্রসভা প্রভৃতি মনুষ্যলোকে অজানা রহিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত নাটকে, পুরাণে, মহাভারতে, রামায়ণে, হিন্দুধর্মগ্রন্থে আমরা ইহাদের বিষয় জানিয়া কল্পনার জাল বয়ন করি। মানুষ আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া এই সকল দেবদেবীগণের মহৎ চরিত্র ও তৎকালীন সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। ইহার সত্য-মিথ্যা বিচার আমরা করি না। আমরা জানি, দেবতাগণ তাঁহাদের কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন এবং ভক্তগণ পরবর্তী যুগে তাহাই প্রচার

করিয়াছেন। সুতরাং দেবলোক চিরদিনই আমাদের নিকট একটি রহস্যময় কল্পনার বস্তু রহিয়া গিয়াছে।

যে সকল নৃত্যপটীয়সী অপ্সরাগণ দেবসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মঞ্জুকেশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী, সুলোচনা, সৌদামিনী, দেবদত্তা, দেবসেনা, মনোরমা, সুদতী, সুন্দরী, বিদগ্ধা, সুমালা, সন্তুতি, সুনন্দা, সুমুখী, মাগধী, অর্জুনী, সরলা, কেরলা, ধৃতি, নন্দা, সপুষ্কলা, কলমা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন উর্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি।

সঙ্গীতের ইতিহাসে গন্ধর্বদিগের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। ইঁহারা দেবলোকে বিচরণ করিতেন এবং সঙ্গীতের সাধনা করিতেন। দেবতা ও মানবের মধ্যে সকল শ্রেণীর সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শিল্পী হিসাবে সকল সমাজেই ইঁহারা আদৃত হইতেন এবং সর্বত্র ইঁহাদের গতি ছিল। কিন্তু ইহা স্বর্গের কথা। মর্তেও এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত পূজার উপচার হিসাবে দেবতার চরণে নিবেদিত হইত। যাঁহারা দেবতার পাদপদ্মে নিবেদিত সঙ্গীতের অধিকারিণী হইতেন, তাঁহাদিগকে দেবতার চরণে চিরদিনের জন্য উৎসর্গ করা হইত। ইঁহাদিগকে বলা হইত দেবদাসী। এই প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের দেবদাসী মূর্তি এবং নর্তকের মূর্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল দেবদাসীগণ সমাজে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়াই ইঁহাদের মূর্তি পাষাণ ফলকে খোদিত হইয়াছিল।

সেই যুগে সমাজে জাতিভেদ ছিল না। সুতরাং উচ্চ নীচ ভেদাভেদের প্রশ্ন ওঠে না। তবে দেবতার পদতলে সর্বাপেক্ষা পবিত্র জিনিষটিকে নিবেদন করা মানুষের স্বভাবজাত প্রেরণা। সেইজন্য দেবদাসীগণও দেবতার নিকট নিবেদিত বলিয়া সকলের

শ্রদ্ধা অর্জন করিতেন। দেবদাসী প্রথা কিরূপে প্রবর্তিত হইল তাহার একটি সুন্দর কিংবদন্তী আছে। একবার ইন্দ্রসভার নৃত্য-বাসরে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, নৃত্যপটীয়সী উর্বশীর দৃষ্টি ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের সহিত মিলিত হইল। ইহাতে প্রেমমুগ্ধা উর্বশীর তালভঙ্গ হইলে অগস্ত্যমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেবদাসীরূপে মানবজন্ম ধারণ করিতে বলিলেন এবং জয়ন্তকে 'বংশদণ্ড হও' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। উর্বশী ও জয়ন্ত অত্যন্ত কাতর ও ভীত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহাদের কাতরতায় ব্যথিত মুনি বলিলেন যে, দেবতার সম্মুখে নৃত্য করিবার জন্য যখন উর্বশীকে বংশদণ্ডের (থালাই কোল) সহিত দেবতার সম্মুখে উৎসর্গ করা হইবে, তখন সেই শুভ মুহূর্তে তাঁহাদের অভিশাপ মোচন হইবে। ইহা তো কিংবদন্তী। কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণে দেবদাসী প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। অনার্যগণ খুবই সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহাদের সভ্যতা হইতে মূর্তিপূজা, দেবদাসী প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যে অনার্যদিগের ভিতর মাতৃতন্ত্রতার প্রাবল্য ছিল। অনেক সময় নারীগণ পুরোহিতের স্থান অধিকার করিতেন। দেবার্চনার অঙ্গস্বরূপ নৃত্যগীতও করিতেন। আর্য অভিযানের ফলে অনার্যগণ পরাজিত হইলেন। ফলস্বরূপ এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন হইল। কালক্রমে আর্যগণের ভিতরও মূর্তি পূজার প্রচলন হইল। আর্যগণ অনার্যের দেবতাদিগকে পূজা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-দিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে পূজার অংশটুকু ব্রাহ্মণের হস্তে আসিল এবং নারীগণ শুধুই সঙ্গীতের দায়িত্বটুকু পাইলেন এবং দেবদাসী হইয়া সঙ্গীতে দেবতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবদাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। মনে হয়, এই কারণেই দ্রাবিড় সভ্যতায় দেবদাসী মূর্তি দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন ভারতের সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে নৃত্যশিল্পী

অথবা সঙ্গীতশিল্পীদিগের স্থান কোথায় ছিল তাহার একটি সাধারণ ধারণা জন্মে। বৈদিক যুগে আর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে। আর্যগণ দলবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতেন। নারীগণও পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার ভোগ করিতেন। যজ্ঞক্রিয়ায় পুরনারীগণও সঙ্গীত ও নৃত্যাদির মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করিতেন। এইরূপ নৃত্যগীত নিন্দার্হ ছিল না এবং ইহাতে সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়মাবলীও কঠোরভাবে অনুসৃত হইত না। কারণ মনে হয়, তখনও পর্যন্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন বিধি বদ্ধ শাস্ত্র রচিত হয় নাই। কিন্তু বেদই যে ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের মূল ইহা পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। সেই যুগে সামাজিক অনুশাসন এইরূপ দৃঢ় ছিল না। পেশার গ্রহণে ও পরিবর্তনে কোন বাধাই ছিল না। সমাজের সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশু অবস্থায় নৃত্যকলা বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। মানবিক আবেগে সকলে নৃত্য করিতেন।

বৈদিকযুগের অন্তে সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শেষার্ধে জাতিভেদের প্রথা প্রখর হইয়া উঠে। বৃত্তিকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের সমাজের সৃষ্টি হয়। আর্য-অনার্যের বিবাদের ফলস্বরূপ পরাজিত অনার্যগণ দাস বা শূদ্র শ্রেণীতে পরিণত হইলেন। শূদ্র সমাজের সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের বলিয়া অভিহিত হইলেন এবং তাঁহাদের জন্য দাসত্ব ব্যতীত আর কোন বৃত্তিই রহিল না। এক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য সমাজ প্রগতিবিরোধী হইল। কালক্রমে এই শূদ্রগণই নটবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। খৃঃ পূঃ প্রথম সহস্রকের প্রথমার্ধে যখন আর্য ও অনার্যের মিশ্রনের ফলে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হয়, তখনই আর্যদিগের পুরোহিত শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের উদ্ভব হয়। ইহার সংকেত ঋগ্বেদে আছে। বেদে যদিও শ্রেণী-বিভাগের কথা সূচিত হইয়াছে, তথাপি কর্মহিসাবে বর্ণ বিভাগের

কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আছে—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখং হ্যাসীদ্বাহু রাজন্যকঃ স্মৃতঃ।
উরুস্তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রস্ত্বজায়ত॥

সেই পরমপুরুষের মুখ হইতেছেন ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল রাজন্য (ক্ষত্রিয়) উরুদ্বয় বৈশ্য এবং পদযুগল শূদ্র বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু এই বেদ তো বিজেতা আর্যগণ কর্তৃকই কৃত। এই বেদেই ক্ষত্রিয়রাজ জনক পাণ্ডিত্যের গুণে ব্রাহ্মণ হন। সুতরাং আর্যগণই জম্বুদ্বীপের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং কর্মের মাধ্যমে বর্ণবিভাগ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ কর্মগুণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, কিন্তু শূদ্রগণ যখনই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে গিয়াছেন, তখনই তাহার বিনাশ হইয়াছে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বিজেতা আর্যগণ বিজিত অনার্যগণকে নিম্নবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, বৈদিক যুগের প্রথমার্ধে জাতি বিভাগের কেবলমাত্র সূচনা হইয়াছিল বলিয়া এত প্রবল ছিল না। তাহার কারণ, আর্যগণ যখন ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তখন সমাজও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল বলিয়াই কোনও সামগ্রিক রূপ ধারণ করিতে পারে নাই।

খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে পাণিনির ব্যাকরণে 'কৃশাশ্ব' ও 'শিলালি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, শিলালি অন্যূন চারি সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। যাঁহারা গাহিতেন এবং নাচিতেন তাঁহাদিগকে 'কৃশাশ্ব' এবং যাঁহারা শুধুই গান করিতেন তাঁহাদিগকে 'শিলালি' বলা হইত। বাজসনেয় সংহিতায় 'সূত' ও 'শৈলূষ' শব্দ দুইটি পাওয়া যায়—"নৃত্যায় সূতং গীতায় শৈলূষং"।—'মনু সংহিতার' দশম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, ক্ষত্রিয় কর্তৃক ব্রাহ্মণ কন্যাতে জাত সন্তান 'সূত' বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্মপুরাণেও শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা—"বৃত্তাম্বেষী নটানাস্তু স তু শৈলূষিকঃ স্মৃতঃ। "অর্থাৎ নটদিগের মধ্যে যে নট (শৈলূষ) নাট্যকে জীবিকা-

রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে শৈলূষিক বলে। তখনও পর্যন্ত এই সকল সঙ্গীতশিল্পীগণ সমাজে নিন্দার্হ ছিলেন না। কারণ, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারগণ ইঁহাদের বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই।

ইহার পরবর্ত্তী যুগ হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে এই সকল নট নটীগণ একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া সামাজিক অধিকার হারাইলেন। মনে হয়, এই সময় বিশেষ সামাজিক আলোড়নের ফলে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রনের ফলে আর্যগণের ভিতর যে মূর্তি পূজার প্রচলন হইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ সমাজ মূর্তি পূজা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। মনে হয়, ইঁহারাই সঙ্গীতের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ইঁহারা বেদের অনুগামী রহিলেন। মনুর সময় জাতিভেদ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করে এবং হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধ গুলিও প্রবল হইয়া উঠে। মনুর বিধানে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণগণ সাগ্নিক হইবেন এবং দেবার্চনা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ বেদগান করিবেন মাত্র। শিব ও বিষ্ণুর আরাধনার জন্য ব্রাহ্মণগণের নৃত্যগীতাদি নিষিদ্ধ ছিল। যদিও আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ হইয়াছিল, তথাপি রক্ষণশীল আর্যগণ অনার্য সংস্কৃতিকে মনে প্রাণে মানিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। সেইজন্য যখন আর্য সংস্কৃতি অনার্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে লাগিল, তখনই রক্ষণশীল আর্যগণ তাহার বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। পরাজিত অনার্যগণ অধিকতর সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ক্রমশঃ আর্যসমাজেও সঙ্গীত জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা হইলেও শূদ্রবংশজাত নট অথবা নটীগণ সামাজিক মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন।

খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। কৌটিল্যের সময় রাজতন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজা কিরূপ হইবেন এবং রাজার কর্তব্য কিরূপ হইবে তাহা পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণিত আছে। চতুর্বর্ণের জন্য

নির্দিষ্ট জীবিকা অনুসারে শূদ্র সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কৌটিল্য বলিয়াছেন যে, নট-নটীগণ শূদ্র বংশোদ্ভব হইবে। নাট্যশালা গ্রামের ভিতর হওয়া উচিত নহে। কারণ, ইহাতে গ্রামবাসীগণের বাধা সৃষ্টি হয়। কুশীলবগণকে শূদ্র বলা হইয়াছে এবং তাঁহারা বহিষ্কারের যোগ্য ছিলেন। খৃঃ ২০০ অব্দে রচিতপূঃ মনু সংহিতায় নট-নটীগণকে হেয় জ্ঞান করা হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণদিগকে এই পেশা গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অভিনেতার স্ত্রীর সহিত কাহারও অবৈধ সম্বন্ধ হইলেও মনু তাহার মৃদু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারণ, অভিনেতা স্বয়ং অর্থের লোভে স্ত্রীকে অন্যের নিকট সমর্পন করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিতেন। এইজন্য নটের নামান্তর 'জায়াজীব'। মনু নট ও মল্লের পেশা সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর বলিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য এবং মনু উভয়ই বলিয়াছেন যে, কুশীলবের কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। কৌটিল্য ও মনুর সময় জাতিভেদ প্রথা যে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল এবং নটনটীগণ যে ব্রাহ্মণদিগের ঘৃণার লক্ষ্যস্থল হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। মনু বলিয়াছেন, কোনো ব্রাহ্মণের রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার সহিত ভোজন করা উচিত নহে। ইহার কারণ নট-নটীগণের উৎপত্তি শূদ্র হইতে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, নটের স্ত্রী যাহাকে প্রয়োজন তাহাকেই ভজনা করে। এইজন্য নটী ব্যাপক অর্থে গণিকার সহিত সমার্থক।

তবে একটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য যে, অনার্যগণ বিজিত ছিলেন বলিয়া দাস অথবা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। দাসগণ স্বাধীন ছিলেন না। অন্যান্য তিন বর্ণ তাঁহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতেন। অনেক সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে নটনটীগণকে হীন পন্থা অবলম্বন করিতে হইত এবং তাঁহাদের সকল সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত। এইরূপে জাতিভেদের প্রাবল্যে বৈদিকযুগের সহজ, সরল, গ্রাম্যজীবন জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। সামাজিক বিবর্তনের সহিত

সঙ্গীতেরও বিবর্তন হইতে লাগিল এবং তাহাও জটিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গীত অন্য রূপ পরিগ্রহ করিল। ভরত, নট, নটী, কুশীলব, কৃশাশ্ব, শিলালি, সূত্রধর প্রভৃতি সঙ্গীতজীবিগণ সঙ্গীত-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া সঙ্গীতকে জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়া একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইলেন। অমরকোষে দেখা যায় যে, নটদিগকে বহু নামে অভিহিত করা হইত—

"শৈলালিনস্তু শৈলূষা জায়াজীবাঃ কৃশাশ্বিনঃ।
ভরতা ইত্যপি নটাশ্চারণাস্তু কুশীলবাঃ॥"

'ভরত' বলিতে সাধারণতঃ নটগণকেই বুঝায়। কিন্তু 'ভরত' বলিয়া একটি জাতির উল্লেখও পাওয়া যায়। অথর্বসংহিতার যুগে আর্যগণ মধ্যভারত ও পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ভরতগণই ইহার পুরোধা ছিলেন। সুতরাং সেই জাতি হইতে উদ্ভূত নটগণ 'ভরত' নামে অভিহিত হইয়াছেন কি না তাহাও ভাবিবার বিষয়। যাহা হউক, সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জনের জন্য এই সকল নট ও নটীগণ সঙ্গীতশিল্পের প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বেদ হইতে জাত সঙ্গীতকে বিশেষ পদ্ধতিতে অনুসরণের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইল। এইরূপে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উদ্ভব হইল।

কিন্তু একটি আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে যে, বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ও গৃহযুদ্ধের ফলেও সঙ্গীতের কোন হানি হয় নাই। সেইজন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজগণের সময়েও সঙ্গীতের রথচক্র অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। শুদ্ধোদনের অন্তঃপুরে নর্তকীদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহারা উদাসীন রাজকুমারের মন হরণ করিবার জন্য নৃত্য করিতেন। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য 'মার'এর কন্যাগণকেও নৃত্য করিতে হইয়াছিল। বুদ্ধের উপদেশে বহু নটী পূর্ব জীবিকা এবং জীবনের সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এইরূপ বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে 'জীবে দয়া' করিবার জন্য আর একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। 'অমিয় নিমাই চরিতে' আছে যে, দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভু যখন 'জিজরী' নগরের 'খাণ্ডবা'কে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি 'মুরারি'গণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যে কন্যাগণের বিবাহ হইত না, তাঁহাদের খাণ্ডবার সহিত বিবাহ হইত। খাণ্ডবার মন্দির-কর্তৃপক্ষ ইঁহাদিগকে পালন করিতেন এবং ইঁহারা ঠাকুরের সম্মুখে নৃত্য করিতেন। ইঁহাদিগকে 'মুরারি' বলা হইত। কালক্রমে ইঁহাদিগের ভিতর ব্যভিচার প্রবেশ করে এবং ইঁহারা সমাজে ঘৃণিত, নিন্দিত এবং পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করিতে থাকেন। মহাপ্রভুর কৃপায় ইঁহারাও উদ্ধার পাইয়াছিলেন।

বহু প্রাচীনকালেও জনসাধারণের জন্য যে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইত, তাহাতে আনন্দদানের জন্য নটনটীগণকে অংশ গ্রহণ করিতে হইত। মৌর্যযুগে বিম্বিসারের রাজত্বকালে এইরূপ একটি আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হইত। ইহাকে পালি ভাষায় 'গিরগ্‌গা সমজ্জা' বলা হইত। 'গিরগ্‌গা সমজ্জা'তে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইত। নট-নটীগণ অভিনয়ের দ্বারা উৎসবকে আনন্দোজ্জ্বল করিয়া তুলিতেন। ইহাতে নৃত্যগীতেরও আয়োজন করা হইত। অশোকের সময় পর্যন্ত এই 'সমজ্জার' ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী সময়ে অশোক কিন্তু ইহাকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কয়েকটি বিশেষ যুগে সঙ্গীত রাজা মহারাজদিগের নিকট প্রিয় হওয়ায় অভিজাত শ্রেণীর মহিলা মহলেও ইহার বিস্তৃতি ঘটে। মহাকবি কালিদাস কৃত 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে পাওয়া যায় যে, রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকাকে বিবাহ করিবার পূর্বে তাহার নৃত্যকলাদির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 'কথাসরিৎসাগরে' আছে যে, বৎসরাজ উদয়ন একজন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। উজ্জয়িনীরাজ চন্দ্রমহাসেন তাঁহার কন্যা বাসবদত্তাকে সঙ্গীতে পারদর্শিনী করিবার জন্য কৌশলে উদয়নকে

বন্দী করিয়াছিলেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। উদয়নের সঙ্গীত চাতুর্যে মুগ্ধ হইয়া বাসবদত্তা তাঁহাকে বিবাহ করেন। এইরূপ অভিজাত শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষগণও যে বিলাস হিসাবে সঙ্গীতের চর্চা করিতেন, তাহার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। কালক্রমে নটনটীগণ এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেইজন্য কঠোর সামাজিক অনুশাসনের ফলে পরবর্তীকালে সঙ্গীত অভিজাত শ্রেণীর মহিলা মহল হইতে বিদায় লইয়াছিল।

কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহাতে নাট্যকার অথবা অভিনেতৃগণকেও সম্মানিত করা হইত। হর্ষচরিতে বাণভট্ট অভিনেতা অভিনেত্রীগণকে মিত্রস্থানীয় বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। 'প্রাক্কথনে' ভবভূতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সহিত মিত্রতার দাবী করিয়াছেন। তাঁহার নাটকের সূত্রধার এবং অভিনেত্রীগণ অবশ্যই সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতজ্ঞ হইবেন। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু নট-নটীগণের বিরুদ্ধে বিধান প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে যতখানি নিন্দনীয় ও সামাজিক মর্যাদা হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের তাহা প্রাপ্য ছিল না। বরং বলা যাইতে পারে, বিজিতের উপর বিজেতার মনোভাব লইয়াই তাঁহারা এই সুন্দর ললিতকলা ও তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকগণকে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ আর্যগণ ছিলেন বিজেতা। সেইজন্য আর্যগণ কর্তৃক আরোপিত উদ্দেশ্যমূলক সামাজিক অনুশাসনের ফলেই বিজিত শূদ্রদিগের দ্বারা বৃত্তিরূপে গ্রহণীয় সঙ্গীত বিজেতৃ-সমাজে নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু আর্যগণ ইহাকে বৃত্তি রূপে নহে, বিলাসরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য মনে হয়, ইহা অভিজাত শ্রেণীতে দূষণীয় ছিল না।

নটীগণ যে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যোগীমারা গুহায় এক দেবদাসী ও চিত্রকরের নাম

খোদিত আছে। এই দেবদাসীর নাম ছিল সুতনুকা এবং চিত্রকরের নাম ছিল দেবদত্ত। সুতনুকা অভিনেত্রী এবং নর্তকী ছিল। এইস্থলে দেবদাসী অর্থে গণিকা অথবা অভিনেত্রী। ইহাতে খোদিত আছে যে, সুতনুকা বালিকাদিগের বিশ্রামের জন্য এই গুহা নির্মাণ করাইয়াছিল এবং দেবদত্ত ইহার চিত্রকর ছিল। সীতাবেঙ্গা গুহাও রঙ্গশালা, নৃত্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতিরূপে ব্যবহৃত হইত। এইস্থানে কাব্যপাঠ হইত এবং রূপ-রস-আনন্দকে উপভোগ করিবার ইহা প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। কালোচিত প্রথানুসারে এই সকল গুহা, গ্রাম অথবা নগরের বাহিরে থাকিত। সুতরাং ইহা হইতে নটীগণের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, খৃষ্টপূর্ব হইতে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নটনটীগণের ভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছিল এবং নট নটীগণও সমাজ প্রদত্ত এই কলঙ্কময় জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভরত কর্তৃক প্রচারিত নাট্যশাস্ত্র, মনে হয়, এই বিধানের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অবশ্য নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণের উল্লেখও করিতে পারি। কারণ, অনেকে মনে করেন 'অভিনয় দর্পণ' 'নাট্যশাস্ত্র' অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন। যাহাই হউক, এই সকল নাট্যশাস্ত্র নট, নটী, সূত্রধার প্রভৃতির সম্মুখে একটি মহান আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নট, নটী, সূত্রধার, পারিপার্শ্বিক প্রভৃতির নিজ নিজ ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা বিপথগামী নটসমাজকে সচেতন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিরুদ্ধ-বাদীদিগের যুক্তিকেও খণ্ডন করিবার জন্য শুভলগ্নে দেবতাশ্রেষ্ঠ মহেশ্বর কর্তৃক সঙ্গীতের যে জন্ম হইয়াছিল তাহার বর্ণনাও করা হইয়াছে। দেব, দেবী, মুনি ও ঋষিগণের উল্লেখ করা হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন নাট্যশাস্ত্রকারগণ সঙ্গীতের মহান আদর্শ ও অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রকারগণের ভিতর নন্দিকেশ্বর, ভরত, কোহল, নারদ, শার্ঙ্গদেব

প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে আর্যদের অপাংক্তেয় সঙ্গীত অভিজাত শ্রেণীর ভিতরও মর্যাদা লাভ করে, এ কথা যে পূর্বেও উক্ত হইয়াছে, তাহার মূলে ছিল উল্লিখিত নাট্যশাস্ত্রকারগণের সাধনা ও প্রচার। তাঁহাদের মতে দেবকুল হইতে সঙ্গীতের জন্ম বলিয়া ইহা দেবতার ভোগ্য এবং সঙ্গীত শিল্পীগণও দেবতারই চরণে নিবেদিত হইবার উপযুক্ত। ইহা সত্য যে, শুধু অভিজাত শ্রেণী নহে, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে ভরত সকলকেই নাট্যে সমান অধিকার দিয়াছিলেন। এইরূপে নাট্যকার, নট, নটী, সূত্রকার, নর্ত্তক, নর্তকী সকলেই যথাযোগ্য সন্মান পাইতেন।

আনুমানিক একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দেবদাসীগণের ভিতর কোন ব্যভিচার প্রবেশ করে নাই। এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মন্দির নির্মিত হইতে থাকে। ভারতীয় রাজগণ ইহার উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সকল রাজাদিগের ভিতর রাষ্ট্রকূট, চোল ও পল্লব বংশীয়গণ প্রধান ছিলেন। ঐ সকল মন্দিরে দেবদাসীদিগকে নিযুক্ত করা হয়। দেবদাসী প্রথা শুধু ভারতে নহে, এশিয়া এবং ইউরোপেও প্রচলিত ছিল। Ruby Ginner তাঁহার "The Gateway to the Dance"এ গ্রীক দেবদাসীগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গ্রীক দেবদাসীগণ বেগুনী রঙের পাড়ওয়ালা সাদা রঙের পোষাক পরিতেন। তাঁহাদের মাথায় ওড়না থাকিত। তাঁহারা মন্দিরের অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতেন, উপচার আনিতেন এবং প্রার্থনা করিতেন। গ্রীসে দেবদাসীগণের ভিতর যে সকল নৃত্য প্রচলিত ছিল, তাহার ভিতর 'ভেষ্টাল ভার্জিন' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এক জায়গায় Ginner উল্লেখ করিয়াছেন—"Long robed Ionians delighted the god with dancing and song."

ভারতের মন্দিরের দেবদাসীগণ বিশুদ্ধ নাট্যশাস্ত্র মতে নৃত্য করিতেন। এক একটি মন্দিরে প্রায় চারিশত হইতে পাঁচশত জন করিয়া দেবদাসী থাকিতেন। দেবদাসীগণের সহিত নৃত্যশিক্ষক ও

বাদ্যকর থাকিতেন। ১০০৩ হইতে ১০০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজরাজা কর্তৃক যে বৃহদেশ্বরের মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল, তাহার গাত্রে খোদিত আছে যে, তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ৪০০ দেবদাসী, নৃত্য-শিক্ষক এবং বাদ্যকর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মন্দিরের অর্থকোষ হইতে ইঁহাদের ব্যয়ভার বহন করা হইত এবং ইঁহারা শিল্পচর্চার দ্বারা মন্দিরের দেবতার সেবা করিতেন।

দেবদাসীগণের গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত করিবার অধিকার ছিল না। তাঁহারা দেবতাকেই স্বামী অথবা প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিতেন। প্রথমে বালিকাদিগকে দেবতার পায়ে নিবেদন করা হইত। ইহার পর সঙ্গীত-গুরুগণ তাঁহাদিগকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন। দেবতার সহিত বিবাহ দিবার সময় ইঁহাদিগের গলায় টালি অথবা বটু বাঁধা হইত। তখন হইতে তাঁহাদিগকে "নিত্য-সুমঙ্গলী" বলা হইত, অর্থাৎ ইঁহারা হইতেন চির সৌভাগ্যবতী।

নৃত্য শিক্ষা আরম্ভ করিবার সময় দেবতার পূজা করা হইত এবং পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইত। পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া দেবদাসীগণ হস্তে রেশমী কাপড়মণ্ডিত একটি বংশদণ্ড ধারণ করিয়া নৃত্যশিক্ষা পর্ব আরম্ভ করিতেন। এই বংশদণ্ডটি শাপভ্রষ্ট জয়ন্তের প্রতীক। সাত বৎসর পর শিক্ষা সমাপনান্তে মন্দিরে দেবতা ও রাজগণের সম্মুখে তাঁহার 'আরাঙ্গাট্রেল'[১] হইত। দক্ষিণ ভারতে এখনও পর্যন্ত 'আরাঙ্গাট্রেল' হইয়া থাকে।

চোড়গঙ্গদেব কর্তৃক নির্মিত উড়িষ্যায় পুরীর মন্দিরে দেবদাসী নৃত্য অপরিহার্য ছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, নবম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিক গোলযোগ ব্যতীত একদিনের জন্যেও মন্দিরের নৃত্য বন্ধ হয় নাই।

উড়িষ্যায় এই সকল দেবদাসীগণকে 'মাহারী' বলা হইত। এই

১) শিক্ষা সমাপনান্তে দেবতার সম্মুখে শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদর্শিত প্রথম নৃত্যোৎসব।

সকল মাহারীগণ 'সুরবেশ্যা' অথবা 'নাচুনী' বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। দেবদাসীগণের ভিতরও শ্রেণীভেদ ছিল। যাঁহারা সঙ্গীত পারদর্শিনী, তাঁহাদিগকে 'গীতগণি' এবং যাঁহারা চামরধারিণী তাঁহাদিগকে 'গৌরগণি' বলা হইয়া থাকে। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের দেবদাসীগণ বৈষ্ণব এবং ভুবনেশ্বরের একলিঙ্গের মন্দিরের সেবাদাসীগণ শৈব। মাহারীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—'ভিতরগণি' ও 'বাহারগণি'। ভিতরগণিগণ রাত্রিতে শৃঙ্গারের সময় বড় দেউলে প্রবেশ করিতে পারিতেন এবং নৃত্য গীতের দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করিতেন। 'বাহারগণিগণ' মন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরে নৃত্য করিতেন। ইঁহাদের অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ইহা ব্যতীত মাহারীদিগের ভিতর আরও চারিটি শ্রেণী ছিল; যথা—পাতুয়ারী, রাজঅঙ্গিলা, গহন এবং নাচুনী। ঐতিহাসিক গবেষণাগার হইতে যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, মাহারীগণ সাত্ত্বিক জীবন যাপন করিতেন। তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং পুরুষ সঙ্গ বর্জন করিতেন। মন্দিরের দেবতাদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাহ হইত এবং মন্দিরে দুইবার করিয়া তাঁহাদের নাচিতে হইত। নাচিবার পূর্বে স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। তথায় রাজগুরু স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ড লইয়া উপস্থিত থাকিতেন। মাহারীগণ প্রথমে দেবতা ও পরে রাজগুরুকে প্রণাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিতেন। নাচিবার সময় একমাত্র দেবতা ব্যতীত আর কিছু চিন্তা করিবার নিয়ম ছিল না। মাহারীগণের জীবনযাত্রা প্রণালী হইতে আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দেবদাসীগণের সম্বন্ধেও সাধারণ ভাবে একটি ধারণা করিয়া লইতে পারি। ইহা স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, ইঁহারা ধর্মপ্রবণ ও সৎ ছিলেন।

দক্ষিণ ভারতীয় দেবদাসীগণের ভিতরও শ্রেণী বিভাগ ছিল। প্রচলিত রীতি-নীতি প্রায় একই প্রকার ছিল। ইঁহারা দেবদাসী, রাজদাসী, ও অলঙ্কারদাসী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন।

এখানেও দেবদাসীগণ মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতার সম্মুখে নৃত্য করিতেন। বাহারগণিগণের ন্যায় রাজদাসীগণের মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাঁহারা ধ্বজস্তম্ভের সম্মুখে নৃত্য করিতেন। অনেক সময় রাজদাসীগণ রাজকীয় উৎসবেও নৃত্য করিতেন। অলঙ্কার দাসীগণ বিবাহ অথবা সামাজিক উৎসবে নৃত্য করিতেন। দক্ষিণ ভারতীয় দেবদাসীগণের ভিতর অধিকাংশই শৈব।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে মণিপুরেও দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল এবং এখনও পর্যন্ত আছে। মণিপুরের মন্দিরে দেবদাসী ও দেবদাস উভয়ই ভগবানের সেবা করিতে পারিতেন। ইঁহাদিগকে যথাক্রমে 'এ্যামাইবী' ও 'এ্যামাইবা' বলা হয়। শিশু বয়স হইতে ইঁহাদের দেহে 'ম্যাইবী' অথবা 'ম্যাইবা' হইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাহারও হয় ত মাথায় জটা দেখা দেয়। কেহ হয় ত বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া পড়েন। কেহ হয় ত ভগবানের নাম শোনা মাত্র সাত্ত্বিক ভাবাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাদিগকে 'ম্যাইবী' বা 'ম্যাইবা' করা হয়। ইঁহারা কখনও কখনও মূর্ছিত হইয়া ভবিষ্যৎ বাণী করেন। এই সকল ম্যাইবা ও ম্যাইবীগণ বিবাহাদি করিয়া সংসার করেন না। সকল প্রকার বিলাসিতা বর্জন করিয়া ইঁহারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন। 'লাইহারাওয়া' নৃত্যের সময় ইঁহারা প্রধান অংশ গ্রহণ করেন এবং নৃত্যমণ্ডলী পরিচালনা করেন। 'লাইহারাওয়া' নৃত্যের পূর্বে একটি ঘোড়াকে শ্বেত পতাকার দ্বারা সজ্জিত করিয়া শোভা-যাত্রার পুরোভাগে রাখিয়া শোভাযাত্রীগণ নদী অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় এ্যামাইবী জল হইতে জীবের সৃষ্টি করিয়া গ্রামের প্রান্তে 'উমঙ্গলাই'র (বনদেব—লাইনিংথো ও বনদেবী—লাইরেম্বীর) পূজা করেন। ইহার পর দশ দিকের পূজা (পূর্বরঙ্গ) করিয়া তাণ্ডব ও লাস্য ভঙ্গী সহকারে নৃত্য করেন। ম্যাইবী প্রথম গীত সুরু করিয়া নৃত্য করেন এবং অন্যান্য নর্তকীগণ তাঁহাকে অনুসরণ করেন। এইরূপে

এ্যামাইবী ও এ্যামাইবাগণ লাইপোক (লাই—দেবতা, পোক—জল) এবং লসিং (তূলা), নৃত্যের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন; অর্থাৎ জলের ভিতর প্রথম জীবসৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া তূলার চাষের রূপায়ণের মাধ্যমে মানব জন্মের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন। পূজা সমাপনান্তেও তাঁহারা শুদ্ধচিত্তে নৃত্য করেন। এই সকল এ্যামাইবীগণ ইচ্ছা করিলে এই জীবন পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করিতে পারেন। কিন্তু তখন তাঁহারা আর 'এ্যামাইবী' থাকিবেন না। ভারতের অন্যান্য প্রান্তে দেবদাসী প্রথা অবলুপ্ত হইলেও মণিপুরে এই প্রথা এখনও পর্যন্ত প্রচলিত আছে।

তৎকালীন সমাজে নটী ও দেবদাসীগণের ভিতর একটি প্রভেদ ছিল। দেবদাসীগণ কেবলমাত্র দেবতার ভোগ্যা ছিলেন এবং মন্দির কর্তৃপক্ষ ইঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিতেন। তাঁহারা ধর্মের জন্য শুদ্ধ, পবিত্র ও সৎজীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য ছিলেন। ভক্তমণ্ডলী তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতেন এবং এই সঙ্গীতের আরাধনায় যোগদান করিতে পারিতেন। কোন সামাজিক দায়িত্ব ইঁহাদের ছিল না এবং ইঁহারা কোনদিনই বিবাহ করিতে পারিতেন না।

অপরপক্ষে নটীগণ এইরূপ কোন ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের সহিত সংযুক্ত ছিলেন না। তাঁহাদের নিকট পুরুষ সঙ্গ বর্জনীয় ছিল না। তাঁহাদের সঙ্গীত ছিল জনসাধারণের জন্য। রাজা, মহারাজ, অমাত্য, প্রজা সকলেই অর্থের বিনিময়ে সঙ্গীতরস ও সৌন্দর্যসুধা উপভোগ করিতে পারিতেন। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে ইঁহারা নৃত্যগীতও করিতেন ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেন। ইঁহারা ছিলেন গণিকাশ্রেণীভুক্ত।

দেবদাসীগণও কালক্রমে সামাজিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধা হারাইলেন। ইঁহাদিগের ভিতর ব্যভিচার প্রবেশ করিল। ইঁহারা দেবনর্তকী হইতে রাজনর্তকীতে রূপান্তরিত হইলেন; রাজা ও অমাত্যগণের চিত্ত-বিনোদনের জন্য রাজসভায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবভোগ্যা

রাজভোগ্যা হইলেন। লোকবৃদ্ধির প্রয়োজনেও তাঁহারা ধীরে ধীরে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বৈদেশিক আক্রমণ ইঁহাদের অধঃপতনের আর একটি কারণ।

১১০০ খৃষ্টাব্দে সোমনাথের মন্দির মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে বহু দেবদাসী বিদেশী শাসনকর্তাদিগের হস্তে বন্দিনী ও ধর্মচ্যুতা হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন। উত্তর ভারত বারবার আক্রান্ত হওয়াতে তথায় দেবদাসী প্রথা প্রায় উঠিয়া যায়। এইরূপে উত্তর ভারতে দেবদাসী প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হইলেও দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যাতে ইহা আরও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত রহিয়া গেল।

ঐস্লামিক অভিযানের ফলে পরাজিত রাজন্যবর্গ দেবদাসীগণকে সভানর্তকী ও রাজনর্তকীতে রূপান্তরিত হইতে বাধ্য করিলেন। উদাহরণস্বরূপ খুরদা রাজ্যের রামচন্দ্রদেবের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মোগলগণ রামচন্দ্রদেবকে জগন্নাথের মন্দিরে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিল। রামচন্দ্রদেব মাহারীগণকে খুরদার সভা নর্তকী করিলে তাঁহারা 'খুরদা নির্যোগ' বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং অচিরে পুরীরও সভানর্তকী হইলেন।

তাঞ্জোরের প্রথম ও দ্বিতীয় কোলাথুঙ্গা, দ্বিতীয় রাজরাজন ও তৃতীয় কোলাথুঙ্গা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সঙ্গীত শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি করেন। তৃতীয় কোলাথুঙ্গার রাজত্বের সময় তিরুভিদামারুথুর মন্দিরে নর্তক নর্তকীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। তাঁহাদের 'নট্টুভ নিলাই' এবং 'নট্টুভক্কনি' নামক বৃত্তি দেওয়া হইত। এই নর্তক-নর্তকীগণের ভিতর কেহ কেহ বিবাহ করিতে পারিতেন এবং 'স্ত্রীধন লাভ করিতেন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাবে ভারতের

(১) বিবাহকালে প্রাপ্য বহুমূল্য অলঙ্কারাদি এবং অস্থাবর সম্পত্তিকে স্ত্রীধন বলে।

জীবনযাত্রা যখন বিপর্যস্ত এবং ধর্ম আক্রান্ত, তখনই এই সকল দেব-দাসীগণের ভিতর অনাচার প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের ভিতর আর্থিক সমস্যা এইরূপ প্রবলরূপে দেখা দিয়াছিল যে, তাঁহারা বিকল্প জীবিকা গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক নর্ত্তক, নর্ত্তকী, নাট্যকার ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, যাঁহাদের দ্বারা সঙ্গীতের প্রবাহ শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কখনও রুদ্ধ হয় নাই। যাহার ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ ভারতের সঙ্গীত সুধা পান করিয়া তাপিত হৃদয়কে শীতল করিতেছে। পুরাকালে যাঁহারা নট নটী অথবা দেবদাসী ছিলেন, কালক্রমে মুসলমান ও ইংরাজযুগে তাঁহারাই 'বাঈজী' এবং তাঁহাদের শিক্ষাদাতাগণ 'ওস্তাদ' অথবা 'গুরু' বলিয়া অভিহিত হইলেন। ইঁহারাই বর্ত্তমানে ভারতীয় সঙ্গীতের ধারক ও বাহক।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমার্ধে সঙ্গীত প্রবাহ প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়-ছিল। জমিদার অথবা রাজা মহারাজ উপাধিধারী ব্যক্তিগণ এই সকল বাঈজীগণকে রক্ষিতা হিসাবে রাখিতেন। তাঁহারাই পারিষদগণের সহিত এই সঙ্গীতসুধা পানের অধিকারী ছিলেন। জনসাধারণ ইহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, এই সকল সঙ্গীত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাঁহাদের ঘৃণাও পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। সুতরাং জন-সাধারণের ভিতর ইহার চর্চাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব পর্যন্ত সঙ্গীত এইরূপ একটি পঙ্কিলময় আবর্তের ভিতর রুদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবার পর জমিদারী প্রথা লোপ পাইল এবং সঙ্গীতও পঙ্কিলময় গহ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া দুইকূল ভাসাইতে লাগিল।

আধুনিক যুগে সঙ্গীতদেবী পুনরায় নবরূপে পূজিতা হইতেছেন। নবজাগরণের যুগে সমাজের বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের সঙ্গীত গ্রহণে কোন বাধা নাই। সঙ্গীতপিপাসু মাত্রই

সঙ্গীতকে গ্রহণ করিতে পারেন। ললিতকলার উপাসকগণ ভেদাভেদ ভুলিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য ব্যাপকভাবে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিতে-ছেন। ইংরেজ রাজত্বে যাহা সঙ্কুচিত হইয়া লোপ পাইতে বসিয়াছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ এই কলার ব্যাপক অনুশীলন দেখা দিয়াছে।

———

নৃত্যে রসবিচার



"ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়-দর্পকন্দর্পদর্পহা।

জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ

নৃত্যে রসবিচার

হাসি-কান্না মানুষের জীবনে চক্রনেমিক্রমে নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে। এই আবর্ত্তনের ফলে মানব মনে আলো-ছায়ার সৃষ্টি করিয়া ইহা গভীর আবেগের সঞ্চার করিতেছে। সেই আবেগ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সমুদ্রের তরঙ্গের মত উদ্বেলিত হইয়া মুক্তার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। ব্যক্তিগত জীবনের এই আবেগ মথিত হৃদয়ের ভাব যখন কাব্য অথবা নাটকে রসঘন হইয়া ফুলের সুরভির মত বিশ্বমনকে সরস করিয়া তোলে, তখনই ইহা হইয়া উঠে অপূর্ব, অনবদ্য এবং তখনই সার্থক হয় রসসৃষ্টি। এই রসসৃষ্টি হয় ভাবের অবলম্বনে। ভাব হইল রসের মানসিক উপাদান। মানসিক উপাদানের জন্ম হয় বাস্তব জগতে। কিন্তু নাট্য অথবা কাব্যের মাধ্যমে ইহা পরিণতি লাভ করে রসের সৃষ্টিতে। এ, কে, কুমারস্বামী রস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শব্দ, ভঙ্গী ও উপস্থাপনার দ্বারা নাটকের গূঢ় অর্থ প্রকাশিত হয়।" যাহার দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাই ভাব। 'ভাব' হইতেছে 'কারণ'। ভাবের পরিণাম হইতেছে 'রস'। মানুষের মনে বহুপ্রকার ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। এই সকল ভাবই কাব্যে, শিল্পে ও নাট্যে রস নিষ্পত্তির কারণ হয়। এই রস-নিষ্পত্তি যখন হয়, তখন তাহা কাহারও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ থাকে না; তাহা সকলের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া সর্বজনীনতা লাভ করে। আস্বাদ্যমান রস যখনই রসিকমনে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে, তখনই উহা সার্থকতা লাভের যোগ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ভাবকে নিজের করিয়া

সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা। সাহিত্যের কাব্যের অথবা আর্টের সামগ্রী হইতেছে 'রস'। মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লইয়া তাহাই অন্যের মনে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে এবং তাহাই রস। ইহা যখন পরিণতি লাভ ক'রে তখন রস-নিষ্পত্তি ঘটে।"

আলঙ্কারিকগণ নানাভাবে রসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রসের সহিত কয়েকটি শব্দ নিত্য ব্যবহার্য; যথা রসবন্ত, রসিক ও রসাস্বাদন। রসের বিষয় আলোচনা করিতে হইলেই এই শব্দগুলির সহিত আমাদের পরিচয় থাকা আবশ্যক। যিনি রসে পরিপূর্ণ—তিনি রসবন্ত (নাট্যকার, কবি প্রভৃতি রসের স্রষ্টা), রসিক (যিনি রস উপভোগ করেন) এবং রসের গ্রহণ বা অনুভূতিকে রসাস্বাদন বলা হয়। ইহা নৃত্যেও প্রযোজ্য। আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন যে, সকলে রসের আস্বাদন করিতে পারেন না। কেবলমাত্র সহৃদয় সংবাদী মনই (অন্যের হৃদয়ের সংবাদ সম অনুভূতি দিয়া গ্রহণ করিতে পারে যে মন) রসের আস্বাদন করিতে পারে। এরূপ মন যখনই রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করে, তখনই রসসৃষ্টি সার্থক হয়।

মানুষের স্থায়ীভাব হইতে রসের সৃষ্টি হয়। যে ভাবটি মনের ভিতর অবিচল অবস্থায় থাকে তাহা স্থায়ীভাব। বিরুদ্ধ অথবা অবিরুদ্ধ কোন প্রকার সঞ্চারীভাবই স্থায়ীভাবের তিরোধান ঘটাইতে পারে না। আট প্রকার স্থায়ীভাবের উল্লেখ আছে, যথা—রতি, হাস শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। স্থায়ীভাবকে তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—বিভাব, অনুভাব ও সাত্ত্বিক ভাব।

"রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে
বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।"

লৌকিক জগতে যাহা রতিভাবাদির উদ্বোধক, কারণ বা হেতু, কাব্য ও নাট্য জগতে তাহাই বিভাব। শকুন্তলার রূপ, গুণ প্রভৃতির

দ্বারা দুষ্মন্তের মনে রতিভাবের উদয় হইল। এই সকল কারণগুলি কাব্যে ও নাট্যে বিভাব। এই বিভাব পুনরায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। যাহাকে অবলম্বন করিয়া রতিভাবের উদয় হয়, তাহাকে 'আলম্বন' বিভাব বলে, যথা শকুন্তলা, দুষ্মন্ত ইত্যাদি। যাহা রসকে উদ্দীপ্ত করে তাহা উদ্দীপন বিভাব; যেমন বেশভূষা, রূপ, দেশ, কাল, ভ্রমর ঝঙ্কার, মলয় পবন ইত্যাদি।

আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি কারণসমূহের দ্বারা উদ্দীপ্ত রতিভাবের বহিঃপ্রকাশরূপ কার্যকে অনুভাব বলে, যথা—সলজ্জ হাসি, ভ্রূকুটী, কটাক্ষ, বাহু-বিক্ষেপ ইত্যাদি। এক কথায় বলা যাইতে পারে বিভাব কারণ, অনুভাব কার্য। মূলভাবের পশ্চাতে ইহা প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহাকে অনুভাব বলে। পণ্ডিতগণ তিনপ্রকার অনুভাবের কথা বলিয়াছেন—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর এবং বাচিক। সাধারণতঃ 'উদ্ভাস্বর' ও 'বাচিক' নৃত্যে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু নৃত্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। রমণীগণের সত্ত্বগুণজনিত অলঙ্কার ২০ প্রকার। উজ্জ্বল নীলমণিতে অলঙ্কার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "নায়িকাগণের যৌবন অবস্থায় কান্তের প্রতি সর্বপ্রকারে অভিনিবেশ জন্য যে সকল সত্ত্বগুণজনিত অলঙ্কার উদিত হয়, তাহাদের সংখ্যা বিংশতি।" তাহার ভিতর ভাব, হাব ও হেলা—এই তিনটি অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য এই সাতটি অযত্নজ। অর্থাৎ ইহা স্বতঃপ্রকাশ পায়। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত এই দশটি স্বভাবজ অর্থাৎ নায়িকাদিগের স্বভাবতই ঘটিয়া থাকে।

ভাব—"শৃঙ্গার রসে নির্বিকার চিত্তে রতি নামক স্থায়িভাবের প্রাদুর্ভাব হইলে যে প্রথম বিক্রিয়া তাহাকেই ভাব বলে। নৃত্যে ভাবের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

হাব—যাহা গ্রীবার তির্যগ্‌ভাবযুক্ত ভ্রূ-নেত্রাদির বিকাশকারী এবং ভাব হইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশক, তাহাকে হাব বলে।

হেলা—ঐ ভাব যদি অধিকতর পরিস্ফুট ও শৃঙ্গারসূচক হয় তাহা হইলে তাহাকে হেলা বলে।

শোভা—রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের বিভূষণকে শোভা বলে।

কান্তি—রতিভাবের দ্বারা এই শোভাই উজ্জ্বলতর হইলে তাহাকে কান্তি বলে।

দীপ্তি—বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা যে কান্তি অতিশয়রূপে বিস্তৃতি লাভ করে, তাহাকে দীপ্তি বলে।

মাধুর্য—সর্বপ্রকার আচরণের মধ্য দিয়া সামগ্রিকভাবে যে চারিত্রিক সুষমা ব্যক্ত হয় তাহাকে মাধুর্য বলে।

প্রগল্‌ভতা—সম্ভোগ বিষয়ে নিঃশঙ্কভাবকে প্রগল্‌ভতা বলা হয়।

ঔদার্য—সকল অবস্থাতেই বিনয় প্রদর্শন করাকে ঔদার্য বলে।

ধৈর্য—উন্নত অবস্থায় চিত্তের যে স্থিরতা তাহাকে ধৈর্য বলে।

লীলা—রমণীয় বেশ ও ক্রিয়ার দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির যে অনুকরণ তাহাকে লীলা বলে।

বিলাস—প্রিয় সঙ্গমের জন্য স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদি কর্ম সকলের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাহাকে বিলাস বলে।

বিচ্ছিত্তি—যে বেশরচনা অল্প হইয়াও দেহকান্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে।

বিভ্রম—বল্লভ সমীপে অভিসার কালীন প্রবল মদনাবেগবশতঃ হার মাল্যাদি ভূষণের যে স্থান বিপর্যয়, তাহার নাম বিভ্রম।

কিলকিঞ্চিত—হর্ষ হেতু গর্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সাতটীর এককালীন প্রকাশের নাম কিলকিঞ্চিত।

মোট্টায়িত—কান্তের স্মরণ ও তদীয় বার্তাদি শ্রবণে কান্তবিষয়ক স্থায়ীভাবের ভাবনা হেতু হৃদয় মধ্যে যে অভিলাষের উদয় হয় তাহাকে মোট্টায়িত বলে।

কুট্টমিত—স্তন ও অধরাদির গ্রহণ হেতু হৃদয়ের প্রীতির উৎপত্তি

হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ প্রকাশ্যে ব্যথিতের ন্যায় কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশকে কুট্টমিত বলে।

বিব্বোক—গর্ব ও মান হেতু ইষ্ট অর্থাৎ কান্তদত্ত বস্তু অথবা কান্তের প্রতি যে অনাদর, তাহার নাম বিব্বোক।

ললিত—অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গী যদি ভ্রূ-বিলাসে মনোহর ও সুকুমার হয়, তাহা হইলে তাহাকে ললিত বলে।

বিকৃত—লজ্জা, মান ও ঈর্ষাদির দ্বারা যদি বক্তব্য বিষয় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিকৃত বলে।

অনেকে এই বিংশতি প্রকার অলঙ্কার ব্যতীত আরও অনেক অলঙ্কারের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাহা ভরত মুনির অভিপ্রেত নহে। তবে উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে এতদ্‌ভিন্ন আরও দুইটি অলঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে; যথা—মৌগ্ধ ও চকিত।

মৌগ্ধ—প্রিয়তমের সমীপে জ্ঞাত বস্তুর প্রতি অজ্ঞের ন্যায় যে জিজ্ঞাসা তাহাকে মৌগ্ধ বলে।

চকিত—প্রিয়তমের সম্মুখে ভয়ের অযোগ্য স্থানে যে গুরুতর ভয় তাহার নাম চকিত।

সাত্ত্বিক ভাব—ইহা অনুভাবেরই অন্তর্গত। মন সমাহিত হইলেই সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। সমাহিত মন বস্তু-জগতের প্রতি বিমুখ হইয়া উঠে এবং একটি গভীর অনুভূতির ভিতর ডুবিয়া যায়। এই অনুভূতি গাঢ় হইলে বাহ্যজ্ঞান লোপ করিয়া দেয়। ইহা অনু-ভাবের অন্তর্গত হইলেও ইহাকে অনুভাব বলা চলে না। সাত্ত্বিকভাব আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্চ্ছা)।

স্থায়ী ব্যতীত আরও অনেক প্রকার ভাব আমাদের মনে উদিত হয় এবং রসসৃষ্টিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ইহাদিগকে ব্যভিচারী অথবা সঞ্চারী ভাব নাম দেওয়া হইয়াছে। সঞ্চারীভাবের নিজস্ব রসমূর্তি নাই। ইহারা স্থায়ী ভাবের পরিণতি আটটি রসকে

পরিপুষ্ট করে। সঞ্চারী ভাব তেত্রিশ প্রকার—নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, স্মৃতি, আলস্য, জড়তা, ব্রীড়া, অবহিত্থা, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি, বোধ ও মরণ।

ইহাদের পরিচয়—

নির্বেদ—খেদ। মহার্তিজাত ঈর্ষ্যাহেতু স্বঅবমাননায় ইহার উৎপত্তি। (ভক্তিরসামৃত)

বিষাদ—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ।

দৈন্য—অদর্শনজনিত দুঃখ হেতু দীনভাব।

গ্লানি—দুই প্রকার, শ্রমজনিত ও মনের পীড়াজনিত। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরে গ্লানি হয়। বিরহজনিত দুঃখে মনে গ্লানি আসে। (উজ্জ্বল নীলমণি)

শ্রম—পরিশ্রমহেতু শ্রম, পদভ্রমণজনিত শ্রম, নৃত্যহেতু শ্রম, রতিহেতু শ্রম।

মদ—মধুপানজ মত্ততা (ভক্তিরসামৃত)

গর্ব—অহংকার। সৌভাগ্য হইতে ইহার জন্ম।

শঙ্কা—চৌর্যহেতু বা অপরাধ হেতু আশঙ্কা (ললিত মাধব)

ত্রাস—বিদ্যুৎ চমক, উগ্রশব্দ শ্রবণ বা ভয়ানক জন্তু দর্শনাদির জন্য ভয়।

আবেগ—প্রিয়দর্শন হেতু ইহার উৎপত্তি (ললিত মাধব)

উন্মাদ—মহানন্দ অথবা বিরহাদির জন্য চিত্তবিভ্রম।

অপস্মার—গভীর বিরহাদির জন্য চিত্ত বিকার।

ব্যাধি—জ্বরাদির প্রতিরূপ বিকার, বিয়োগজনিত ব্যাধি।

মোহ—হর্ষ বা বিষাদহেতু অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভাব।

মরণ—এ স্থানে মরণের উদ্যমমাত্র বর্ণনীয়, কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যু বর্ণয়িতব্য নহে।

আলস্য—সামর্থ্য সত্ত্বেও কর্তব্য বস্তু না করার ইচ্ছা।

জড়তা—ইষ্ট অথবা অনিষ্ট শ্রবণ হেতু জড়ভাব।

ব্রীড়া নব সঙ্গম, অন্যায় আচরণ অথবা স্তব হেতু লজ্জা।

অবহিত্থা—লজ্জা বা কপটতা হেতু ভাব গোপন।

স্মৃতি তুল্য বস্তু দর্শনজনিত অনুভূত অর্থের স্ফূর্তি।

বিতর্ক—সংশয় হেতু কোন বস্তু সম্বন্ধে স্বরূপ নির্ণয়ে সন্দিগ্ধ মনোভাব।

চিন্তা—ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি অথবা অনিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি হেতু ভাবনা।

মতি—বিচার পূর্বক কর্তব্য নির্ধারণ।

ধৃতি—মনের স্থৈর্য সম্পাদন।

হর্ষ—অভীষ্ট দর্শনহেতু আনন্দ।

ঔৎসুক্য—ইষ্ট দর্শনের স্পৃহা।

ঔগ্র্য—অপরাধ ও কটু বাক্যাদি হইতে জাত উগ্রভাব।

অমর্ষ—পরিহাস বাক্যাদি শ্রবণে অপমান হেতু অসহিষ্ণুতা।

অসূয়া—পর সৌভাগ্যে বিদ্বেষ।

চাপল্য—চিত্তের লঘুতা হেতু গাম্ভীর্যের অভাব।

নিদ্রা—ক্লমাদি হেতু চিত্তের নিমীলন।

সুপ্তি—স্বপ্ন।

বোধ—জাগৃতি।

উজ্জ্বল নীলমণিতে আলস্য ও উগ্রতাকে ব্যভিচারী ভাবের ভিতর ধরা হয় নাই। তবে আরও তিনটি অতিরিক্ত ভাবের কথা বলা হইয়াছে, যথা সন্ধি, শাবল্য ও শান্তি।

সন্ধি—দুই ভাবের একত্রীকরণ।

শাবল্য—চপলতা, শঙ্কা, ঔৎসুক্য ও অমর্ষ ইত্যাদি ভাবের উত্তরোত্তর সংঘাত।

পূর্বে রসাস্বাদনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ব্যভিচারী, বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবগুলির দ্বারা কাব্য বা নাটক যখন

আস্বাদ্য হয়, তখনই রসসৃষ্টি সার্থক হয়, এই রসাস্বাদন সহৃদয় সংবাদী মনকে লোকোত্তর জগতের সংবাদ দেয়। শ্রুতি বলিয়াছেন 'রসো বৈ সঃ'। তাত্ত্বিক বিচারে ব্রহ্মরসই কাব্যরস অথবা নাট্যরস। রস বিভক্ত হইলেও ইহা এক এবং অখণ্ড। আমরা ব্রহ্ম রস তখনই উপলব্ধি করিতে পারি, যখন আমাদের মন বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া অন্তর্মুখী হয়। সুতরাং রসাস্বাদন যখন ঘটে, আমাদের মন তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যায়। রসোৎপত্তি সম্বন্ধে শারদাতনয় 'ভাব প্রকাশনে' একটি সুন্দর আলেখ্য দিয়াছেন :—ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া অতীতের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনশ্চক্ষে তিনি শিবের কার্যাবলী দেখিতে পাইলেন ; এবং সেই অতীত ইতিহাস লইয়া 'ত্রিপুরদহ' নাটক রচনা করিলেন। ভরতগণ কর্তৃক ত্রিপুরদহ মঞ্চস্থ করিবার সময় ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে চারটি রসের উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে বৃত্তির উদ্ভব হয়। এই চারটি রস হইতেছে। শৃঙ্গার, বীর, রুদ্র ও বীভৎস। রসের মধ্যে ইহারাই প্রধান। ইহা ব্যতীত হাস্য, করুণ, ভয়ানক ও অদ্ভুত নামক আরও চারটি রসের উল্লেখ আছে। অনেকে শান্ত রসকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া নয়টি রসের কথাও বলেন। কিন্তু ভরত আটটি রসেরই উল্লেখ করিয়াছেন। শান্তরসের উল্লেখ কোথাও তিনি করেন নাই। তবে এক জায়গায় তিনি ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। চক্ষু তারকার নয়টি ক্রিয়ার আলোচনায় ৮টি রসের উল্লেখ করিয়া অবশেষে "প্রাকৃতং শেষ ভাবেষু", এই উক্তির দ্বারা পরোক্ষ-ভাবে অন্যান্য ভাবের স্বীকৃতি দিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রের (বরোদা ২য় সংস্করণ) ভূমিকাতে বলা হইয়াছে যে, যদিও ভরত শান্তরসের উল্লেখ করেন নাই, তথাপি তিনি ঐ জাতীয় একটি রসের ইঙ্গিত করিয়াছেন। যেখানে তিনি শম, বীতরাগ, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মোক্ষ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানেই শান্তরসের স্পর্শ আসিয়া পড়ে। ভরত বলিয়াছেন "ধর্মকামোঽর্থকামশ্চ মোক্ষকামস্তথৈব চ।"

শান্তের বিভাব ও অনুভাবকে অবলম্বন করিয়া নাট্য রচিত হয়। ভরত শান্তরসের স্থায়ীভাব 'শমের' পরোক্ষভাবে আংশিক উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শান্তকে স্পষ্টরূপে স্বীকার করেন নাই। ভরত বলিয়াছেন নাটক হইবে—

"ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিৎ ক্রীড়া ক্বচিদর্থঃ ক্বচিচ্ছমঃ"

"দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রান্তিজননং কালে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি।"

সুতরাং সকল প্রকার দর্শকদিগের জন্য বিভিন্ন রস সমন্বিত নাটক হওয়া উচিত। নাট্য হইবে বিনোদজন। কিন্তু যে নাট্যে 'শম' ভাব প্রধান তাহা হয়ত অনেক সময় বিনোদজন নাও হইতে পারে। কারণ 'শম' মানে জাগতিক সকল অনুভূতি হইতে মুক্ত। তাহার অর্থ বৈরাগ্য। এইরূপ অবস্থা নাট্যে প্রতিফলিত করা যায় না। এইরূপ অনেক রসই মঞ্চে প্রদর্শিত হয় না, যথা শৃঙ্গার রসের 'সম-প্রয়োগ' অথবা হত্যার দৃশ্য ইত্যাদি। মনে হয়, নাট্যে এই রসের অবতারণা সম্ভব নহে বলিয়াই ভরত এই বিষয়ে মৌন রহিয়াছিলেন। তাহা না হইলে, শান্ত রসের বিষয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতেন।

নাট্যশাস্ত্রের প্রথম টীকাকার উদ্ভট তাঁহার "কাব্যালঙ্কার সার সংগ্রহে" প্রথম শান্তরসের উল্লেখ করেন। তাঁহার এই মতকে সমর্থন করেন আনন্দবর্ধন এবং অভিনব গুপ্ত। কেহ কেহ এই মতের বিরোধিতাও করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ধনঞ্জয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সপ্তম শতাব্দীতে বৈদিক ও অবৈদিক মতবাদের বিরোধের সময় শান্তরস সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করে। অনেকে মনে করেন, ভরতের শান্তরসের অধ্যায়টি সংযোজিত। এই সংযোজিত অংশে শান্তরসের স্থায়ী ভাবকে বলা হইয়াছে 'শম'। আনন্দ বলিয়াছেন, ভরতের শান্তরসের অধ্যায়টি সংযোজিত নহে। আনন্দবর্ধনের মতে শান্তরসের স্থায়ী ভাব হইতেছে 'তৃষ্ণাক্ষয়সুখ'।

সারদাতনয়ের মতে নাট্যশাস্ত্রকার বাসুকি প্রথম শান্তরসের উল্লেখ করেন। লোল্লটও শান্তরসের কথা বলিয়াছেন। অভিনব গুপ্ত বলেন, ইহা অপ্রধান, অর্থাৎ সঞ্চারী অথবা অঙ্গীরস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

যাহা হউক, পূর্বোক্ত চারিটি প্রধান রস হইতে আরও চারিটি অঙ্গী অথবা সঞ্চারী রসের উদ্ভব হইয়াছে; যথা শৃঙ্গার হইতে হাস্য, রৌদ্র হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত ও বীভৎস হইতে ভয়ানক। রস অনুসারে ভরত 'লয়ে'র নির্দেশও দিয়াছেন। হাস্য ও শৃঙ্গার রসে মধ্যলয়, করুণ রসে বিলম্বিত এবং বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, বীভৎস ও ভয়ানক রসে দ্রুত লয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আটটি রসের অবলম্বন আটটি ভাব। রতি হইতে শৃঙ্গার, হাস হইতে হাস্য, শোক হইতে করুণ, ক্রোধ হইতে রৌদ্র, উৎসাহ হইতে বীর, ভয় হইতে ভয়ানক, জুগুপ্সা হইতে বীভৎস এবং বিস্ময় হইতে অদ্ভুত রসের উদ্ভব হইয়াছে। অনেকে এক্ষেত্রেও আবার শান্ত রসের উল্লেখ করেন। তাঁহাদের মতে শান্ত রসের অবম্বন 'শম' ভাব।

এই নয়টি রস ব্যতীত বাৎসল্য ও ভক্তিকেও দশম ও একাদশ রসের অন্তর্গত করা যায়। বাৎসল্য বলিতে পরস্পরের প্রতি কাম হীন আকর্ষণ। সন্তানের প্রতি পিতামাতার এইরূপ আকর্ষণ জাগে। কেহ কেহ করুণা অথবা কারুণ্যকে ইহার স্থায়ীভাব বলেন। কবি কর্ণপুর গোস্বামী যশোদা ও কৃষ্ণের আকর্ষণকে বাৎসল্যরস বলিয়াছেন এবং ইহার স্থায়ীভাব হইতেছে 'মমকার'। ভক্তিকেও রসের ভিতর গণ্য করা হইয়াছে। পিতা-মাতা, গুরুজন অথবা ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাকে ভক্তি বলা হইয়াছে। ভক্তির স্থায়ী হইতেছে প্রীতি। ইহার উল্লেখ করিয়াছেন রুদ্রত, দণ্ডী এবং আরও অনেকে। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং তাহাতে সখ্যসমেত দ্বাদশটি রসের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

শৃঙ্গার রস—শৃঙ্গারের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনা করিলে দেখা

যায় যে, 'শৃঙ্গ' শব্দটি নানার্থবোধক। আলোচ্যস্থলে ইহা হিংসার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা চরমদশায় উপনীত করিয়া কামুকদিগকে ধ্বংস করে, তাহাই 'শৃঙ্গ' (শৃ-হিংসায়াম্) বলিয়া কথিত হয়। শৃঙ্গ শব্দের নামান্তর মন্মথোদ্ভেদ অর্থাৎ কামোদ্‌গম। এই কামভাব অর্থাৎ রতিভাবই হেতু যাহার তাহাই 'শৃঙ্গার'। অথবা স্বীয় উৎপত্তির কারণরূপে যাহা (যে রস) শৃঙ্গকে অর্থাৎ রতিভাবকে প্রাপ্ত হয়, তাহাই শৃঙ্গার। "ইয়র্তি শৃঙ্গং যস্মাৎ স শৃঙ্গারঃ।" ভাবের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শৃঙ্গার। শৃঙ্গার রস সম্বন্ধে ভরত বলিয়াছেন, ইহা উজ্জ্বলবেশাত্মক। রতিস্থায়িভাব হইতে ইহার জন্ম। স্ত্রী ও পুরুষ ইহার হেতু এবং ইহা উত্তম যুবপ্রকৃতি। শৃঙ্গার রসকে বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলা হয়। শৃঙ্গার তাণ্ডবে ভগবান আত্মহারা হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাতে প্রসন্নতা ও কোমলতা বিরাজ-মান। সংস্কৃত নাটকে অথবা নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গাররসকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অশ্লীলতা অথবা লঘুতা ইহাতে বর্জনীয়। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—"সকল রসের সারভূত আদ্যরস বা শৃঙ্গার রসই রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" বিবেকানন্দ ইহাকে উচ্চতম ও প্রবলতম বলিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় "দিব্যপ্রেমের মধুরভাবে ভগবান আমাদের পতি।" বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাকেই 'উজ্জ্বল' রস বা 'মধুর' রস বলা হইয়াছে। শৃঙ্গার রস প্রেম প্রধান। ইহা দুই প্রকার—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

সম্ভোগ—বাৎসায়নাদি কলাশাস্ত্রের রীতি অনুসারে দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আচরণ দ্বারা নায়ক-নায়িকার পারস্পরিক সুখোদয় চিত্তে যে অত্যধিক উল্লসিত ভাব জন্মায়, তাহার নাম 'সম্ভোগ'।

বিপ্রলম্ভ—উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে যে, নায়ক-নায়িকার সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকে 'বিপ্রলম্ভ' জানিবে।

সম্ভোগ শৃঙ্গার চারি প্রকার—সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সংকীর্ণ সম্ভোগ সম্পন্ন সম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

বীররস—শক্তি, দয়া, শৌর্য, উদারতা, প্রভৃতি কার্যে বীররসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহাতে নায়ক উদ্ধত, অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না। নায়ককে শান্ত, অবিচল ও গম্ভীর থাকিতে হয়। ব্যভিচারী ভাব হইতেছে মদ, স্মৃতি,ধৃতি, হর্ষ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, মতি, বিরোধ ও বিতর্ক। অনুভাব হইতেছে স্বেদ, রোমাঞ্চ, বিবর্ণ, অশ্রু ও মোহ।

বীভৎস রস—দুর্গন্ধ, কুবচন, বিশ্রী অথবা অশ্লীল কার্য হইতে বীভৎস রসের সঞ্চার হয়। ব্যভিচারী হইতেছে মদ, গর্ব, আবেগ অমর্ষ, উগ্রতা ও ব্যাধি। অনুভাব হইতেছে রোমাঞ্চ ও প্রলাপ।

রৌদ্ররস—ক্রোধ, উন্মত্ততা, ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণাত্মক অঙ্গ বিক্ষেপ অথবা হিংসাত্মক কার্যকলাপ হইতে রৌদ্ররসের উৎপত্তি। ব্যভিচারী হইতেছে অসূয়া, মদ, স্মৃতি, অমর্ষ, উগ্রতা ও উন্মাদ। অনুভাব হইতেছে স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, প্রলাপ ইত্যাদি।

হাস্যরস—হাস্যরসের উদ্রেক হয় বিনোদপূর্ণ কার্য, বিচিত্র বেশভূষা, হাস্য করা অথবা অপরকে হাসান হইতে। অনেক প্রকার হাস্যের উল্লেখ আছে—স্মিত, হসিত, বিহসিত, উপহসিত, অপহসিত, এবং অতিহসিত।

ভয়ানক রস—ভয়ানক দৃশ্যের দর্শনে ভীত হইয়া অথবা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া স্বেদ, কম্পন প্রভৃতি হয়। মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া যায়। এই ভাব হইতে ভয়ানক রসের সঞ্চার হয়। অনুভাব হইতেছে স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, অশ্রু ও প্রলাপ।

অদ্ভুতরস—বিস্ময় অথবা আশ্চর্যের অভিব্যক্তি হইতেছে 'অদ্ভুত' রস। বিচিত্র বস্তুর দর্শনে ও বিচিত্র ধ্বনির শ্রবণে কম্পন, স্বেদ

প্রভৃতির দ্বারা এই রসের অভিব্যক্তি বুঝা যায়। ব্যভিচারী ভাব হইতেছে অসূয়া, দৈন্য, চিন্তা, হর্ষ, জড়তা, আবেগ ও মতি। অনুভাব হইতেছে স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প ও বিবর্ণ।

করুণ রস—বিপত্তি, দুর্ঘটনা প্রভৃতির দ্বারা অশ্রু, দীর্ঘনিশ্বাস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বাভিচারী ভাব হইতেছে শঙ্কা, আলস্য, অসূয়া. শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিষাদ, উৎকণ্ঠা, স্বপ্ন, অবহিত্থ, ব্যাধি, মরণ ও ত্রাস। নৃত্যে নবরস প্রদর্শনের সময় অথবা কোন একটি বিশেষ রসকে প্রস্ফুটিত করিবার সময় এই সকল অভিব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়। নাট্যশাস্ত্রকারগণ এমন গভীর ও সূক্ষ্মভাবে ইহার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন যে, বাস্তবক্ষেত্রে ইহার সম্যক জ্ঞান না থাকিলে প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হয় না।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রত্যেক রসের বর্ণ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম দেওয়া হইয়াছে।

রস	বর্ণ	অধিদেবতা
শৃঙ্গার	শ্যাম	বিষ্ণু
হাস্য	সিত (সাদা)	প্রমথ
করুণ	কপোত	যম
বীর	হেম	মহেন্দ্র
ভয়ানক	কৃষ্ণ	কাল
রৌদ্র	রক্ত	যম
বীভৎস	নীল.	মহাকাল
অদ্ভুত	পীত	ব্রহ্মা

এই প্রসঙ্গে নায়ক-নায়িকার ভেদের উল্লেখ করা হইতেছে। নৃত্যের আলোচনায় ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। নায়িকা আট প্রকার—

অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা। নায়িকার এই সকল অবস্থার বিশ্লেষণে উজ্জ্বলনীলমণিতে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

অভিসারিকা—

"যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং ব্যভিসরত্যপি
সা জ্যোৎস্নীতামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা।
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠিতা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ"॥

যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায় অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাহাকে 'অভিসারিকা' বলা হয়। জ্যোৎস্না ও তামসীভেদে অভিসারিকা দুই প্রকার হয়। অভিসারিকা লজ্জাবশতঃ স্বীয় অঙ্গ সঙ্গোপন করিয়া, ভূষণ সকল নিঃশব্দ করিয়া এবং অবগুণ্ঠিত হইয়া একটিমাত্র সখীর সহিত অভিসার করেন। জ্যোৎস্নারাত্রে অথবা অন্ধকার রাত্রে তদনুরূপ অভিসারের যোগ্যবেশ ধারণ করিতে হয়।

বাসকসজ্জা—"স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥"

নায়কের আগমন আশায় দেহ ও গেহ সজ্জিত করিয়া নায়িকা যদি অপেক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাকে 'বাসকসজ্জা' বলে।

উৎকণ্ঠিতা :—

"অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা॥"

নিরপরাধ প্রিয়ের আগমনে বিলম্বহেতু নায়িকা যদি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অবস্থান করে, তাহাকে 'উৎকণ্ঠিতা' বলা হয়।

খণ্ডিতা—

"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা॥"

পূর্ব সঙ্কেতিত কাল অন্তে যদি প্রিয়তম অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া প্রাতঃকালে সমাগত হয়, তদ্দর্শনে পূর্ব নায়িকা 'খণ্ডিতা' অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বিপ্রলব্ধা—

'কৃত্বা সঙ্কেতম প্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ॥"

সঙ্কেত করিয়া প্রিয়তম যদি আগত না হয়, তাহা হইলে, যে নায়িকার অন্তর অত্যন্ত ব্যথিত হয় তাহাকে 'বিপ্রলব্ধা' বলে।

কলহান্তরিতা—

"যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।"

যে নায়িকা ক্রোধভরে সখীজনের সম্মুখে পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাতে অতিশয় অনুতপ্ত হয়, তাহাকে 'কলহান্তরিতা' বলা হয়।

প্রোষিতভর্তৃকা—

"দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা।"

নায়ক দূরদেশে গমন করিলে তদীয় নায়িকাকে 'প্রোষিতভর্তৃকা' বলা হয়।

স্বাধীনভর্তৃকা--

"স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।"

কান্ত যে নায়িকার অধীন হইয়া সতত সমীপে অবস্থান করে, সেই নায়িকাকে 'স্বাধীনভর্তৃকা' বলা হয়।

ইহা ব্যতীত চারিপ্রকার নায়কের উল্লেখও আছে, যথা—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত ও ধীরোদ্ধত।

ধীরোদাত্ত—যে নায়ক সুদৃঢ়, গাম্ভীর্যগুণসম্পন্ন, বিনয়ী ও করুণ তাহাকে 'ধীরোদাত্ত' বলে।

ধীরললিত—যে নায়ক কিশোর, পরিহাসবিশারদ, প্রেয়সীবশ এবং সংসার দায়িত্ব হইতে মুক্ত, তাহাকে 'ধীরললিত' বলে।

ধীরশান্ত—যে নায়ক শমপ্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়াদি-গুণযুক্ত তাহাকে 'ধীরশান্ত' বলে।

ধীরোদ্ধত—যে নায়ক মাৎসর্যবান, অহংকারী, মায়াবী ও চঞ্চল তাহাকে 'ধীরোদ্ধত' বলে।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণ এইরূপে নাটকের রসবিচার এবং নায়ক নায়িকা ভেদ প্রভৃতির বিচার করিয়াছেন। ভারতীয় নৃত্যেও এই সকল নায়ক নায়িকাভেদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এখন বিচার্য বিষয়, ভারতীয় নৃত্য কিরূপে রসপুষ্ট হইয়াছে এবং ইহাতে নায়ক নায়িকা ভেদের প্রয়োগই বা কিরূপে হয়।

ভারতের চারিটি অঞ্চলের নৃত্যশৈলী লইয়া আলোচনা করা যাউক। পূর্বাঞ্চলের মণিপুরী 'রাস' নৃত্য প্রভৃতিতে দর্শক ও শিল্পীগণ গোপীভাবে বিভাবিত হন এবং তাঁহারা মনে করেন যে, ত্রিভঙ্গমুরারিই একমাত্র রসিকপুরুষ। গোপীভাবে বিভাবিত দর্শকগণ সেই রসিকপুরুষের রসাস্বাদন করেন। কিন্তু এই রসাস্বাদন একমাত্র সহৃদয়সংবাদী মনই করিতে পারে। দর্শক ও শিল্পীগণের মনে রতিভাব উদিত হইয়া শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়। রাসনৃত্যের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীভাগ্যচন্দ্র মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের রাসনৃত্যের ভাবটি মণিপুরী রাসনৃত্যের অন্তর্গত 'ভঙ্গী পারেঙ্'এর ২৪, ২৫ ও ২৬ পর্যায়ে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকটি হইতেছে—

> "পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
> র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
> স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
> গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥"

ভাঃ ১০।৩৩।৭

পাদবিক্ষেপ, করসঞ্চালন, সুমধুর হাস্যের সহিত ভ্রূবিলাস, স্বাভাবিক কৃশতাহেতু নৃত্যকালীন পরিবর্তনাদি দ্বারা ঈষৎ ভুগ্নভাবাপন্ন কটির মৃদু সঞ্চালন, ভ্রূভঙ্গীর সহিত মুখে মৃদু হাসি, শ্লথবক্ষঃস্থলের দোদুল্যমান দুকূল ও গণ্ডে দোদুল্যমান কুণ্ডল সহ স্বেদবিন্দুযুক্ত বদনমণ্ডলে শোভিত শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে রত গোপীগণকে মনে হইতেছিল যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। এই শ্লোকের ভাবটিই উক্ত রাসনৃত্যে প্রতিফলিত হয়। ইহার রস হইতেছে শৃঙ্গার এবং স্থায়ীভাব হইতেছে রতি। এই রতি ভাব গোপী ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই অবলম্বন করিয়াছে। গোপীগণের অবলম্বন হইলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অবলম্বন হইলেন গোপীগণ। পরস্পরের হস্ত সংবদ্ধ অবস্থায় নৃত্য হইল অনুভাব। মণিপুরী রাস-নৃত্যের ভিতরও শৃঙ্গার রসই প্রধান। তবে উহাতে শৃঙ্গাররসের সহিত ভক্তিরসের মিশ্রণ থাকে। যদিও পূর্বোক্ত আটটি রসের মধ্যে ভক্তি-রসের উল্লেখ নাই, তথাপি বৈষ্ণবাচার্যগণ ভক্তিরসকে স্বীকার করিয়াছেন।

নায়ক ও নায়িকা প্রকরণের প্রায় সকল অবস্থাই মণিপুরী নৃত্যে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তাহার কারণ, বাংলা দেশে প্রচলিত লীলা কীর্তনের সহিত এই নৃত্য হয় বলিয়া রাধাকৃষ্ণের সকল লীলাই ইহাতে রূপায়িত হইয়া থাকে। সেইজন্য নায়ক নায়িকার ভেদ ইহাতে পরিবেশন করিবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। নাট্যশাস্ত্রে ভরত বলিয়াছেন, ভারতের পূর্বাঞ্চলে ভারতী ও আরভটী বৃত্তির প্রয়োগ ছিল। কিন্তু ভরতের এই উক্তি মণিপুরী রাসনৃত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কারণ মণিপুরী রাস মধ্যযুগের পরবর্ত্তীকালে সৃষ্টি হইয়াছে। সেইজন্য ইহাতে ভরত কথিত পূর্বোক্ত ভারতী অথবা আরভটী বৃত্তির প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। তবে কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ আছে। ইহাতে মধুর রসের প্রাবল্য থাকিলেও 'ভরতনাট্যম' নৃত্যের ন্যায় ইহা সেরূপ উচ্ছল ও অভিনয় প্রধান নহে। অনুভাবের প্রকাশভঙ্গীও ইহাতে

সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শিত হয় না। ইহার প্রধান কারণ, মণিপুরী নৃত্যে অভিনয়ের স্থান অতি অল্প। যদিও এক একটি লীলা লইয়া এই নৃত্য হইয়া থাকে, তথাপি মুখের অভিব্যক্তি নাই বলিলেই হয়।

দক্ষিণভারতের 'ভরতনাট্যম্' নৃত্য শৃঙ্গাররস প্রধান। ভরত দেশে দেশে বৃত্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গার রসের আধিক্য—"তত্র দাক্ষিণাত্যাস্তাবদ্বহুনৃত্যগীতবাদ্যাঃ কৈশিকীপ্রায়াঃ চতুর-মধুরললিতাঙ্গাভিনয়াশ্চ।" দাক্ষিণাত্য বলিতে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী দেশসমূহ। এই নৃত্যে, নৃত্য ও অভিনয় এই দুইটি অংশেই শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য দেওয়া হয়। নৃত্যাংশে গ্রীবাসঞ্চালন, ভ্রূসঞ্চালন ও দৃষ্টি সঞ্চালন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা রতিভাবের সৃষ্টি হয়। এই রতিভাবই শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়। দেবতা প্রেমিকের আসন গ্রহণ করেন এবং নর্তকীগণ প্রেমিকার স্থান গ্রহণ করেন। 'ভরতনাট্যম্' নৃত্যে শৃঙ্গার রস ব্যতীত অন্য রসের স্থান নাই বলিলেই হয়। তামিল সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থ 'নটনাদিবাদ্যরঞ্জনম্' এ দ্বাদশ তাণ্ডবের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আছে যে, 'ভরতনাট্যম্' নৃত্য শৃঙ্গার তাণ্ডবের ভিত্তিতে সৃষ্ট। 'পদম্' অথবা 'শব্দম্' প্রভৃতি সঙ্গীতের ভিতর 'বিপ্রলম্ভ' ও 'সম্ভোগ' শৃঙ্গারের যে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, 'ভরতনাট্যম্' নৃত্যের গুরুদিগের মতে তাহার ভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়। তাঁহাদের মতে সম্ভোগ শৃঙ্গারে নায়কের বিরহে নায়িকার প্রত্যক্ষভাবে বিরহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে কোন প্রকার নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া নায়িকার বিরহ জাগ্রত হয়। যেমন মলয় পবন, ভ্রমরের গুঞ্জন, পূর্ণিমা চাঁদের আলো ইত্যাদি নায়িকার মনে পরোক্ষভাবে বিরহভাব জাগ্রত করিয়া তোলে। ইহাকেই 'বিপ্রলম্ভ' শৃঙ্গার বলা হইয়াছে।

রসতত্ত্ব বিচার করিলে দেখা যায় যে, এই নৃত্যে উজ্জ্বলরসের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে।

সাধারণতঃ 'শব্দম্' নামক গীতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের যে ৪টি ভাগ

আছে, তাহার ভিতর তুইটি ভাগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; যথা মান ও প্রেমবৈচিত্ত্য। মানের ভিতর প্রিয়অঙ্গে ভোগচিহ্ন দর্শন, স্বপ্নে প্রিয় ও অন্য নায়িকার সঙ্গ দর্শন প্রভৃতি রূপায়িত হয় এবং প্রেম-বৈচিত্ত্যের ভিতর নিজপ্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি নৃত্যের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। সম্ভোগের ভিতর সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ (হস্তাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষণ, অকস্মাৎ চুম্বন) ও সমৃদ্ধি-মান সম্ভোগের (স্বপ্নে মিলন, ভাবোল্লাস, একত্রে নিদ্রাবস্থা,) বিষয়ও নৃত্যে পরিবেশিত হয়। 'ভরতনাট্যম্' নৃত্যকে নায়িকাপ্রধান বলা যাইতে পারে। নায়িকার সকল অবস্থাই ইহাতে সুন্দর ও বিশদভাব প্রদর্শিত হয়। হাস্যে, লাস্যে, মান ও অভিমানে নায়িকা যেন মূর্ত হইয়া উঠে।

কেরালার 'কথাকলি' নৃত্যনাট্য বীররস প্রধান। বীররস প্রধান এইজন্য বলিতেছি যে, ইহাতে মহাকাব্য অথবা পুরাণের নায়কের শৌর্য বীর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য অথবা ঈশ্বরে ভক্তি ইত্যাদি প্রধানভাবে প্রদর্শিত হয়। পূর্বকালে ইহাতে পুরুষ কর্তৃক স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করিয়া রতিভাবের অবতারণা করা হইত। কিন্তু এই রতিভাব প্রধান নহে। ইহা সঞ্চারীভাবের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। শার্ঙ্গদেব নাট্যধর্মী বলিতে নৃত্যকেই বুঝাইয়াছেন। ভরত নাট্যধর্মী বলিতে স্পষ্টভাবে নৃত্য বলেন নাই, তবে অঙ্গহারাভিনয়ের প্রাধান্য দিয়াছেন। নাট্যধর্মীর বিবরণে তিনি বলিয়াছেন যে, স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রে একই শিল্পী অভিনয় করিতে পারেন। 'কথাকলি' নৃত্যেও আমরা দেখি নারীচরিত্রগুলি সাধারণতঃ পুরুষগণ অভিনয় করিয়া থাকেন। প্রতিনায়ক অথবা অন্যান্য চরিত্রের দ্বারা বীভৎস অথবা রৌদ্ররসেরও অবতারণা করা হয়। 'ভীমের রক্তপান' 'পূতনাবধ' ইত্যাদি অংশ গুলি বীভৎস রসের সৃষ্টি করে। ইহা সচরাচর অন্যান্য নৃত্যে দেখা যায় না। এই নৃত্যনাট্য অভিনয় প্রধান বলিয়া নবরসের (শান্তরস সহ) প্রায় সবগুলিই কথাকলিতে প্রদর্শিত হয়। ইহাকে আরভটী বৃত্তির অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

কারণ 'সঙ্গীত রত্নাকরে' আরভটী বৃত্তির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ক্রোধ প্রভৃতি প্রকাশ করিতে আরভটী বৃত্তির প্রয়োজন হয়। এই নৃত্যে অনুভাবের প্রকাশভঙ্গী সূক্ষ্মতর। ইহাকে নায়কপ্রধান নৃত্যনাট্য বলা যাইতে পারে।

কথক নৃত্যকেও শৃঙ্গার রসযুক্ত বলা যায়। খণ্ড খণ্ড ভাবে রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলা ইহাতে অভিব্যক্ত হয়। যেমন 'যমুনা-পুলিনে', 'মাখনচুরি', 'গোবর্ধনধারণ' ইত্যাদি মধুর মধুর রসের সৃষ্টি করে; অপর পক্ষে দেবতাগণের স্তব-স্তুতি মনে সাত্ত্বিকভাবেরও প্রেরণা দান করে। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে প্রদর্শিত হয় বলিয়া ইহা রসঘন হইবার পূর্বেই শেষ হইয়া যায়, তথাপি ইহা একটি মধুর আবেশের সৃষ্টি করিয়া দর্শকমনকে উদ্বেলিত করে। কিন্তু যখন ঠুংরী গানের সহিত 'ভাওবাৎলানো' (expression) হয়, তখন রসসৃষ্টি সার্থক হয়। কারণ নায়িকাভেদের সকল প্রকরণগুলি তাহাতে ব্যক্ত হয়। কথক নৃত্যে পালা কীর্তনের ন্যায় নায়িকার ভেদ প্রদর্শিত হয় না বটে, কিন্তু ছিন্ন ছিন্নভাবে নায়িকার অবস্থাগুলি প্রদর্শিত হয়। অবশ্য ঠুংরী গানে নানা প্রকার সঞ্চারীভাবের সহিত নায়িকার বিভিন্ন অবস্থা রূপায়িত হয়। ইহাতে নায়ক নায়িকা উভয়ই প্রধান। ইহা তাল-প্রধান বলিয়া ইহাতে অভিনয়ের প্রদর্শন অপেক্ষাকৃত কম। অনুভাবের প্রকাশও সূক্ষ্মতর।

ভারতের চারিটি নৃত্যধারার আলোচনা করিয়া দেখা গেল, 'কথাকলি' ব্যতীত অন্যান্য নৃত্যগুলিতে শৃঙ্গার রসই প্রধান। শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, আলঙ্কারিক প্রত্যেকেই শৃঙ্গার রসের অনুপম মাধুর্য স্বীকার করিয়াছেন। নৃত্যনাট্যে অথবা নৃত্যে রসসৃষ্টি সার্থক হয় তখনই, যখন তাহা সুন্দরভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত হয় ও দর্শক মনকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করে। আখ্যানবস্তু, মুদ্রা আঙ্গিকাভিনয়, মুখের অভিব্যক্তি, বেশভূষা ও মঞ্চসজ্জার উপর এই রসসৃষ্টি অনেকাংশে নির্ভর করে। শিল্পীর মনে গভীর অনুভূতি না থাকিলে রসসৃষ্টি সার্থক হয় না।

মঞ্চে যাহা প্রদর্শিত হয়, নাট্যকারগণ তাহাকে 'অবস্থান' বলিয়াছেন। জাগতিক সুখ দুঃখের গভীর অনুভূতিকে শিল্পী যখন অঙ্গভঙ্গী ও ভাবের অভিব্যক্তি দ্বারা দর্শকের মনে রসের সঞ্চার করিয়া গভীর আবেগের সৃষ্টি করেন, তখনই নৃত্যে অথবা নাট্যে রসসৃষ্টি সার্থক হয়। নাট্যকারগণ ইহাকে বলিয়াছেন 'অনুকৃতি'। নাটকে অথবা নৃত্যে আমরা লোকবৃত্তির অনুকরণ বা অনুসরণ করি অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবটিকেই প্রকাশ করি। অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন—"অনুকার ইতি হি সদৃশকরণম্।" শিল্পী লোকবৃত্তির অনুকরণ করিবেন বটে, কিন্তু ভাবাবেগের আতিশয্যে আত্মহারা হইয়া অভিনেয় বস্তু সম্বন্ধে কখনই সচেতনতা হারাইবেন না। ভরত বলিয়াছেন "তদন্তে অনুকৃতির্বদ্ধা।" নান্দীর পর অনুকৃতিকে (অভিনয়কে) বাঁধিতে হয় অর্থাৎ নাট্যের প্রস্তাবনা করিতে হয়। দশটি রূপকের ভিতর কোনটি অভিনীত হইবে তাহারই পূর্বাভাষ দিতে হয়। এ, কে, কুমারস্বামী এই কথাটিরই সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন— "The actor should not be carried away by the emotions he represents, but should rather be the ever conscious master of the puppet show performed by his own body on the stage." সুতরাং ইহা ঠিক যে, শুধুমাত্র হাসি, কান্না প্রভৃতির অনুকরণেই রসসৃষ্টি হয় না। যখন তাহা শিল্পীর শিল্প প্রতিভার গুণে সুষমামণ্ডিত হইয়া মঞ্চে উপস্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সহৃদয়সংবাদী মনকে সরস করিয়া তুলে, তখনই রসসৃষ্টি সার্থক হয়। ভরত বলিয়াছেন—

"নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্॥"

সুতরাং আদর্শ শিল্পীর পক্ষে রসবিচার শক্তি এবং ক্ষেত্রানুসারে তাহার সার্থক পরিবেশন একান্তই আবশ্যক। তাহা না হইলে রসদুষ্ট অভিনয় সামগ্রিকভাবে নাট্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

রঙ্গমঞ্চ ও পূর্বরঙ্গ



"নমস্কৃত্য মহাদেবং সর্বলোকোদ্‌ভবং ভবম্।
জগৎপিতামহং চৈব বিষ্ণুমিন্দ্রং গুহং তথা॥
এতাংশ্চান্যাংশ্চ দেবর্ষীন্ প্রণম্য রচিতাঞ্জলিঃ।
যথাস্থানান্তরগতান্ সমাবাহ্য ততো বদেৎ॥"

রঙ্গমঞ্চ ও পূর্বরঙ্গ

আধুনিক রঙ্গমঞ্চ ও তাহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম দেখিয়া সাধারণতঃ আমাদের মনে হইতে পারে যে, রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার আমরা বিদেশাগতদিগের নিকট হইতে শিখিয়াছি। কেহ কেহ মনে করেন যে, আইওনিয়ান প্রভাব আমাদের ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ গঠনে সহায়তা করিয়াছে। 'যবনিকা' কথাটি বোধ হয় এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহাদের মতে 'আইওনিয়ান' শব্দটি হইতে 'যবন' শব্দটি আসিয়াছে। 'যবনিকা' শব্দের অর্থ হইতেছে পর্দা। সুতরাং 'যবনিকা' যবন কর্তৃক ব্যবহৃত পর্দা, ইহা মনে করাই স্বাভাবিক। 'যবন' বলিতে বিদেশাগত-দিগকে বুঝাইত। সুতরাং ইহা স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য যে, যবনিকা তাঁহারাই ব্যবহার করিতেন এবং রঙ্গমঞ্চের প্রচলন তাঁহারাই করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। প্রথমতঃ সংস্কৃত শব্দকোষে আমরা 'যমনিকা' শব্দটি পাই। ইহার অর্থ হইতেছে 'বন্ধন'। রঙ্গমঞ্চের পর্দাকেও এক প্রকার বন্ধন বলা যাইতে পারে। কারণ রঙ্গমঞ্চ ও নেপথ্যবিন্যাসকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করিবার জন্য পর্দা দিয়া আবেষ্টনের সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং যমনিকার অপভ্রংশ যবনিকা হইতে পারে, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে। ইহা ব্যতীত ভরতের নাট্য শাস্ত্রোক্ত রঙ্গমঞ্চ দেখিয়াও আমাদের এই বিশ্বাস জন্মায় যে, প্রাচীন যুগেও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভারতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইত। এই রঙ্গমঞ্চগুলির ক্ষেত্র ছিল সাধারণতঃ পর্বতগুহা। যোগীমারা গুহা ও সীতাবেঙ্গা গুহার রঙ্গমঞ্চ উহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইহা ব্যতীত প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেও রঙ্গমঞ্চের বহু উল্লেখ আছে।

প্রাচীন ভারতে রঙ্গমঞ্চের নির্মাণ পদ্ধতি পর্বতগুহার আকারে প্রচলিত ছিল।

ভরত বলিয়াছেন—

"কার্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ।"

ইহার বিজ্ঞানসম্মত সার্থকতাও যথেষ্ট রহিয়াছে। তাহার কারণ, গুহার অভ্যন্তরে মধ্যবর্তী ছাদ যদি উচ্চ হয় এবং দুই পার্শ্ব ক্রমশঃ নীচু হইয়া আসে, তাহা হইলে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া গুহার যে কোন স্থান হইতে স্পষ্ট শুনা যায়। এই কারণে নাট্যগৃহ গুহার আকৃতি-বিশিষ্ট হওয়া উচিত।

ভরত রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুতের সমস্ত বিবরণই অতি বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন। আমরা অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার আলোচনা করিতেছি। প্রথমেই তিনি ভূমি মনোনয়ন ব্যাপারে পাঁচপ্রকার ভূমির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—সমা, স্থিরা, কঠিনা, কৃষ্ণা ও গৌরী। 'সমা' বলিতে নাতি-নিম্ন অথবা নাতি-উন্নত ভূমি নির্দেশ করে। 'স্থিরা' হইতেছে অচলস্বভাবা, অর্থাৎ যাহা সহজে ধ্বসিয়া যায় না। 'কঠিনা'কে অনূষরা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ উর্বরাশক্তি সম্পন্না। 'কৃষ্ণা' ও 'গৌরী', মৃত্তিকার বর্ণানুসারে নাম ধরে। সর্বপ্রথমে এই সকল ভূমিকে শোধন করিয়া ইহা হইতে লাঙ্গল দ্বারা গুল্ম, প্রস্তর প্রভৃতি উঠাইয়া ফেলিতে হয়।

ভূমি শোধনের বিস্তৃত বিবরণের পর উহাতে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণেরও বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, প্রেক্ষাগৃহ তিনপ্রকার—বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র। আয়তন অনুসারে উহাদিগকে জ্যেষ্ঠ (বড়), মধ্য (মাঝারি) ও অবর (ছোট), এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

"শতং চাষ্টৌ চতুঃষষ্টির্হস্তা দ্বাত্রিংশদেব চ।
অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠং চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্।
কনীয়স্তু তথা বেশ্ম হস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে॥"

"দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং ভবেত্।
শেষাণাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে॥"

জ্যেষ্ঠ ১০৮ হস্ত, 'মধ্যম' চৌষট্টি হস্ত এবং কনিষ্ঠ বত্রিশ হস্ত হইবে। দেবতাদিগের জন্য 'জ্যেষ্ঠ, নৃপদিগের জন্য 'মধ্যম' এবং সাধারণ প্রজাদিগের জন্য কনিষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ নির্দিষ্ট ছিল। বিকৃষ্ট (আয়তাকৃতি) হইতেছে জ্যেষ্ঠ, চতুরস্র (বর্গাকৃতি) হইতেছে মধ্যম এবং ত্র্যস্র (ত্রিকোণ) হইতেছে কনিষ্ঠ।

"প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং প্রশস্তং মধ্যমং স্মৃতম্।
তত্র পাঠ্যং চ গেয়ং চ সুখশ্রাব্যতরং ভবেত্॥"

ভরত মধ্যম প্রেক্ষাগৃহ সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়াছেন। ইহাতে পাঠ্য এবং গেয় সুখশ্রাব্য হয়। টীকাকার অভিনব গুপ্তের মতে 'সমবকার' রূপায়ণে জ্যেষ্ঠ নাট্যগৃহই শ্রেয়। যখন একটি পাত্র অভিনয় করেন, তখন কনিষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহই শ্রেয়। নাট্যশাস্ত্রে মধ্যম প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। একটি চৌষট্টি হাত পরিমাণ জায়গাকে সমান দুইভাগে ভাগ করিতে হইবে। যে সূত্র দ্বারা পরিমাপ করা হইবে তাহা কার্পাস, তূলা, বাল্বজ ঘাস এবং মুঞ্জা ঘাস অথবা বল্কলজাত রজ্জুর দ্বারা নির্মিত হইবে। কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা ইহা নির্মাণ করাইতে হইবে। এইরূপভাবে ইহা নির্মাণ করিতে হইবে, যাহাতে ইহার ভিতর কোন জোড়া না থাকে অথবা ছিন্ন না হয়। যদি ইহার মধ্যভাগ ছিন্ন হয়, তাহা হইলে সত্বাধিকারীর মৃত্যু হয়। যদি তৃতীয়ভাগ ছিন্ন হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রকোপ হয় এবং চতুর্থভাগ ছিন্ন হইলে প্রধান নাট্যাচার্যের মৃত্যু হয়। হাত হইতে পড়িয়া গেলেও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে; সুতরাং ইহা অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। দুই ভাগে বিভক্ত প্রেক্ষাগৃহের একটি ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একটি ভাগকে রঙ্গশীর্ষের জন্য অবশ্যই রাখিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌ভাগ (পশ্চিম) নেপথ্য গৃহের জন্য রাখিতে হইবে। পূর্বভাগে

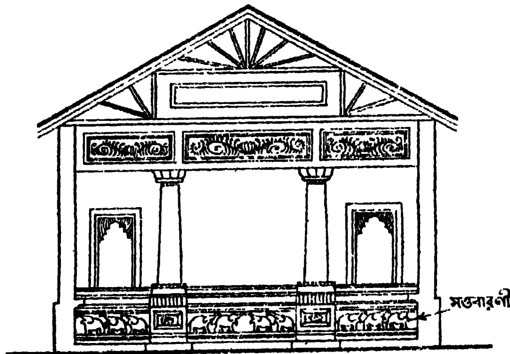
দর্শকদিগের জন্য স্থান নির্দিষ্ট থাকিবে। নাট্যশাস্ত্রের গায়কোয়ার সংস্করণে ডি. সুব্বারাও যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, রঙ্গপীঠ অথবা মত্তবারণীর জন্য কোন স্থান ভাগ করা নাই।

শুভ তিথিতে ও অনুকূল মুহূর্তে ব্রাহ্মণদিগের তৃপ্তিবিধান করিয়া 'পুণ্যাহ' বাক্য উচ্চারণ ও শান্তিবারি সেচন করিয়া সূত্র বিস্তার করিতে হইবে। শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনির সহিত নাট্যগৃহের ভিত পূজা করিতে হইবে এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের তথায় প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। বিবিধ খাদ্যবস্তু ও ফুলের অর্ঘ্য সাজাইয়া নক্ষত্র-রাজিত রাত্রে দশদিকে, দশদিক্‌পালকে নিবেদন করিতে হইবে। পূর্ব-দিকে শুক্ল অন্ন, পশ্চিমদিকে পীত অন্ন, দক্ষিণদিকে নীল অন্ন, ও উত্তর দিকে লোহিত অন্ন মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নিবেদন করিতে হইবে। দ্বারো-দ্ঘাটনের সময় ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃতসংযুক্ত পরমান্ন, রাজন্যবর্গকে মধুপর্ক এবং অন্যান্যজনকে গুড়ের সহিত অন্ন বণ্টন করিতে হইবে। অনুকূল মুহূর্তে, শুক্লপক্ষে, মূলা নক্ষত্র যখন শুভ, তখন কোন সুধীজনের দ্বারা এই দ্বারোদ্ঘাটন করিতে হইবে। ইহার পর প্রাচীর গাঁথা হইলে রোহিণী অথবা শ্রবণা নক্ষত্রযোগে, শুক্লপক্ষে, শুভকরণে, সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সুশিক্ষিত আচার্য (যিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়াছেন) দ্বারা স্তম্ভ স্থাপন করিতে হইবে। প্রথম ব্রাহ্মণস্তম্ভ আগ্নেয় কোণে হওয়া উচিত। এই স্তম্ভে ঘৃত ও মন্ত্রপূত শ্বেতসর্ষপ এবং ব্রাহ্মণদিগকে পায়স দিতে হইবে। ইহাতে সকল দ্রব্যই শুভ্র হইবে। ক্ষত্রিয় স্তম্ভে রক্তবর্ণ বস্ত্র, রক্তবর্ণ ফুলের মালা ও রক্তচন্দন দিতে হইবে। ব্রাহ্মণকে গুড়ান্ন দান করিতে হইবে। বৈশ্য স্তম্ভ উত্তর-পশ্চিমমুখী হইবে। ব্রাহ্মণদিগকে 'ঘৃতান্ন' দান করিতে হইবে। ইহার সকল বস্তুই পীতবর্ণের হইবে। শূদ্রস্তম্ভ উত্তর-পূর্ব অভিমুখী হইবে এবং ইহার সকল দ্রব্যই নীলবর্ণের হইবে। ব্রাহ্মণস্তম্ভের মূলদেশে স্বর্ণকর্ণাভরণ, ক্ষত্রিয়স্তম্ভের মূলদেশে তাম্রকর্ণাভরণ, বৈশ্যস্তম্ভের

মূলদেশে রৌপ্য কর্ণাভরণ এবং শূদ্রস্তম্ভের মূলদেশে লৌহ কর্ণাভরণ স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক স্তম্ভের মূলেই স্বর্ণ রাখিতে হইবে। স্তম্ভগুলি স্থাপন করিবার সময় ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে রত্ন দান, গো দান ও বস্ত্র দান করিতে হইবে। এই স্তম্ভগুলির ভিতর কোনটি যদি উৎপাটিত হয়, তাহা হইলে নানাপ্রকার কুফল ফলে। স্থানান্তরিত হইলে দেশে বৃষ্টি হয় না; যদি নড়িয়া যায়, তাহা হইলে মৃত্যুভয় থাকে এবং যদি ইহা কাঁপে তবে পররাজ্য কর্তৃক ভীতি প্রদর্শনের সম্ভাবনা থাকে। স্তম্ভ স্থাপনের সময় জয়ধ্বনি করিতে হইবে। ব্রাহ্মণস্তম্ভ স্থাপনের সময় গো-দান এবং অন্যান্য স্তম্ভ স্থাপনের সময় সত্ত্বাধিকারী সাধ্যমত ভোজন করাইবেন। এই সকল কার্য নাট্যাচার্যের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত। এই স্তম্ভগুলি রঙ্গমণ্ডপের কোণের দিকে স্থাপন করা উচিত।

রঙ্গমণ্ডপ—রঙ্গমঞ্চকে রঙ্গমণ্ডপ বলা হইয়াছে। রঙ্গমণ্ডপের উচ্চতা মত্তবারণীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া করিতে হইবে। 'অভিনয় দর্পণে' 'রঙ্গ' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"তদগ্রে নটনং কুর্য্যাৎ তৎস্থলং রঙ্গ উচ্যতে।" অর্থাৎ যাহার অগ্রে নর্তন ও অভিনয় করিতে হইবে, সেই স্থলকে রঙ্গ বলা হইয়া থাকে।

মত্তবারণী—ইহার অর্থ হইতেছে মত্ত হস্তীর শ্রেণী। চারিটি



স্তম্ভের সহিত ইহাদের পদগুলি বাঁধা থাকিবে। ইহার দৈর্ঘ্য রঙ্গপীঠের

দৈর্ঘ্য অনুযায়ী হইবে। ইহা রঙ্গপীঠের উভয় পার্শ্বকে আবৃত করিয়া রাখিবে। মত্তবারণীর একটি গূঢ় অর্থ আছে। দেবরাজ ইন্দ্র 'জর্জর' দ্বারা বিঘ্ননাশ করিতেন বলিয়া তিনি স্বয়ং রঙ্গপীঠের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন। মত্তবারণীতে 'দৈত্যনিষূদনী' বিদ্যুৎ রাখা হইত। ঐরাবত হইতেছে মহেন্দ্রের প্রতীক। বিদ্যুতের শক্তির সহিত ঐরাবতের শক্তি তুলনীয়। সুতরাং ঐরাবত রঙ্গমঞ্চকে সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবে। সেইজন্য ইহা রঙ্গপীঠের স্তম্ভের উভয় পার্শ্বে সম্মুখভাগে এমন ভাবে স্থাপিত হইবে যাহাতে দৃশ্যমান হয়। সর্বোপরি হিন্দুশাস্ত্রমতে হস্তী শুভসূচক মাঙ্গলিক দ্রব্যের অন্যতম।

রঙ্গশীর্ষ বলিতে রঙ্গের শীর্ষদেশ অথবা উপরিভাগ বুঝায়। রঙ্গপীঠ বলিতে রঙ্গশীর্ষ সমেত সমগ্র রঙ্গমঞ্চকেই বুঝায়। সুতরাং রঙ্গপীঠের জন্য পৃথক ভাবে কোন স্থান নির্দেশ করা হয় নাই। ইহাতে উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি দরজা নেপথ্য গৃহ হইতে রঙ্গপীঠে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। নাট্যাচার্য অষ্টাদশ প্রকার নাট্যমণ্ডপের নির্মাণ পদ্ধতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে, এই ভাবে আরও বহু প্রকার নাট্যমণ্ডপের পরিকল্পনা করা যাইতে পারে।

রঙ্গশীর্ষ এইরূপ ভাবে তৃণলোষ্ট্রাদিশূন্য করিতে হইবে, যাহাতে উহা দর্পণবৎ সমতল ও মসৃণ হইবে। ভরত রঙ্গশীর্ষ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে—

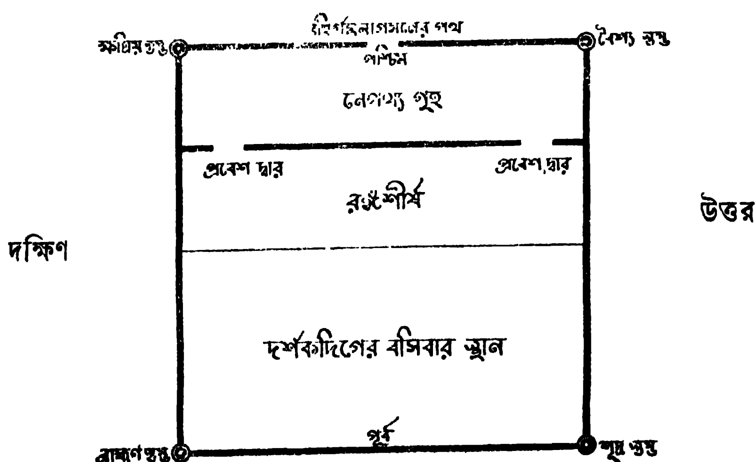
"কূর্মপৃষ্ঠং ন কর্তব্যং মৎস্যপৃষ্ঠং তথৈব চ।"

এই নাট্যগৃহকে নানাপ্রকার চিত্র ও রত্নাদি দ্বারা সাজাইয়া নাটক অভিনীত হইবার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ রঙ্গশীর্ষই সাবলীল নৃত্যের উপযোগী, এবং ইহাতেই গীতবাদ্যাদির ধ্বনি সহজেই প্রতিধ্বনিত হয়। নাট্যশাস্ত্রে আছে যে, ইহা ষড়্‌দারু দ্বারা নির্মিত হইবে অর্থাৎ ৬টি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা ইহার অবয়ব নির্মাণ করিতে হইবে। রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের মধ্যদেশ ফাঁপা হইলে নৃত্য ও সঙ্গীতের উপযোগী

হয়। ষড়্দারু বলিতে ছয়খানি কাষ্ঠের দ্বারা নির্মিত স্তম্ভ। নট-নটীদিগকে রঙ্গশীর্ষের উপর সমগ্র স্থান লইয়া নৃত্য অথবা অভিনয় করিতে হইত। এই নিমিত্ত সর্বত্র ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ ষড়্দারু ব্যবহৃত হইত। ইহাতে মূল্যবান প্রস্তরও ব্যবহৃত হইত। পূর্বে হীরকখণ্ড, দক্ষিণে বৈদূর্যমণি, পশ্চিমে স্ফটিক এবং উত্তরে প্রবাল স্থাপনের বিধান ছিল।

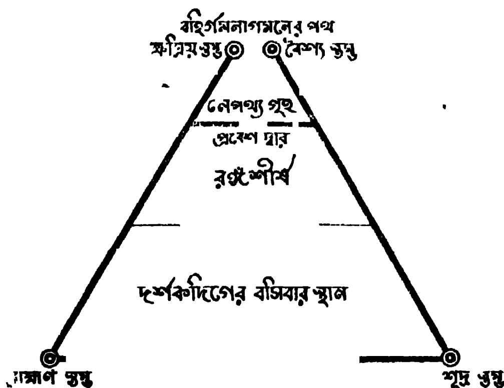
ভরত বলিয়াছেন যে, বিচক্ষণতার সহিত চিন্তা করিয়া স্থির করিবার পর নাটক মঞ্চস্থ করিলে তাহা দর্শকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রঙ্গশীর্ষের উপরতলা ও নিম্নতলা থাকিত। বায়ুচলাচল এবং শব্দনিয়ন্ত্রণের জন্য নাট্যগৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালা থাকিত। দর্শকগণ ইষ্টক অথবা কাষ্ঠ নির্মিত উচ্চ ভূমিতে উপবিষ্ট হইতেন।

চতুরস্র (চতুষ্কোণ) রঙ্গমঞ্চও এই প্রথায় নির্মিত হইত। কিন্তু



ইহার দৈর্ঘ্য হইত ৩২ হাত। ত্র্যস্র (ত্রিকোণ) রঙ্গমঞ্চ প্রায় একই প্রকারের হইত। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের প্রবেশের জন্য মঞ্চের

সম্মুখভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে দুইটি দরজা থাকিত। ইহার আকার



ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজাকৃতি রঙ্গমঞ্চের সঙ্কীর্ণ দিকটিতে রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইত এবং বিস্তৃত দিকটি দর্শকদিগের জন্য নির্দিষ্ট থাকিত।

এই রূপে সর্বলক্ষণসম্পন্ন নাট্যগৃহ প্রস্তুত হইলে তাহাতে রঙ্গপূজার বিধান ছিল। দ্বিজ কর্তৃক ইহা পূজিত হইত। নিশাগমে মন্ত্রপূত বারিসিঞ্চনে রঙ্গমঞ্চ দেবতাদিগের অধিবাসের যোগ্য করিয়া লইতে হইত। নাট্যাচার্য নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়া সংযমী হইয়া এবং নিজেকে বারিসিঞ্চনে শুদ্ধ করিয়া রঙ্গমঞ্চকে শুদ্ধ করিতেন। প্রথমে সর্বলোকেশ্বর মহাদেব, জগৎপিতামহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রকে নমস্কার করিয়া পশ্চাতে সরস্বতী, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, সোম, সূর্য, মরুৎ ও লোকপালদিগকে নমস্কার করিতে হইত। অগ্নি, স্বর, রুদ্র, কাল, কলি, মৃত্যু, নিয়তি, কালদণ্ড, বিষ্ণুপ্রহরণ, নাগরাজ, বাসুকি, বজ্র বিদ্যুৎ, সমুদ্র, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মুনি, ভূত, পিশাচ, যক্ষ ও গণপতিকে প্রণাম করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইত। 'জর্জর' পূজার সময় 'কুতপ' স্থাপন করিতে হইত। 'জর্জর' হইতেছে মহেন্দ্র-প্রহরণ। যখন 'ত্রিপুরদহন' নাটক অভিনীত হইতেছিল, সেই সময় নাটকে দৈত্যকুলের পরাজয় দেখিয়া দৈত্যগণ রাগান্বিত হয় এবং নাটক পণ্ড করিবার জন্য

নট-নটীদিগকে অদৃশ্যভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদের স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট করে। মহেন্দ্র ধ্যানের দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়া একখানি বংশদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে জর্জর অর্থাৎ স্থবির করিয়া দেন এবং সকলকে রক্ষা করেন। সেই হইতে এই প্রহরণের নাম হয় 'জর্জর' এবং নাটক অভিনয়ের পূর্বে উহার পূজাও প্রচলিত হয়। 'জর্জর' একটি বংশখণ্ড। এই বংশখণ্ডটিকে পাঁচটি রংএ রঙ করা হইত; যথা শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ এবং নানা বর্ণ। প্রথম অংশে ব্রহ্মা, দ্বিতীয় অংশে শঙ্কর, তৃতীয় অংশে বিষ্ণু, চতুর্থ অংশে স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) এবং পঞ্চম অংশে মহানাগ. শেষ, বাসুকি প্রভৃতির স্থিতি কল্পনা করা হইত। অতঃপর দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ; দশদিক্‌পাল প্রভৃতির যথাযথ পূজা হইবার পর নাট্যাচার্য দীপিকার দ্বারা রঙ্গভূমি প্রদীপ্ত করিতেন। এই রূপে রঙ্গদেবতাদিগের পূজা অর্থাৎ রঙ্গপূজা শেষ করিয়া পূর্বরঙ্গ সমাপ্ত করিবার রীতি ছিল।

পূর্বরঙ্গ—অভিনব গুপ্তের মতে রঙ্গে যাহা পূর্বে প্রযুক্ত হয়, তাহাই পূর্বরঙ্গ। অর্থাৎ গীত, তাল, বাদ্য, নৃত্য ও পাঠ্যের ব্যস্ত ও সমস্তভাবে প্রয়োগকে পূর্বরঙ্গ বলা হয়। সাহিত্য দর্পণে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—

"যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে।
কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গঃ স উচ্যতে॥"

সঙ্গীত দামোদরে বলা হইয়াছে—

"পূর্বরঙ্গঃ সভাপূজা কবের্গোত্রাদিকীর্তনম্।
নাটকাদেস্তথা সংজ্ঞা সূত্রধারোঽপ্যথামুখম্॥"

নাট্যারম্ভে শুদ্ধভাবে সভাপূজা হইবার পর কবির গোত্রাদির পরিচয় এবং নাটকের নাম প্রভৃতির দ্বারা সূত্রধার প্রস্তাবনা (আমুখ) করিবেন। ইহাকে পূর্বরঙ্গ বলা হয়। যাহাই হউক, ভরতের মতে পূর্বরঙ্গের উনিশটি অঙ্গ। ইহার মধ্যে নয়টি অঙ্গ হইতেছে অন্তর্যবনিকা

এবং দশটি হইতেছে বহির্যবনিকা। অন্তর্যবনিকা হইতেছে প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সঙ্ঘোটনা, মার্গাসারিত ও আসারিত। প্রত্যাহার—কুতপের বিন্যাসকে 'প্রত্যাহার' বলা হইয়াছে। কুতপ—বীণাদি চতুর্বিধ বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রীদের সমাবেশকে 'কুতপ' বলা হইয়াছে। ভরত, বৈপঞ্চিক (বীণাবাদক), বংশী-বাদক, মৃদঙ্গ, পণব ও [১]'দর্দুরবাদক' প্রভৃতি শিল্পীগণের সমাবেশকে 'কুতপ বিন্যাস' বলিয়াছেন। শার্ঙ্গদেব মৃদঙ্গজাতীয় একটি বাদ্যযন্ত্রকে 'কুতপ' বলিয়াছেন। নাট্য বা অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট কুতপের নাম 'নাট্যকুতপ'। এই নাট্যকুতপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—উত্তম, মধ্যম ও অধম। শার্ঙ্গদেব তিনটি কুতপের সমাবেশকে 'বৃন্দ' বলিয়াছেন। সিংহভূপাল বৃন্দ অর্থাৎ 'সংঘাত' বলিয়াছেন। শার্ঙ্গদেবের মতে, যে বৃন্দে চারিজন মূল গায়ক, আটজন সমগায়ক, চারজন বংশীবাদক ও চারজন মৃদঙ্গবাদক থাকিত, তাহার নাম 'উত্তমবৃন্দ'। যে বৃন্দে দুইজন মূল গায়ক, চারিজন সমগায়ক, দুইজন বংশীবাদক ও দুইজন মৃদঙ্গবাদক থাকিত, তাহার নাম 'মধ্যমবৃন্দ'। 'কনিষ্ঠ' বা অধমবৃন্দে একজন মূল গায়ক, তিনজন সমগায়ক, দুইজন বংশীবাদক ও দুইজন মৃদঙ্গ বাদক থাকিত। 'কুতপ বিন্যাস' প্রসঙ্গে ভরত 'ত্রিসামে'র কথাও বলিয়াছেন। বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাইবার পূর্বে রঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাত্রয়ের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) উদ্দেশ্যে আহ্বান ও বিসর্জন মূলক যে সামবেদোক্ত তিনটি মন্ত্র গীত হইত, তাহাকে 'ত্রিসাম' বলা হইয়াছে। অবতরণ—ভরত বলিয়াছেন,—"গায়কানাং নিবেশনম্।" গায়কগণের প্রবেশ ও উপ-বেশন হইতেছে "অবতরণ।" পশ্চিমে পূর্বাভিমুখে কুতপদল বসিবেন। গৃহদ্বারদ্বয়ের মধ্যস্থলে পূর্বাভিমুখী হইয়া মৃদঙ্গবাদক বসিবেন। ইহাদের বামে পাণিকদ্বয় থাকিবেন। রঙ্গপীঠের দক্ষিণে উত্তরাভিমুখী

১। ঘটের আকার বিশিষ্ট একটি বাদ্যযন্ত্র এবং উহার মুখ চর্ম দিয়া ঢাকা।

গায়কগণ এবং তাহার অগ্রে উত্তরদিকে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া গায়িকাবৃন্দ বসিবেন। ইহার বামদিকে বৈণিক (বীণাবাদক) বসিবেন। নেপথ্য-গৃহের মধ্যস্থলে কুতপবিন্যাস হইবে।

আরম্ভ—"পরিগীত-ক্রিয়ারম্ভ আরম্ভ ইতি কীর্তিতঃ।" কণ্ঠসঙ্গীতে আলাপের আরম্ভকে আরম্ভ বলা হয়।

আশ্রাবণা—আতোদ্যরঞ্জনার্থং তু ভবেদাশ্রাবণাবিধিঃ।" অর্থাৎ নাট্যের উপযোগী করিবার জন্য বাদ্যযন্ত্রগুলিতে রঞ্জনাশক্তি সৃষ্টি করিবার নাম 'আশ্রাবণা।'

আতোদ্য—চারিপ্রকার বাদ্যকে আতোদ্য বলা হয়। এই চারিপ্রকার বাদ্য হইতেছে—তত, (বীণাদি বাদ্য), আনদ্ধ (মুরজাদি বাদ্য) শুষির (বংশী আদি বাদ্য) ও ঘন (কাংস্যতালাদি বাদ্য)।

বক্ত্রপাণি—"বাদ্যবৃত্তিবিভাগার্থং বক্ত্রপাণির্বিধীয়তে।" বাদ্যবৃত্তি বলিতে বাদন পদ্ধতি বুঝাইতেছে। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—"বক্ত্রে (প্রারম্ভে) হস্তাঙ্গুলি-ব্যাপারঃ।" বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলির উপর সঙ্গীতের প্রারম্ভে হস্তাঙ্গুলি চালনার ব্যাপারকে 'বক্ত্রপাণি' বলা হয়।

পরিঘট্টনা—"তন্ত্র্যোজঃকরণার্থং তু ভবেচ্চ পরিঘট্টনা।" শক্তি সঞ্চারের জন্য তন্ত্রীগুলির যথাযথ চালনাকে 'পরিঘট্টনা' বলা হয়।

সঙ্ঘোটনা—"তথা পাণিবিভাগার্থং ভবেৎ সংঘোটনাবিধিঃ।" পাণি বিভাগকে 'সঙ্ঘোটনা' বলা হয়। বীণাবাদ্যের সহায়করূপে মৃদঙ্গ-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রে প্রহার-পঞ্চকের ক্রিয়াকে 'সংঘোটনা' বলে।

মার্গাসারিত—"তন্ত্রীভাণ্ডসমাযোগান্মার্গাসারিতমিষ্যতে।" সমান তালে ও লয়ে একই সঙ্গে বীণা ও মৃদঙ্গ বাজাইবার প্রাণালীকে 'মার্গাসারিত' বলা হয়।

আসারিত—"কলাপাতবিভাগার্থং ভবেদাসারিত-ক্রিয়া।" সঙ্গীতের সহিত তাল রক্ষা করার নাম 'আসারিত'।

অতঃপর বহির্যবনিকা। ইহার দশটি অঙ্গ—গীতবিধি, উত্থাপন,

পরিবর্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা, রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত ও প্ররোচনা।

গীতবিধি—দেবতাগণের স্তুতি ও মহিমাকীর্তন 'গীতবিধি' বলিয়া পরিচিত। ইহাতে বর্ধমানাদি গীতের প্রয়োগ হয়।

উত্থাপন—নন্দীপাঠকগণ সর্বপ্রথমেই প্রয়োগের উত্থাপন করেন বলিয়া উহাকে 'উত্থাপন' বলা হয়।

পরিবর্তন—চতুর্দিকে ঘুরিয়া লোকপালদিগকে বন্দনা করা হয় বলিয়া ইহার নাম 'পরিবর্তন।' পরিবর্তনের চারিটি ভেদ—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। প্রথম পরিবর্তন স্থিতলয়ে করিতে হয়। প্রথমে সূত্রধার শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি হস্তে প্রবেশ করিবেন। তাঁহার সহিত দুইজন পারিপার্শ্বিক ভৃঙ্গার ও জর্জর হস্তে প্রবেশ করিবেন। সূত্রধার মধ্যস্থলে থাকিবেন। তাঁহারা বৈষ্ণবস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সৌষ্ঠবের লক্ষণ পরিস্ফুট করিবেন। ইহার পর রঙ্গস্থলের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অভিবাদন করিবেন। অতঃপর জর্জর গ্রহণ, বন্দনা প্রভৃতি হইবে। সূত্রধারের প্রবেশ হইতে বন্দনা পর্যন্ত প্রথম পরিবর্তন। দ্বিতীয় পরিবর্তন মধ্যলয়াশ্রিত। তৃতীয় পরিবর্তনে মণ্ডপ প্রদক্ষিণ, আচমন পূর্বক জর্জর গ্রহণ ও বিঘ্ননাশ প্রভৃতির জন্য শ্লোক উচ্চারণ। চতুর্থ পরিবর্তনে চতুর্থকার যথাবিধি বৈষ্ণবস্থানে অবস্থান করিয়া পুষ্পদ্বারা যথাক্রমে জর্জর, কুতপ ও সূত্রধারের পূজা করিবেন! ইহাতে গান থাকিবে না। কেবলমাত্র শুষ্কাক্ষরের গান থাকিবে। ইহা দ্রুতলয়ে করিতে হইবে। ইহার পর মধ্যস্বরকে আশ্রয় করিয়া নান্দীপাঠ হইবে।

নান্দী—আশীর্বচনযুক্ত শ্লোককে 'নান্দী' বলা হয়। ইহাতে আশীর্বাদ, নমস্ক্রিয়া অথবা বস্তুনির্দেশের কোন একটি থাকিবে। দেব, দ্বিজ, নৃপ অথবা গুরুজনের স্তুতিকীর্তনই নান্দী। ইহা পূর্বরঙ্গের অন্তর্গত সর্বশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ইহা যেহেতু কাব্য, কবীন্দ্র (নাট্যকার), কুশীলব, পারিষদবর্গ এবং অন্যান্য সাধুসজ্জনকে আনন্দ

দান করে, সেইহেতু ইহার নাম ‘নান্দী’। সেইজন্য রঙ্গবিঘ্নের উপশমের নিমিত্ত ইহার অবশ্যকর্তব্যতা কীর্তিত হইয়াছে। “তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে।”

শুষ্কাবকৃষ্টা—ইহাতে শুষ্কাক্ষর দ্বারা জর্জর স্তুতিমূলক শ্লোক পাঠ করা হয়। ইহাকে ভরত ‘জর্জর-শ্লোক-দর্শিকা’ বলিয়াছেন।

রঙ্গদ্বার—রঙ্গদ্বার হইতেছে বাচিক অভিনয়াত্মক। যে স্থান হইতে অভিনয়ের সর্বপ্রথম অবতারণা করা হয়, তাহাকে ‘রঙ্গদ্বার’ বলে।

চারী—অভিনয়ের যে অংশে মহাদেবীর সহিত মহাদেবের শৃঙ্গার প্রধান চরিত্র অঙ্গহার প্রভৃতি দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তাহাকে ‘চারী’ বলে॥ ইহা প্রয়োজনমত ত্র্যস্র, চতুরস্র ও মধ্যলয়াম্বিত হইবে। চারীর শেষে দর্শকবৃন্দের আনন্দদানের জন্য দেবদ্বিজাদির স্তবস্তুতি বিষয়ক নানা-ভাবসমন্বিত মধুর শ্লোক পাঠ করিতে হইবে। ইহার পর কবির নাম ও গুণাবলী কীর্তন করিতে হইবে। দর্শকদিগের অবগতির জন্য কোন্ জাতীয় নাটক অভিনীত হইবে প্রস্তাবনায় তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

মহাচারী—যে অভিনয়ে মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুর-মর্দনাদি বিষয়ক রৌদ্ররসপ্রধান গীত উদ্ধত মণ্ডলাঙ্গহারের মাধ্যমে রূপায়িত হয়, তাহাকে ‘মহাচারী বলে।

ত্রিগত—বিদূষক, সূত্রধার ও পারিপাশ্বিক কর্তৃক ভবিষ্যৎ নাটকের সূচনা দেওয়াকে ‘ত্রিগত’ বলা হয়।

প্ররোচনা—কাব্যের প্রথম উত্থাপনের হেতু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়া সামাজিকদিগের আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ সিদ্ধিকে প্ররোচনা বলা হয়। আশ্রাবণার দ্বারা দৈত্যগণকে তুষ্ট করা হয়, বক্ত্রপাণির দ্বারা দানব দিগকে, পরিঘট্টনা দ্বারা রাক্ষসগণকে, সঙ্ঘোটনা দ্বারা গুহ্যকদিগকে, মার্গাসারিত দ্বারা যক্ষগণকে, গীতক দ্বারা দেবতাগণকে, বর্ধমান দ্বারা সানুচর রুদ্রকে, উত্থাপন দ্বারা ব্রহ্মাকে, পরিবর্তন দ্বারা লোকপাল-দিগকে, নান্দী প্রয়োগ দ্বারা চন্দ্রকে, অবকৃষ্টের দ্বারা নাগগণকে,

শুষ্কাবকৃষ্টের দ্বারা পিতৃগণকে, রঙ্গদ্বার দ্বারা বিষ্ণুকে, জর্জর দ্বারা বিঘ্নবিনায়কগণকে, চারীর দ্বারা উমা এবং মহাচারীর দ্বারা ভূতগণকে সন্তুষ্ট করা হয়, ইহাই পূর্বরঙ্গ। সর্বদেবতার সন্তুষ্টির জন্য, যশঃ-প্রাপ্তির জন্য, আয়ুঃপ্রাপ্তির জন্য, বিঘ্ননাশের জন্য পূর্বরঙ্গের প্রয়োজন। এইরূপে নাটকের সূচনায় কুশীলবদিগের যাহা করণীয় তাহা পূর্বরঙ্গ। পূর্বরঙ্গ চারিটি ভাগে বিভক্ত—ত্র্যস্র, চতুরস্র, শুদ্ধ ও চিত্র। নৃত্যাংশ বর্জিত গীতক অংশ হইতেছে শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ। নৃত্ত সংমিশ্রিত হইলে তাহা 'চিত্র' পূর্বরঙ্গ। বাদ্য, গতিপ্রচার ও ধ্রুবাতালে নৃত্ত হইলে 'ত্র্যস্র' পূর্বরঙ্গ হইয়া থাকে। ইহা বিস্তীর্ণ ও সংক্ষিপ্তভেদে দুই প্রকারে সম্পন্ন করা যাইতে পারে। ত্র্যস্রে হস্ত ও পদের দ্বাদশটি আঘাত হইবে এবং চতুরস্রে ষোড়শটি আঘাত হইবে। ভারতীকে আশ্রয় করিয়া ত্র্যস্র, চতুরস্র ও শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ করিতে হইবে। চিত্র পূর্বরঙ্গে গন্ধর্বগণ উদাত্তস্বরে দুন্দুভিবাদ্যসহ গান করিবেন। সিদ্ধগণ চতুর্দিকে মাল্য বিকিরণ করিবেন এবং দেবীগণ অঙ্গহার সহকারে নৃত্য করিবেন। নান্দীপাঠের মধ্যে পৃথকভাবে ইহা করিতে হইবে। ইহাতে পিণ্ডী-সমন্বিত তাণ্ডববিধিতে রেচক, অঙ্গহার, ন্যাস ও উপন্যাস সহ নৃত্ত করিতে হইবে। ইহার পর, নাটকাভিনয় আরম্ভ করিতে হইবে।

এইরূপে পূর্বরঙ্গ শেষে সূত্রধার অনুগামীগণ সহ রঙ্গমঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন। অতঃপর যবনিকার অন্তরালে 'আশ্রাবণা' করিতে হইবে।

'আশ্রাবণা' শেষে সূত্রাধার পুনরায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া 'প্রস্তাবনা' করিবেন। ইহার পর 'স্থাপক' রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণবস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া 'সৌষ্ঠব' প্রদর্শন করিবেন। অতঃপর উভয়েই নিষ্ক্রান্ত হইবেন। ইহার পর 'চারী' সুরু হইবে। ভরত বলিয়াছেন, বিধিবদ্ধভাবে পূর্বরঙ্গ করিলে কোন অশুভ হয় না এবং পরিণামে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু যিনি এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া ইচ্ছামত আচরণ করেন, তাঁহার ইহকালে ঘোর বিপদ হয় এবং পরকালে তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্তি হয়।

নৃত্যে রূপসজ্জা



তারাহারাবলী স্থূলমৌক্তিকা স্তনমণ্ডনা।
প্রকোষ্ঠৌ ন্যস্তসদ্রত্ন-সৌবর্ণ বলয়ান্বিতৌ ॥

রূপসজ্জা

নৃত্যে রূপসজ্জা একটি বিশেষ অঙ্গ। বসন, ভূষণ, সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি নানাবিধ বস্তুসম্ভার আহরণ করিবার যোগ্য বলিয়াই ইহাকে 'আহার্য' বলা হইয়াছে। কৃত্রিম শোভাবর্ধনে ইহা অপরিহার্য অঙ্গ; এইজন্য ইহা অভিনয়ের অন্যতম অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। চারিটি অভিনয়ের ভিতর আহার্য অভিনয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নহে। রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির দ্বারা নৃত্য অথবা অভিনয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যুগ, কাল অথবা দেশাচার প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

মানুষ যখন প্রথম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইল, তখন হইতে আরম্ভ হইল তাহার দেহকে সজ্জিত করিবার প্রচেষ্টা। সেই অন্ধকারময় যুগে বৃক্ষের বাকল অথবা পাতার দ্বারা অঙ্গ আবৃত করিয়া মানুষ লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিত। সভ্যতার অগ্রগতির সহিত চলিল নিজের দেহকে সজ্জিত করিয়া অপরের চক্ষে সুন্দর করিবার প্রয়াস। আজ পর্যন্ত এই প্রয়াসের বিরাম নাই। নিজেকে পুরুষের চক্ষে অপরূপা করিয়া তোলাই নারীর ধর্ম। নারী বিশ্বপ্রকৃতির প্রতীক। বিশ্বপ্রকৃতির ন্যায় নব নব রূপসজ্জায় নিজেকে সজ্জিত করা নারীর প্রকৃতিগত স্বভাব। সুতরাং নৃত্যেও রূপসজ্জার সার্থকতা হইতেছে সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া দর্শকের মন হরণ করা। সেইজন্য প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণ নৃত্যে রূপসজ্জাকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং নাটকে ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন। বর্তমানে বিভিন্ন নৃত্যশৈলীতে যে সকল রূপসজ্জার প্রচলন আছে, তাহা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যথাযথ অনুসরণ করে না। দেশভেদে, কালভেদে ও আচারভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালেই বা আমাদের রূপসজ্জা কিরূপ ছিল এবং বিভিন্নদেশের নৃত্যশৈলীর উপর ইহার প্রভাব কিরূপ পড়িয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

কিন্তু তাহার পূর্বে, সভ্যতা বিকাশের সহিত রূপসজ্জা কিরূপে পরিবর্তিত হইতে লাগিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সভ্যতা বিকাশের প্রথম প্রভাতে তুলা হইতে জাত সূতার বস্ত্রের প্রচলন হইল। মহেঞ্জদরো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত সূচ ও তকলী হইতে ইহা প্রমাণিত হয়। শুধু বস্ত্র নহে, আভরণও কম জনপ্রিয় ছিল না। নৃত্যেও এই সকল আভরণ ব্যবহৃত হইত। মহেঞ্জদরোয় প্রাপ্ত নর্তকী মূর্তিটির বামহস্তে কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত অজস্র বালা রহিয়াছে। কোন কর্ণভূষণ নাই এবং দেহেও কোন বস্ত্র নাই। ইহার কারণ অনুমান করা শক্ত নহে। কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু খনিজ দ্রব্য প্রভৃতির সহজ লভ্যতার উপর নির্ভর করিয়া তদনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী হয়। এখনও পর্যন্ত উপজাতি ও আদিমজাতির ভিতর বল্কল, চর্মের পোষাক, খনিজ দ্রব্য হইতে জাত গহনা, পাথরের গহনা, শঙ্খ, শামুক প্রভৃতি সামুদ্রিক জীবের গহনা, পাখীর পালক প্রভৃতির গহনা পরিধান করিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তাহার উপর সিন্ধুদেশের নিকট উষ্ণতা অতি প্রখর ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। সুতরাং মনে হয়, সভ্যতার শৈশব অবস্থায় বস্ত্র পরিধানের প্রয়োজন সেইরূপ অনুভূত হয় নাই। ভূমিষ্ঠমাত্র সভ্যতার যুগে ইহা বোধহয় নিন্দার্হ ছিল না। 'জমিলা ব্রীজের' অভিমত হইতেছে যে, বহু প্রাচীনকালে মিশরের ন্যায় ভারতবর্ষেও কোন কোন নৃত্য অনাবৃত দেহে করা হইত। সেই কারণে নর্তকীটির দেহ নগ্ন। তবে উত্তরীয়, শিরোধান (পাগড়ী) প্রভৃতির যে প্রচলন ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত পুরোহিতের মূর্তিতে পাগড়ী ও উত্তরীয়ের ব্যবহার দেখা গিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত কিছু জানা যায় না।

ইহার পরবর্তী বৈদিকযুগে ক্রিয়াকর্মে পশুচর্ম বস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। শিবের ধ্যানে "ব্যাঘ্রকৃত্তিংবসানম্" বলা হইয়াছে। তাৎকালিক যুগে পরিচ্ছদ হিসাবে দুইটি বস্ত্র ব্যবহার করা হইত—বাস (নিম্নাঙ্গের

বস্ত্র) ও অধিবাস (ঊর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র)। ইহার সহিত থাকিত নীবিবন্ধ। পরবর্তীকালে 'মনুসংহিতায়' মনু বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন বস্ত্র পরিধানের নির্দেশ দিয়াছেন। মনু ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণদিগের জন্য শনতন্তু বস্ত্র ও কৃষ্ণসার মৃগচর্মের উত্তরীয়, ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয়দিগের জন্য ক্ষৌমবসন ও রুরু মৃগচর্মের উত্তরীয়, ব্রহ্মচারী বৈশ্যদিগের জন্য মেষরোম নির্মিত ও ছাগচর্মের উত্তরীয় পরিধানের নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু নারীদিগের প্রতি অথবা ব্রহ্মচারিণীদিগের প্রতি কোন নির্দেশ নাই। তবে ইহা জানিতে পারা যায় যে, স্ত্রীলোকগণও কচ্ছ দিয়া শাড়ী পরিতেন এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই উত্তরীয় ও পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। উভয়ই উপবীত ধারণ করিতেন। বেশভূষাতে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। ব্রহ্মচারীগণ চর্মবস্ত্র ধারণ করিলেও অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণীর ভিতর সূক্ষ্মবস্ত্রের প্রচলন ছিল। তৎকালীন মৃন্ময় মূর্তিগুলিতে ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত দীদারগঞ্জের একটি চামরধারিণীর মূর্তিতে অতি সূক্ষ্মবস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। ইহা এত সূক্ষ্ম যে, ইহাতে দৈহিক সৌন্দর্য অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। সম্মুখভাগ হইতে শাড়ী পরিধানের পদ্ধতিটি সঠিক বুঝা যায় না। তবে মনে হয়, কচ্ছ দিয়া কাপড় পরিয়া কাপড়টি হাতের উপর উঠিয়াছে। বক্ষোবাস হিসাবে দুকূল বা পাগড়ীর ব্যবহার নাই। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত সাঁচীস্তূপে খোদিত ভগবান বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে, পুরুষগণ কচ্ছ দিয়া কাপড় পরিয়াছেন। ইহাতে বক্ষোবাস, উত্তরীয় ও পাগড়ী জাতীয় শিরোধান রহিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব ৩০০ শতাব্দীতে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে মথুরা, কলিঙ্গ, কাশী, বঙ্গ, বৎস, মহিষা প্রভৃতি প্রদেশে সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ সূতার কাপড় প্রস্তুত হইত। তিনি তিন প্রকার দুকূলের ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। বঙ্গ হইতে শ্বেত, পুণ্ড্র হইতে কাল এবং সুবর্ণকুণ্ড হইতে লাল রঙের

দুকূলের আমদানি হইত। স্থাপত্যশিল্পে যে সকল নর্তক নর্তকীর মূর্তি দেখা যায়, তাহাতে দুকূলের ব্যবহার আছে। অবশ্য Dr Charles Fabri বলিয়াছেন, ভারতীয় নারীগণ ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত রাখিতেন। যে কয়েকটি চিত্রে একটি দুটি নারীকে বক্ষোবাস ব্যবহার করিতে দেখা যায়, তাঁহার মতে তাহারা যবন নারী। ইহা স্বীকার্য যে, পূর্বে রানী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীগণের যে সকল চিত্র বা প্রস্তরের প্রতিমূর্তি আছে, তাহাতে বক্ষোবাস নাই। কেবল পরিধানের বস্ত্র আছে এবং সরু কাপড়ের টুকরা কোমর হইতে লম্বমান অবস্থায় রহিয়াছে। মগধ, পুণ্ড্র, এবং সুবর্ণকুড্য হইতে পাত্রোর্ণা নামক পাতা হইতে নির্মিত বস্ত্রের আমদানী হইত। বৌদ্ধপুস্তকে বহু মূল্যবান সিল্ক বস্ত্রের উল্লেখ বহুবার করা হইয়াছে। কৌটিল্য চীনা ভূমি হইতে কৌষেয়বস্ত্র আমদানীর কথাও লিখিয়াছেন। তিনি মৌক্তিকা (মুক্তা), মণি, বজ্র (হীরা), প্রবাল প্রভৃতির উল্লেখও করিয়াছেন। ইতিহাসেও আমরা পাই যে, খৃঃপূঃ ২য় শতকে দক্ষিণ পশ্চিম চীনের সঙ্গে পূর্বভারতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল এবং চীন হইতে রেশমী প্রভৃতি বস্ত্র ভারতে আমদানী হইত। বৈদিক যুগ পর্যন্ত রূপসজ্জার কোন সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই। সে যুগে আলোচ্য বিষয়ের কোন প্রতীকও পাওয়া যায় না। যে সময় হইতে মূর্তিশিল্প জন্মলাভ করিল, তখন হইতেই বেশভূষার একটি সুস্পষ্টরূপ আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইল। তাৎকালিক অভিজাত ও অন্যান্য শ্রেণীর ভিতর কিরূপ বেশ-ভূষা পরিধানের প্রচলন ছিল, তাহারও একটি সুস্পষ্ট ধারণা হইল। সাজসজ্জার উপকরণ সম্বন্ধে আমরা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি এবং সেইগুলি কি ভাবে প্রযোজ্য হইত তাহার প্রমাণও প্রস্তর মূর্তিগুলি দেয়। তবে এইরূপ অনেক অলঙ্কার ও ভূষণের নাম আছে, যাহা আধুনিক যুগে লুপ্ত হইয়াছে। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে বিবিধ কারুকার্যখচিত স্বর্ণবিজড়িত বস্ত্রাদি রমণীগণ ব্যবহার করিতেন। পোষাক পরিচ্ছদে স্বর্ণ ব্যতীত আরও বহুমূল্য

প্রস্তরাদি সন্নিবেশিত থাকিত। এইরূপ অলঙ্কারাদি ও বস্ত্রের কথা সঙ্গীতশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

সঙ্গীত রত্নাকরে পাত্রের রূপসজ্জা সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ আছে—পুষ্প শোভিত, সুনীল, স্নিগ্ধ, বিস্তীর্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত-ভাবে সন্নিবেশিত থাকিবে। অলকা-তিলকা অঙ্কিতভালে অলকগুচ্ছ শোভা পাইবে। নয়নে অঞ্জনরেখা এবং কর্ণমূলে বলয়ের আকারে তাল-পত্রে নির্মিত উজ্জ্বল কর্ণভূষণ থাকিবে। দন্তপংক্তির প্রভাজালে রঙ্গভূমি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। কপোলে কস্তুরীচিত্রিত পত্রভঙ্গরেখা, কণ্ঠে তারাহারাবলী, এবং স্থূল মুক্তাহারে স্তনযুগল বেষ্টিত থাকিবে। প্রকোষ্ঠ যুগলে রত্নখচিত সুবর্ণবলয়, অঙ্গুলিসমূহে মণি, নীলা, হীরাদিখচিত অঙ্গুরীয় থাকিবে। অঙ্গে ক্ষীরের ন্যায় শুভ্র দুকূল ও কুর্পাসবস্ত্র থাকিবে। দেশের প্রথানুসারে [১]কঞ্চুকও ব্যবহার করা যাইতে পারে। শ্যাম ও গৌরকান্তি পাত্রের পক্ষে এই জাতীয় মণ্ডন যথোচিত বিধেয়। 'সঙ্গীত মকরন্দে' পাত্রলক্ষণে আছে যে, পাত্র বিবিধ বস্ত্রাভরণে অলংকৃত হইবে, কঞ্চুকাবৃত তনু, বিচিত্র রত্নভূষণ ও মণিমৌক্তিক হার ধারণ করিবে এবং কুসুমশোভিত মৃদুল বেণী রচনা করিবে। ইহা দর্শকগণের চিত্ত বিভ্রম ঘটাইবে।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণের ভিতর নন্দিকেশ্বর আহার্যাভিনয় বলিতে শরীরের অলঙ্করণ বুঝাইয়াছেন। যথা হার, কেয়ুর, বেশ ইত্যাদি। কিন্তু ভরত আহার্যাভিনয় বলিতে নেপথ্যে যাহা প্রয়োজন, সকল কিছুই বুঝাইয়াছেন। এই নেপথ্যবিধানের উপরই নাট্যের শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করে। নেপথ্যবিধানের চারিটি ভাগ—পুস্ত, অলঙ্কার, অঙ্গরচনা ও সঞ্জীব। শৈল, যান, বিমান, চর্ম, বর্ম ও ধ্বজ প্রভৃতি যাহা কৃত্রিম উপায়ে নির্মাণ করা হয়, তাহাকে 'পুস্ত' বলা হয়। পুস্ত তিন প্রকার—সন্ধিম, ব্যাজিম ও চেষ্টিম। রূপ ও প্রমাণ-

(১) কঞ্চুকীগণ লম্বা হাতওয়ালা জামা পরিধান করিতেন। এইরূপ জামাকে কঞ্চুক বলা হয়।

ভেদে পুস্তের অনেক প্রকার ভেদ আছে। [২]কিলিঞ্জি, বস্ত্র, চর্ম প্রভৃতির দ্বারা যে সকল নাট্যোপযোগী কৃত্রিম পদার্থ নির্মিত হয়, তাহাকে 'সন্ধিম' বলা হয়। যন্ত্রের দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহা 'চেষ্টিম'। 'অলঙ্কার' বলিতে অঙ্গ ও উপাঙ্গে মাল্য, আভরণ ও বস্ত্রাদি বুঝায়। ভরত এই সকল অলঙ্কারের সূক্ষ্ম বিবরণ দিয়াছেন। মাল্য পঞ্চবিধ—চেষ্টিত, বিতত, সঙ্ঘাত্য গ্রন্থিম ও প্রলম্বিত। 'চেষ্টিত' অর্থে চঞ্চল (সূক্ষ্ম ও হাল্কা), 'বিতত' অর্থে বিস্তৃত বা চওড়া, 'সঙ্ঘাত্য অর্থে নানাবিধ পুষ্পাদিযোগে গ্রথিত, 'গ্রন্থিম' অর্থে গ্রন্থিযুক্ত, প্রলম্বিত অর্থে বহু দীর্ঘ অথবা লম্বমান। দেহের চারিপ্রকার আভরণের কথা বলা হইয়াছে—(১) আবেধ্য, (২) বন্ধনীয়, (৩) প্রক্ষেপ্য, (৪) আরোপক। আবেধ্য হইতেছে কুণ্ডলাদি কর্ণভূষণ, বন্ধনীয় হইতেছে শ্রোণীসূত্র অঙ্গদ, মুক্তাজাল প্রভৃতি। 'প্রক্ষেপ্য' বলিতে নূপুর, বস্ত্রাভরণ, ইত্যাদি বুঝায়। 'আরোপক' হইতেছে স্বর্ণসূত্র, হার ইত্যাদি। দেশভেদে, জাতিভেদে ও স্ত্রী-পুরুষভেদে ভরত বিভিন্ন সাজসজ্জার কথাও বলিয়াছেন। পুরুষের ভূষণ হইতেছে—চূড়ামণি ও মুকুট, কর্ণভূষণ—(কুণ্ডল, মোচক ও কীল), কণ্ঠভূষণ (মুক্তাবলী, হর্ষক ও সৎসূত্র), হস্তভূষণ—(হস্তবী ও বলয়), মণিবন্ধের ভূষণ—(রুচিক ও উচ্চিতিক), বক্ষোভূষণ—(ত্রিসর হার, বিলম্বিত হার, পুষ্পমাল্য, রত্নমালা প্রভৃতি), কটিভূষণ (তরল ও সূত্রক)।

দেবতা, নৃপতি ও নারীসাধারণের ভূষণের বিবরণও ভরত দিয়াছেন। শিরোভূষণে শিখাপাশ, শিখাজাল, পিণ্ডপাত্র, চূড়ামণি, মকরিকা, মুক্তাজাল, গবাক্ষক, বিচিত্র, শীর্ষজালক, কুণ্ডল, শিখিপাত্র, রোচকও বেণীকঞ্জের উল্লেখ আছে। ললাটের তিলকে নানাবিধ শিল্পকার্য থাকিবে। ভ্রূকক্ষার উপর কুসুমানুকারী গুচ্ছ দিতে হইবে। কর্ণভূষণ সম্বন্ধে কর্ণিকা, কর্ণবলয়, পত্রকর্ণিকা, আবেষ্টিত, কর্ণমুদ্রা, কর্ণোৎকীলক, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। গণ্ডে তিলকা ও পত্ররেখা শোভা পাইবে। বক্ষোভূষণরূপে ত্রিবেণী ও বিচিত্রশিল্পযুক্ত হার থাকিবে। নেত্রের অঞ্জন

(২) মাদুর, চাটাই, দরমা ইত্যাদি।

ও অধররঞ্জন ছিল অবশ্য করণীয়। উজ্জ্বল শুক্লবর্ণদ্বারা রঞ্জিত দন্তরাজি শোভা পাইবে। কণ্ঠভূষণ হিসাবে মুক্তাবলী, ব্যালপঙ্‌ক্তি, মঞ্জরী, রত্নমালিকা, রত্নাবলী এবং স্তনভূষণ হিসাবে মণিজালবন্ধন ব্যবহৃত হইবে। বাহুমূলে অঙ্গদ ও বলয় শোভা পাইবে! হস্তভূষণরূপে বর্জ্জুর ও স্বেচ্ছিতীক থাকিবে! ভরত অঙ্গুলীভূষণের অন্তর্গত কণ্টক, কলশাখা, হস্তপত্র, সুপূরক ও মুদ্রাঙ্গুলীয়কের কথাও বলিয়াছেন। শ্রোণীভূষণ বলিতে মুক্তাজালযুক্ত কাঞ্চী, (একলরী), মেখলা (আটলরী), রশনা (যোললরী), কলাপ (পঁচিশ লরী) ব্যবহৃত হইবে। গুল্‌ফভূষণে নূপুর, কিঙ্কিনী, রত্নজালক ও সজ্ঞোষকটক, জঙ্ঘাভূষণে পাদপত্র ও পদাঙ্গুলি ভূষণে অঙ্গুলীয়ক এবং পাদাঙ্গুষ্ঠভূষণে তিলক ব্যবহার করিতে হইবে। পাদতলে অঙ্গরাগ রচনা করিতে হইবে। পুরুষের বেশ ও অঙ্গরচনা সম্বন্ধেও ভরত বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। বর্ণাদি সম্বন্ধেও তিনি সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন। শ্বেত ও নীলবর্ণের মিশ্রণে পাণ্ডুবর্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণের মিশ্রণে পদ্মবর্ণ, পীত ও নীল সংযোগে হরিৎ, নীল ও রক্ত সমাযোগে কষায়বর্ণের উৎপত্তি হয়। এইগুলিকে 'সংযোগজ' বর্ণ বলা হয়। তিন চারিটি বর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিলে 'উপবর্ণ' হয়।

জীবিকা অনুসারে বেশের নানারকম ভেদ আছে। তবে সাধারণতঃ বেশ ত্রিবিধ—শুদ্ধ, বিচিত্র ও মলিন। দেবপূজায়, মাঙ্গলিক নিয়মে, উৎসবে, বিবাহকার্যেও স্ত্রী-পুরুষের যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠানে 'শুদ্ধ' বেশ ধারণ করিতে হইবে। দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস ও কর্কশ স্বভাবের নৃপগণের বেশ হইবে 'বিচিত্র'। উন্মত্ত, প্রমত্ত, পথিক, প্রবাসী বাসনাভিহত ব্যক্তিগণের বেশ হইবে 'মলিন'। বিদ্যাধরীর বেশ হইবে শুভ্রবর্ণ ও শুদ্ধ। অলঙ্কারে মুক্তার বাহুল্য থাকিবে এবং শিরোভূষণ হিসাবে শিখাপুট ও শিখণ্ড থাকিবে। যক্ষবধূ ও অপ্সরাগণের ভূষণ রত্নখচিত হওয়া প্রয়োজন। যক্ষীগণের শিরোভূষণে কেবলমাত্র শিখা থাকিবে। নাগকন্যাদিগের ভূষণ দেবকন্যাদিগের মতনই হইবে। তবে নাগকন্যাদিগের অলঙ্কারে মণিমুক্তাখচিত লতা-

পাতার বাহুল্য থাকিবে। মুনিকন্যাগণ হইবেন একবেণীধারিণী। মুনিকন্যাগণের অতিরিক্ত ভূষণে সজ্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। সিদ্ধ-যুবতীগণের পরিচ্ছদ পীতবর্ণ ও অলঙ্কার মুক্তা এবং মরকতখচিত হইবে। গন্ধর্বীগণের ভূষণে পদ্মরাগমণির বাহুল্য থাকিবে। তাঁহারা বীণাহস্তা ও কৌসুম্ভবসনা হইবেন। রাক্ষসীগণের ভূষণে ইন্দ্রনীল থাকিবে এবং বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ হইবে। শ্বেতবর্ণের দ্রংষ্ট্রাও থাকিবে। দেববালাগণের অঙ্গে বৈদূর্য ও মুক্তাখচিত আভরণের বাহুল্য থাকিবে। ভরত বিভিন্ন দেশের বেশভূষা সম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন। অবন্তী-যুবতীগণের অলকযুক্ত কুন্তল থাকিবে। গৌড়ীয়াগণের অলকের বাহুল্য থাকিবে। শিখাপাশ ও বেণী থাকিবে। আভীর যুবতীগণের দুইটি বেণী থাকিবে ও মস্তক আবৃত থাকিবে। বস্ত্র প্রায় নীলবর্ণ হইবে। পূর্ব ও উত্তর দেশীয় রমণীগণের শিখণ্ডিক (পুরুষের পক্ষে জুলপী ও নারীর পক্ষে কেশগুচ্ছদ্বয়) থাকিবে। রাজগণ শ্যাম বা গৌরবর্ণ হইতে পারেন। প্রয়োজনানুসারে পঞ্চবর্ণেও রঞ্জিত করা যায়। রুদ্রগণ, দ্রুহিণ ও স্কন্দ তপ্তকাঞ্চনপ্রভ হইবেন। বৃহস্পতি, শুক্র, বরুণ, তারকাগণ, সমুদ্র, হিমাচল গঙ্গা প্রভৃতিকে শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত করিতে হইবে। নরনারায়ণ শ্যামবর্ণ; বাসুকি, দৈত্যগণ, দানববৃন্দ, রাক্ষসসমূহ, গুহ্যকগণ, নগ, আকাশ, পিশাচ ও যমকে শ্যামবর্ণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ সপ্তদ্বীপের অধিবাসী নরগণকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ করা উচিত। ইহার পর শ্মশ্রুবিধির চারিপ্রকার নিয়ম আছে—শুক্ল, শ্যাম, বিচিত্র ও লোমশ। আকুমার ব্রহ্মচারী বা তপস্বীর শুদ্ধ ও শ্বেত শ্মশ্রু। মধ্যাবস্থায় উপনীত, দীক্ষিত, দিব্যপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নৃপতি বা রাজকুমারের অনুজীবী, শৃঙ্গারী ও যৌবনমত্তদিগের শ্মশ্রু হইবে বিচিত্র (শ্বেত ও শ্যাম মিশ্রিত)। যাহাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয় নাই, যাহারা দুঃখিত, হতভাগ্য ও ব্যসনগ্রস্ত তাহাদের শ্মশ্রু হইবে শ্যাম। ঋষি, তাপস, সিদ্ধ, ও বিদ্যাধরগণের লোমশ শ্মশ্রুধারণ কর্তব্য।

শিরোভূষণ রচনার নিয়ম—দেবতা ও মানবগণের দেশ, জাতি, বয়স

ও পাণ্ডিত্য অনুসারে মুকুট, কিরীট প্রভৃতি ধারণ করা উচিত। রাজার পক্ষে সমগ্র মস্তকব্যাপী রাজমুকুট বা কিরীট ধারণ করিতে হইবে। মধ্যমপ্রকৃতির পাত্রের মস্তকোপরি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মুকুট শোভা পাইবে। আর কনিষ্ঠ প্রকৃতির পাত্র শীর্ষদেশে চূড়ার আকারবিশিষ্ট ক্ষুদ্র মুকুট ধারণ করিবে। অতি দীর্ঘকেশও মুকুটাদির দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিতে হইবে।

ভরত পূর্বকথিত পুস্তের যে তিন প্রকার বর্ণনা দিয়াছেন—(সন্ধিম, ব্যাজিম ও চেষ্টিম) তাহার ভিতর 'ব্যাজিম ও 'চেষ্টিম'এর কার্যাবলী স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। যন্ত্রাদির দ্বারা সম্পাদিত কার্যকে তিনি 'ব্যাজিম' বলিয়াছেন। যন্ত্রাদি বলিতে কি ধরণের যন্ত্র, তাহার সম্যক ধারণা করা যায় না। চেষ্টা অর্থাৎ শরীর ব্যাপার দ্বারা যাহা সম্পাদিত তাহাকে চেষ্টিম, বলিয়াছেন। শরীর ব্যাপার বলিতে তিনি দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা রঙ্গমঞ্চে যে কার্য সম্পাদিত হয়. তাহাকে বলিয়াছেন কি না তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়।

'সঞ্জীব' বলিতে রঙ্গমঞ্চে পদহীন, দ্বিপদ অথবা চতুষ্পাদ জন্তুর প্রবেশ বুঝায়। সাধারণতঃ এই সকল জন্তুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়। সেই সকল অস্ত্রের নাম ও বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখ করিতেছি। যথা, ভিণ্ডি [1] (দ্বাদশতাল); কুন্ত (দশতাল); শতঘ্নী, শূল, তোমর ও শক্তি অষ্টতাল; ধনুও অষ্টতাল এবং দুই হস্ত বিস্তৃত; শর, গদা ও বজ্র হইবে চতুস্তাল ইত্যাদি।

অভিনয় দর্পণে নন্দিকেশ্বর কর্তৃক ঘুঙুরের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিঙ্কিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন নক্ষত্রসমূহ। উহা কাংস্যনির্মিত, সুস্বর, সুরূপ ও সূক্ষ্মাকৃতি হওয়া প্রয়োজন। নাট্যকারিণী উভয় পাদে এক এক অঙ্গুলী অন্তরে নীলসূত্রে, দৃঢ় গন্থিতে শতদ্বয় অথবা একশত কিঙ্কিণী বন্ধন করিবেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আমরা

(১) তাল—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা বিস্তৃত করিলে যতটা লম্বা হয়, তাহাই তাল।

প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের যে সকল চিত্র অথবা প্রস্তর মূর্তিগুলি দেখি, তাহাতে প্রাদেশিক আচারভেদে পোষাক পরিচ্ছদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনই প্রভেদ নাই। মহাবলীপুরম, অমরাবতী ও গান্ধার শিল্পের মূর্তিগুলি একই প্রকার বস্ত্র পরিয়াছে। বিশেষ করিয়া নৃত্যের পোষাকগুলিও এক প্রকার। কিন্তু আধুনিক বিভিন্ন নৃত্যশ্রেণীর ভিতর পোষাকপরিচ্ছদের এই যে বিভিন্নতা, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে বিদেশীদিগের প্রভাব এবং সংস্কৃতির বিনিময়।

এখন ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্যশৈলীর বসন-ভূষণ বিচার করিয়া দেখা যাউক যে, ইহা কিরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি কিরূপ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

ইহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, চলমান বিশ্বে গতির সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিতে হইবে। জগৎ গতিশীল। গতিশীলতাই ইহার ধর্ম, গতিই ইহার প্রাণ। এই গতির সহিত আমাদের সামঞ্জস্য রাখিতেই হইবে। সুতরাং যে পরিচ্ছদ সাধারণ উপায়ে পরিধান করিতে পারা যায় এবং যাহা দেহরেখার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তাহাই নৃত্যের উপযোগী। দেহের গতিপ্রকৃতির সহিত পোষাকের সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য। কারণ, মনের উপর পরিচ্ছদের প্রভাব বিশেষ ক্রিয়াশীল। Sir Barrington বলিয়াছেন—"Dress has a moral effect upon the conduct of mankind." নৃত্যের পোষাকগুলি সুবিন্যস্ত ও সুন্দর না হইলে দর্শকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। Mr, Bovee বলিয়াছেন—"The perfection of dress is the union of three requisites····in its being, comfortable, cheap and tasteful. সুতরাং আধুনিক যুগে ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নৃত্যের বেশভূষা করা উচিত। ভরত প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে নাট্যকারিণীর অধিক ভূষণে সজ্জিত হওয়া উচিত নহে। কারণ তাহাতে অধিক ঘর্মের জন্য মুখকান্তি নষ্ট হইতে

পারে এবং ইহা দেহের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিতে পারে। এই সম্বন্ধে বিচার করিয়া নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদ হওয়া উচিত।

আধুনিক ভরতনাট্যম্ নৃত্যে পোষাক পরিচ্ছদের সংস্কার করা হইয়াছে। ভরতনাট্যম্ নৃত্য বিদ্যুতের ন্যায় গতিসম্পন্ন বলিয়া ইহাতে পায়জামার মতন পোষাক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পুরাকালে পায়জামা ছিল না। তাহার পরিবর্তে কচ্ছ দিয়া শাড়ী পরিতে হইত। এই শাড়ীগুলি ডোরাকাটা ছিল এবং ইহাকে 'তুইয়াশেলে' বলা হইত। অধুনা একটি পৃথক কাপড়ের টুকরা পশ্চাদ্‌ভাগে বিস্তৃত করিয়া এবং নিতম্ব ঢাকিয়া কোমরে বাঁধিতে হয়। পূর্বে তুইয়াশেলের অঞ্চলটি কোমরে জড়াইয়া সামনে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে 'বারহুত' স্তূপে কুবের যক্ষ এবং যক্ষীর দেহের সম্মুখভাগে এইরূপ নীবিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। শিরোভূষণে পাগড়ী রহিয়াছে। ভরতনাট্যমে নীবিবন্ধ ব্যবহার করা হয় এবং ইহাকে 'মুন্দি' বলা হয়। উত্তরীয় ও নীবিবন্ধ সকলপ্রকার নৃত্য-শৈলীতেই দেখা যায়। স্কন্ধের উত্তরীয়কে বলা হয় 'মেলাকু'। চুম্‌কীর কাজ করা ব্লাউজকে বলা হয় 'রবিকে' এবং চুম্‌কীর কাজকে বলা হয় 'কর্চিপ'। অলংকারের ভিতর সীমন্তের দুই পার্শ্বে দুইটি ব্রোচ ব্যবহার করা হয়। এই দুইটি ব্রোচ হইতেছে 'চন্দ্র' ও 'সূর্য'। সিঁথি ও তার সামনের লকেটটির নাম 'চুট্টী'। ৬০০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত অজন্তার এক নম্বর গুহায় চিত্রিত অপ্সরাদিগের সীমন্তে এইরূপ গহনার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতনাট্যম্ নৃত্যে সিঁথিকে এবং দুইপাশে দুইটি ব্রোচ্‌কে 'তালেকনাঘাই' বলা হয়। বেণীর উপরদিকে রঙীন পাথর খচিত একটি গোল বড় ব্রোচ থাকে। ইহাকে 'রাকুড়ী' বলা হয়। বেণীর মধ্যে মধ্যে এক একটি পাথর খচিত ব্রোচ থাকে। ইহাকে 'জড়াইভিল্লা' বলা হয়। অজন্তা গুহার অপ্সরা চিত্রে এইরূপ একটি অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। বেণীর প্রান্তে সুন্দর তিনটি ঝুমকার গুচ্ছ থাকে, ইহাকে 'কুঞ্চলম্' বলে। মণিবন্ধে বলয় এবং

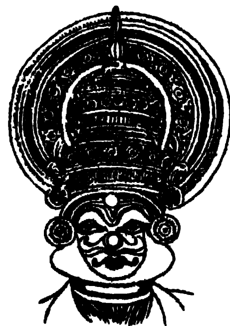
হাতের উপর প্রান্তে বাজুবন্ধকে 'ওয়াঙ্কি' বলা হয়। কানের ঝুমকাতে যে 'শিকলটি চুলের সঙ্গে লাগানো হয়, তাহাকে 'মাটল' বলে। 'তোড' হইতেছে কর্ণভূষণের উপরপ্রান্তে ব্যবহৃত পাথর। লম্বমান ঝুমকাকে 'ঝিমকি' বলা হয়। ভরতনাট্যম্ নৃত্যে নাকের গহনাগুলি একটি বিশেষত্ব আনিয়া দেয়। প্রাচীন প্রস্তর মূর্তিগুলিতে নাকের গহনার ব্যবহার দেখা যায় না। ভরতও শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের অলঙ্কারের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু নাকের অলঙ্কারের কথা তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নাই। ভরতনাট্যম্ নৃত্যে 'নথ', 'বেশরী' ও 'পুল্লাকে' (নোলক) প্রভৃতি নাকের গহনা ব্যবহার করা হয়। নথের অথবা নাকের গহনার প্রচলন নাকি মুসলিম যুগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।—

ঐস্‌লামিক প্রভাব হইতে দক্ষিণ ভারত যে একেবারে মুক্ত এ কথা আমরা বলিতে পারি না। দক্ষিণ ভারতীয় বালিকাদিগের ঘাগরা ওড়নার ব্যবহার, গুজরাটের পায়জামা ও 'ফ্রক কাট' জামার ব্যবহার ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—"This revolutionary change was much slower in the South, no doubt, than in the North, but the change was basic every where" (Charles Fabri). যাহাই হউক, কণ্ঠহার হিসাবে কণ্ঠস্বরম্ (Necklace), মাঙ্গামারে (বিভিন্ন রংএর পাথরের আমহার), পদকম্ (লকেট) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

কথাকলি নৃত্যের অদ্ভুত বেশভূষা দর্শককে কৌতূহলী ও বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়া তোলে। চরিত্র অনুসারে মুখচিত্রণ করা হয় এবং ভূষণ ও বেশভূষা ধারণ করা হয়। কথাকলি নৃত্যে পূর্বে লোকনৃত্যের ন্যায় মুখোশ ব্যবহৃত হইত। কিন্তু মুখোশে মুখের ভাব প্রকাশিত হয় না বলিয়া ভেওত স্বরূপমের যুবরাজ মুখোশের ব্যবহার উঠাইয়া দেন। এই সময় হইতে 'কিরীটম্' ও জামার প্রচলন হয়। কথাকলি নৃত্যের পুরুষ চরিত্রগুলিকে এক প্রকার ঘাগরা পরিধান করিতে

দেখা যায়। সাঁচীস্তূপের ২নং গুহার উত্তর দিকে প্রবেশ দ্বারের মুখে প্রাচীরে একটি শিকারী মূর্তিকে অনেকটা এই প্রকারের ঘাগরা পরিতে দেখা যায়। কথাকলি নৃত্যের পরিভাষায় এই ঘাগরাকে 'উরুত্তেকেট্টা' বলা হয়। কটিবন্ধ হিসাবে একটি ঝালরের মত ব্যবহার করা হয়। ইহাকে 'পাড়িএরেজানম্' বলা হয়। মহিলা শিল্পীদিগের মাথায় ওড়না ব্যবহৃত হয়। ঘাগরার উপর দিয়া দুইটি লাল কাপড়ের টুকরা ঝুলান থাকে, ইহাকে 'পাট্টুওয়াল' বলে। নট পুরাহাত্তের যে জামা পরেন তাহাকে 'কুপ্পায়াম্' বলা হয়। গলায় যে চাদর ঝুলান হয় তাহাকে 'উত্তরীয়ম্' বলা হয়। ইহার প্রান্তদেশে আয়না থাকে। একাধিক উত্তরীয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোনটির প্রান্তদেশ ফুলের ন্যায় করা হয়। বাদামীর তিন নম্বর গুহায় ত্রিবিক্রমের গলে যজ্ঞোপবীত অথবা উত্তরীয় দেখা যায়। অজন্তা গুহার চিত্রে দেখা যায়, দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পাটুয়ালের ন্যায় কাপড়ের টুকরা দেহের নানাস্থান হইতে লম্বমান হইয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। কথাকলি নৃত্যে পোষাকের সম্মুখভাগে জরীর কারুকার্যখচিত নীবিবন্ধকে 'মুণ্ডি' বলা হয়। বুকে 'কোটালারাম্' বাঁধিতে হয়। সাঁচীস্তূপে উৎকীর্ণ প্রস্তর মূর্তিতে পুরুষগণকে বক্ষে কোটলারামের ন্যায় কাপড়ের টুকরা বাঁধিতে দেখা যায়।

কথাকলি নৃত্যে পুরুষ চরিত্রগুলিকেও অলঙ্কার ব্যববহার করিতে দেখা যায়। পূর্বে ভারতীয় পুরুষগণও যে অলঙ্কার পরিতেন তাহার বহু বর্ণনা সংস্কৃত নাটকে ও গ্রন্থে পাওয়া যায়। কথাকলি নৃত্যে, অলঙ্কারের ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'কিরীটম্'। ইহাতে কারুকলার পূর্ণ বিকাশ। দুই প্রকারের কিরীটম্ দেখা যায়—'কেশ ভরম্' ও 'মুদি'। মুকুটের পশ্চাতে মণ্ডল অথবা চাকতি থাকিলে তাহাকে 'কেশ-ভরম্' কিরীটম্ বলা হয়। বাদামীর তিন নম্বর গুহায় বিষ্ণুবিক্রমের মুকুটের পশ্চাতেএইরূপ একটি মণ্ডল আছে।



'কেশভরম্' মুকুটের দুই পার্শ্বেও দুইটি মণ্ডল থাকে। ইহাকে 'তোড়া' বলা হয়। বাদামীর তিন নম্বর গুহায় দ্বারপালের মুকুটে এইরূপ চাকতি দেখিতে পাওয়া যায়। পাপাচারী অথবা দুষ্ট চরিত্রে মণ্ডলটি আকৃতিতে বৃহৎ হয়। ইহা সত্য যে, কথাকলি-কিরীটমের পূর্ব সংস্করণ হইতেছে কেশভরম্-কিরীটম্। চাক্কিয়ারগণ কিরীটমে প্রচুর তাজাফুল ব্যবহার করিতেন। মনে হয়, ফুল ক্ষণস্থায়ী বলিয়া কথাকলি শিল্পীগণ কাষ্ঠনির্মিত কিরীটমে কৃত্রিম মণিমুক্তা ব্যবহার করেন। কথাকলিতে আর এক প্রকারের মুকুট ব্যবহৃত হয়, ইহাকে 'মুদি' বলে। এই মুকুটটি মুনি ঋষিদিগের চূড়া বাঁধা চুলের ন্যায়। সাঁচীস্তূপের উত্তরদিকে প্রবেশপথের প্রাচীর গাত্রে যে মূর্তিটি আছে, তাহার শিরোভূষণে এইরূপ একটি মুকুট দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও এইরূপ মুকুটের উল্লেখ আছে। হনুমানের চরিত্রাভিনয়ের জন্য 'ভট্ট মুদি' মুকুট ব্যবহার করা হয়। এই মুকুটের চারিদিকে ছাতার মত ছড়াইয়া থাকে। 'কারি'-মুদির উপরিভাগ উন্মুক্ত থাকে। শূর্পনখা, শিকারী প্রভৃতি চরিত্রে ইহা পরিধান করিতে হয়। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্র অভিনয় করিবার সময় মুদিতে ময়ূরের পালক ব্যবহৃত হয়।

এই বিশ্ব প্রকৃতি মৌলিক জ্ঞানের আকর। মানুষ যুগে যুগে ইহা হইতে নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করিতেছে। এই প্রকৃতি মানুষকে সৌন্দর্য শিক্ষা দিয়াছে এবং তাহার সহিত সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য উপকরণগুলিও অকৃপণ হস্তে দান করিয়াছে। ভারতীয় রূপসজ্জায় ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ময়ূর পৃথিবীর পক্ষিকুলের ভিতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাহারই নানারঙে চিত্রিত পালকগুলি ভারতীয় নাট্যে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইহা ব্যতীত প্রসাধনের সামগ্রীও প্রকৃতিজাত দ্রব্য হইতে লওয়া হইত। অঙ্গরাগের উপাদান ছিল পুষ্পরেণু ও চন্দন। স্নানান্তে ধূপ ধূমে কেশসংস্কার ছিল অঙ্গসজ্জার একটি বিশেষ রূপ। রমণীর ওষ্ঠদ্বয় রঞ্জিত করিবার জন্য মধু, কুম্‌কুম্,

ও মোম মিশ্রিত প্রলেপ ব্যবহার করা হইত। রমণীর কপোল রঞ্জিত করিবার জন্য মনঃশিলাচূর্ণসহ দ্রব্য, হরিতাল মিশ্রিত বিবিধ টিপ, লবঙ্গ-ফুলের ও কেতকীর নির্যাস, অলক্তক ও হিঙ্গুল ব্যবহৃত হইত। কথাকলি নৃত্যেও প্রকৃতিজাত সাধারণ দ্রব্য হইতে মুখ চিত্রিত করিবার রীতি এখনও পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কথাকলি নৃত্যে শিরোভূষণ ব্যতীত আর যে সকল অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, তাহার ভিতর গোলাকৃতি অবতল 'কুণ্ডলম্', ক্ষুদ্রাকৃতি 'চেভিকুটু' উল্লেখযোগ্য। একটি তারকে লাল কাপড় দিয়া গোলাকৃতি করিয়া মুড়িয়া তাহার চারিদিকে কদমফুলের ন্যায় করিয়া দেওয়া হয়। ইহা কণ্ঠহারের ন্যায় শোভা পায়। মুকুটের নীচে লাল কাপড়ের সরু বন্ধনীকে 'চুট্টিতুনী' বলা হয় এবং ইহার উপর যে সিঁথি পরা হয়, তাহাকে 'নারা' বলা হয়। কৃত্রিম কেশকে 'চামরম্' বলা হয়। গলায় পুঁতির হার হইতেছে 'কাজুহারম্'। হাতের জন্য তিন প্রকার গহনা ব্যবহৃত হয়। স্কন্ধে যে গহনা ব্যবহার করা হয় তাহাকে 'তোল্‌ভালা', বাজুকে 'ভালা' এবং মণিবন্ধের গহনাকে 'কটকম্' বলা হয়।

কথাকলি নৃত্যে চারিত্রিক গুণাবলী স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট করিবার জন্য বিভিন্নভাবে মুখচিত্রণ করা হয়।

চরিত্রগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সদ্‌গুণাবলী হইতে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, অসচ্চরিত্রাবলী হইতে রাজসিকভাবাপন্ন এবং ধ্বংসমূলক কার্য হইতে তামসিকভাবাপন্ন চরিত্র-গুলির সৃষ্টি। শিব যদিও সাত্ত্বিকগুণের অধিকারী, তথাপি সংহারকর্ত্তা বলিয়া ধ্বংসমূলক চরিত্র বলিতে শিবকেই বুঝায়। বিভিন্ন রসকে পরিবেশন করিবার জন্য মুখগুলিকে অদ্ভুতভাবে চিত্রিত করা হয়। ভরত এইরূপ মুখচিত্রণের উল্লেখ করিয়াছেন। কথাকলি নৃত্যে বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন রঙ্ ব্যবহৃত হয়। হরিতালের গুঁড়া, নারিকেল তৈল ও নীল রঙ মিশাইয়া সবুজ রঙ্ প্রস্তুত করা হয়। সিন্দুর, চালের গুড়া

ও নারিকেল তৈল মিশাইয়া লাল রঙ্ প্রস্তুত হয়, ভূষা কালি অথবা ঝুলের সহিত নারিকেল তৈল মিশাইয়া কালো রঙ্ প্রস্তুত হয়।

চালের গুঁড়া ও চূণ দিয়া মুখে যে বিচিত্র রঙ্ করা হয়, তাহাকে 'চুট্টী' বলে। বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই 'চুট্টি' ব্যবহৃত হয়। মহিমান্বিত রাজা ও সাত্ত্বিকভাবাপন্নের কপাল সাদা, লাল ও কাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। রূপসজ্জা অনুসারে চরিত্রগুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়,—পাচ্চা, কাত্তি, তাড়ি, কারি ও মিনুক্কু। সাত্ত্বিক চরিত্রগুলি 'পাচ্চা' রূপসজ্জার অন্তর্গত। রাম, কৃষ্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলি সাত্ত্বিক চরিত্র। এই চরিত্র চিত্রণে মুখের সম্মুখভাগ গাঢ় সবুজবর্ণে রঞ্জিত করা হয় এবং নীচের চোয়াল বরাবর চুট্টী দেওয়া হয়। লাল অধর এবং কালো চোখ ও ভ্রূ অঙ্কিত করা হয়। নাট্যশাস্ত্রেও প্রায় এইরূপ বিবরণ আছে।

'কাত্তিতে' মুখের সবুজ রঙের সহিত লাল দেওয়া হয়। ইহাতে চুট্টী ব্যবহৃত হয়। মুখরঞ্জন সমাপ্তির পর একটি লাল সরু কাপড় মাথার খুলির নীচে বাঁধা হয় এবং তাহার উপর সাদা রঙে রঞ্জিত করা হয়। ইহাকে 'চুট্টিনতা' বলে। প্রতিনায়কদিগের ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়। রাবণ, কীচক, শিশুপাল চরিত্রে এইরূপ চিত্রণ কার্য করা হয়। ভ্রূ'র ঠিক উপরে লাল রেখা টানা হয়। ইহার উপর সাদা রেখা দেওয়া হয়। নাকের ঠিক মধ্যস্থলে সাদা ও লাল রঙের কল্কা কাটা হয়। তাহার উপর সাদা সোলার ছোট দুটি বল স্থাপন করা হয়। ইহাকে 'টিটুপুভ্যু' বলা হয়। কাত্তি রূপসজ্জার বিশেষত্ব হইতেছে যে, ইহাতে লাল বিরাট গোঁফ অঙ্কিত করা হয় এবং ইহার পাশে সাদা রঙের রেখা থাকে। গলা লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। ক্রোধ প্রকাশের জন্য অনেক সময় গজদন্ত ব্যবহার করা হয়। শ্মশ্রুর রঙ্ অনুসারে চরিত্রগুলির গুণ নির্ণয় করা হয়। তিন প্রকারের রঙ্ শ্মশ্রুতে ব্যবহৃত হয়—ভেলুপ্পু টাড়ি, কারুপ্পু টাড়ি ও চোকান্না

টাডি। ভেলুপ্পু টাডিতে সাদা শ্মশ্রু ব্যবহৃত হয়। পৌরাণিক উচ্চস্তরের জীবে ইহা ব্যবহার্য। উদাহরণস্বরূপ হনুমানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মুখের উপরিভাগ কাল এবং নাসিকার অগ্রভাগ ও মুখের নিম্নাংশ লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। চিবুকের দুইপার্শ্বে 'চুট্টি' দেওয়া হয়। অধরে সাদা রঙের উপর কাল ছাপ থাকে। মুখ গহ্বরে দাঁত ব্যবহার করা হয় এবং সাদা তুলোর দাড়ি লাগান হয়। শিকারী প্রভৃতি চরিত্রে কালো দাড়ি ব্যবহৃত হয়। যথা শিবের 'কিরাত' ছদ্মবেশ ধারণে কালো দাড়ি ব্যবহৃত হয়। দস্যু প্রভৃতি চরিত্র বুঝাইতে 'চোকান্না টাডি' অথবা লাল দাড়ি ব্যবহার করা হয় এবং মুখের উপরিভাগ কাল ও নিম্নভাগ লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়।

কারি চরিত্র রূপায়ণের জন্য কালো রঙ্ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ দানবী চরিত্রে এই রঙ্ ব্যবহার করা হয়।

মিন্নুক্কু চরিত্রগুলি হলুদ ও লাল বর্ণের হয়। সাধু অথবা মহৎ চরিত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়। ললাটে চন্দনের তিলক প্রভৃতি এবং আঁখিপল্লবে কাজল অথবা সুর্মার প্রলেপ শৃঙ্গার ও শান্তরসের উদ্রেক করে।

মণিপুরী নৃত্যের রূপসজ্জাও অতি মনোহর ও নয়নমুগ্ধকর। মণিপুরীর বিভিন্ন নৃত্যে বিভিন্ন বেশভূষা ধারণ করিতে হয়। মণিপুরী রাসনৃত্যে মস্তকের উপর চূড়ার আকারে একটি কালো রঙের পশম জাতীয় বল্ লাগান হয়। অনেক সময় বলের পরিবর্তে কেশগুলিকেও চূড়াকারে বাঁধা হয়। এই বলটিকে, 'কোক্‌তুম্বী' বলা হয়। প্রাচীনকালে 'কবরী-বন্ধন' চৌষট্টী কলার অন্যতম কলা ছিল। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় নৃত্যে বিভিন্ন ধারায় কবরী-বন্ধন করিতে দেখা যায়। বহু প্রাচীনকালেও বেণী রচনার প্রথা ছিল। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত 'বারহুত' স্তূপে চন্দ্র যক্ষীর প্রতিমূর্তিতে বেণীবন্ধন আছে এবং মাথায় পাগড়ীও আছে। যাহাই হউক, চূড়াকারে কেশবন্ধন প্রণালী ভারতের রমণীগণের

অতি প্রাচীন রীতি হইলেও এশিয়ার যে কোন বুদ্ধের প্রতি-মূর্তিতে আমরা চূড়াকারে কেশবন্ধন দেখিতে পাই। বৈষ্ণব সাহিত্যেও বালক কৃষ্ণের কেশ চূড়া করিয়া বাঁধিবার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা স্বভাবতঃই মানবমনে সাত্ত্বিক ভাবের সৃষ্টি করে। সেইজন্যই রাসনৃত্যে এইরূপ চূড়াকারে কেশ বন্ধন করিতে হয়। মণিপুরী নৃত্যে পুরুষগণের মাথায় পাগড়ী ও মুকুট এবং রমণীগণের মাথায় ওড়না প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। কাম্বোদিয়ার এ্যাঙ্করওয়াটের পূর্ব গ্যালারীতে সমুদ্র মন্থনের দৃশ্যে দানবদিগের মাথায় 'কোকতুম্বীর' ন্যায় একটি শিরোভূষণ দেখা যায়। ইহার সহিত মুকুটও আছে। মণিপুরী নৃত্যে পুরুষগণ কর্তৃক ব্যবহৃত মুকুটগুলি উপরদিকে সূচালো থাকে। কাম্বোদিয়ার এ্যাঙ্করওয়াটের দক্ষিণ গ্যালারীর স্বর্গীয় দৃশ্যে দেবতাগণের মুকুটগুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য প্রচুর। শ্যামদেশের (আধুনিক থাইল্যাণ্ড) নর্তক নর্তকীদিগের মাথায়ও এইরূপ সূচালো মুকুট থাকে। মুকুটের সহিত একটি ফিতা থাকে, সেইটিকে গলার নীচে বাঁধিতে হয়। মণিপুরী নৃত্যে পুরুষদিগের মুকুটগুলিও এইভাবে পরিতে হয়। এই দুই দেশীয় মুকুটের ভিতর একটি গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতের পূর্বে অবস্থিত দেশগুলির সহিত মণিপুর রাজ্যের সাংস্কৃতিক বিনিময় হইয়াছিল। রাসনৃত্যে মুখের উপর ব্যবহৃত সূক্ষ্ম ওড়নাটিকে 'মাইখুম্' বলা হয়। সূক্ষ্ম ওড়নার অন্তরালে মুখটি অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইহার দ্বারা ভক্তিনম্র ও লজ্জারুণ একটি সুন্দর ভাব ফুটিয়া উঠে। মণিপুরী নৃত্যে ঘাগ্‌রাকে 'কুমিন' বলা হয়। ঘাগ্‌রাটির ভিতরে বেত দিয়া শক্ত করা হয়। ইহাতে কাচের আয়না এবং নানাপ্রকার জরী লাগান থাকে। এই ঘাগ্‌রাটির উপর স্বচ্ছ আর একটি ছোট ঘাগ্‌রা থাকে। ইহাকে 'পোশওয়ান' বলা হয়। রাস-নৃত্যে পুরুষগণ প্রাচীনকালের ন্যায় কোমরবন্ধনী ও স্কন্ধের উপর লম্বমান কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করেন। সম্মুখ প্রান্তে বাঁধিবার

কাপড়ের টুকরাটিকে (কোমরবন্ধনী) 'খম্বপ' ও পার্শ্বে প্রলম্বিত কাপড়ের টুকরাটিকে 'খাওয়ান' বলা হয়। 'লাইহারাওয়া' নৃত্যে পুরুষগণ 'ত্রিকচ্ছ' পদ্ধতিতে পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া থাকেন। 'ত্রিকচ্ছ' পদ্ধতিতে অনেক গিঁট থাকে। মনে হয়, সূচী-শিল্প ছিল না বলিয়াই গিঁটের প্রচলন ছিল। মণিপুরের 'লাইহারাওয়া' নৃত্যে 'ফানেক' পরিধান করা হয়। 'ফানেক' পরিধান করিবার রীতির সহিত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নারীদিগের বস্ত্র পরিধানের রীতির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। 'লাইহারাওয়া' নৃত্যে ব্যবহৃত 'ফানেকে'র পাড়ে যেরূপ নক্সা থাকে, তাহার সহিত চান্‌হুদোড়োতে প্রাপ্ত একটি পাত্রের গাত্রে অনুরূপ নক্সা দেখিতে পাওয়া যায়। নাগা অঞ্চলের নাগা নৃত্যে নাগকন্যা ও পুরুষগণ সাপের ন্যায় লাল ও কালো ডোরাকাটা 'ফানেক' ব্যবহার করেন। মৈতৈগণ মনে করেন ইহা রাত্রি ও উষাকালের প্রতীক। ইহা সহজে অনুমান করা যায় যে, এই সকল নৃত্যের পোষাকে অনার্যপ্রভাব সুস্পষ্ট। কারণ পূর্বভারতের আসাম প্রান্তে নাগ দ্বীপ বা নাগরাজা ছিল। প্রাচীনকালে প্রান্তদেশ বলিতে ব্রহ্মদেশ, তিব্বত প্রভৃতিও বুঝাইত। এই সকল নাগরাজগণ অনার্য ছিলেন। অনার্য সভ্যতার নিদর্শন আজিও বাংলাদেশে দেখা যায়! উদাহরণস্বরূপ শাঁখা, সিন্দূর, নৈবেদ্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু অনার্যের সহিত আর্যের যে সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহা অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। আর্যসভ্যতার স্পর্শও যে মণিপুরী নৃত্যের রূপসজ্জার ভিতর আছে তাহাও স্বীকার্য। আর্যগণের ন্যায় মণিপুরী নৃত্যে শিরোভূষণ হিসাবে 'পাগড়ী' ব্যবহৃত হয় এবং কতকগুলি বিশেষ চরিত্রে মুকুট ব্যবহৃত হয়। পাগড়ীর একটি অংশ পৃষ্ঠদেশে লম্বমান অবস্থায় থাকে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হইতে সহজেই অনুমেয় যে, মণিপুরী সংস্কৃতিতে আর্য অনার্য ও প্রান্তদেশে প্রচলিত মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির অদ্ভুত সংমিশ্রণ হইয়াছে। কোন সংস্কৃতিই অপরকে অতিক্রম করিয়া নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিতে পারে নাই। অথচ সুন্দরভাবে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

ভক্তিরসের প্রাবল্যের জন্য রাসনৃত্যের পোষাকগুলি এইরূপভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, গাত্রের অংশ খুব অল্পই দেখা যায় এবং অঙ্গ-হারও অতি সুচারু ও নম্রভাবে করিতে হয়। রাসনৃত্যের সাজসজ্জা শ্রীশ্রীভাগ্যচন্দ্র মহারাজের নিজস্ব পরিকল্পনা। কথিত আছে যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রাসনৃত্যের প্রবর্তন করেন এবং তাহাতে আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের সংমিশ্রণ করেন। ইহা সত্য যে, এই কবি ও শিল্পী মনটি সুন্দরের উপাসনা করিয়া সৌন্দর্যের রস আস্বাদন করিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাই নৃত্য ও গীতের ভিতর মূর্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। অনার্য অপেক্ষা আর্য-সৌন্দর্যেই তাঁহার রসিক মন অধিকতর লীন হইয়াছিল। রাসনৃত্যে নর্তকীগণ 'কোকতুম্বীর' নীচে 'কোকনাম' অথবা সিঁথি পরেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরার বৃক্ষদেবীর মাথায় এইরূপ সিঁথির ব্যবহার দেখা যায়। কোক্‌তুম্বীর সহিত কতকগুলি জরীর ঝুল্‌মি ঝোলান হয়, ইহাকে 'চুবারৈ' বলা হয়। ইহার সাদৃশ্য দেখা যায় অজন্তা গুহায় অপ্সরার মাথায় পরিহিত পাগড়ীর সহিত কতকগুলি দোদুল্যমান মুক্তার সারির। শ্যামদেশের মুকুটের সহিতও এইরূপ ঝুলমি থাকে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ধরনের গহনা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—কুণ্ডরনাইন (কুন্তল), মরৈ পারেং (দুই সারি হার), কিয়াঙ্‌ লিক্ ফাঙ্‌ (চওড়া হার), পারিজাত পারেং, পুং দুং পারেং (খোলের মত আকৃতি-যুক্ত হার), পাম বোম ফাবি (বাজু), তাং (আর্মলেট), ফুজেং ফাবি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণের মুকুটটি পাগড়ীর সহিত সংযুক্ত থাকে। ইহাকে মইতুন্‌ বলা হয়। ইহার উপর কোকনাম লাইত্রেং (জরীর সিঁথি) দেওয়া হয় ও তাহার উপর ময়ূর পালক অথবা চূড়া সংযুক্ত হয়। নারীদিগের গহনা কৃষ্ণের গহনার অনুরূপ। 'লাইহারাওবা' নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদকে 'নিংখম সমজিন' বলা হয়। নিংখমের অর্থ হইতেছে ত্রিকোণা কাপড়। সমজিনের অর্থ হইতেছে মুকুট। মুকুটের সহিত একটি

বস্ত্র সংযুক্ত থাকে। মুকুটটি পরিয়া বস্ত্রটি সম্মুখদিকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিতে হয়। এই কাপড়ের টুকরাটিকে 'খোঁগাড়ী' বলা হয়। তরবারী বা লাঠি নৃত্যে 'খোঁগাড়ী' ব্যবহৃত হয়। শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পালা কীর্তনের সময় অথবা করতাল, প্রভৃতি নৃত্যে বড় বড় পাগড়ী বাঁধিতে হয়।

উত্তর ভারতের কথক নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদ মণিপুরী নৃত্য ও কথাকলি নৃত্যের মত অত চমকপ্রদ না হইলেও নৃত্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। পূর্বকালে কথক নৃত্যে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটি স্বচ্ছ জামা পরা হইত। ইহাকে 'পেশোয়াজ' বলা হয়। 'পেশোয়াজ' কথাটি আসিয়াছে 'পাশুজ্জা' শব্দ হইতে, যাহার অর্থ হইতেছে সেলাই করা। আকবরের দরবারে বিশিষ্ট সভাসদগণ এইরূপ পোষাক পরিতেন। বাদশাহ নিজেও এইরূপ পোষাক পরিতেন। জাহাঙ্গীরের সময় ইহার পরিবর্তন হয়। তাঁহার রাজত্বে অভিজাত মহলে যে পোষাক পরিধান করা হইত তাহা অত স্বচ্ছ ছিল না। স্বচ্ছ বস্ত্রের পরিবর্তে 'ব্রোকেড' 'সিল্ক' প্রভৃতি ব্যবহার করা হইত। কিন্তু নর্তক-নর্তকীগণের বেশভূষার কোন পরিবর্তন হয় নাই। আকবরের দরবারে যেরূপ স্বচ্ছ পোষাকের ব্যবহার ছিল তাহাই পরিধান করা হইত। অনেকে কথক নৃত্যের পোষাককে রাজপুতদিগের অনুরূপ বলিয়া ইহার শুদ্ধ হিন্দুত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজপুতগণের পোষাকও মুঘলগণের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল। ডাঃ চার্লস ফেব্রী বলিয়াছেন—Towards the end of the 16th century, when diaphanous jamas and skirts became the fashion at court, the gentlemen of Rajasthan wore the same dress. (This went out of fashion around 1610, when transparent skirts were worn only by entertainers whilst gentlemen

and ladies wore opaque material)." ইহা ব্যতীত বেসিল গ্রের 'পার্শিয়ান মিনিয়েচাস'—নামক পুস্তকটিতে ১নং প্লেটে যে চিত্রটি আছে, তাহাতে জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় রাজপুত্র ও তাঁহার সঙ্গীদের যে চিত্রটি আছে, তাহার সহিত মুঘল ও কথক নৃত্যের পরিচ্ছদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কথক নৃত্যেও চুরীদার পায়জামা. পেশোয়াজের উপর জ্যাকেট ও ওড়না অথবা টুপী ব্যবহার করিবার প্রথা ছিল। ইরাণীগণও এইরূপ পেশোয়াজ, সলোয়ার, টুপী পরিধান করিতেন। জ্যাকেট হিন্দুদিগের ভিতর ব্যবহৃত হইত না। হিন্দু নারী-পুরুষগণ টুপী ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু তাহার আকৃতি ছিল ভিন্ন ধরনের। প্রাচীনকালে ভারতীয় নারীগণ ছোট ছোট ওড়না ব্যবহার করিতেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ছোট ওড়নার পরিবর্তে বড় বড় ওড়না ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রাজপুত নারীগণ ঘাগরা, ওড়না, পায়জামা ও আঙ্গিয়া (এক প্রকার ছোট ব্লাউজ) ব্যবহার করেন। ঘাগরা, ওড়না ও আঙ্গিয়ায় সোনা, রূপার সূক্ষ্ম কাজ থাকে। আধুনিক যুগে কথক নৃত্যে অনেকে ঘাগরা ও শাড়ী পরিধান করেন। রাজপুত নারীগণ গহনার ভিতর অন্যান্য গহনার সহিত শিরোভূষণ হিসাবে বোড়লা পরিয়া থাকেন। 'বোড়লা' টিকলী জাতীয় এবং কপালের উপর ইহা উঁচু হইয়া থাকে। কথক নৃত্যে বোড়লার পরিবর্তে 'ঝাপটা' ও 'টিকলী' ব্যবহৃত হয়। হাতে রতনচূড় পরিতেও দেখা যায়। কর্ণভূষণ, কণ্ঠহার, বালা প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। রতনচূড়, ঝাপটা ও নাকের গহনাগুলি মুসলমান নারীগণের ভিতরই প্রচলিত ছিল। ইহা বলা যায় যে, কথক নৃত্যের পোষাক মুঘলগণের অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং মুঘলগণ এই পোষাকের আমদানী করিয়াছেন পারশ্য ও মধ্যএশিয়া হইতে।

অনেকে কথক নৃত্যের বেশভূষার সহিত প্রাচীন হিন্দু ভাস্কর্যের বেশভূষার তুলনা দিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১নং অজন্তা গুহার

বাম প্রাচীরে (৬০০ খৃঃ—৬৪২ খৃঃ) গন্ধর্ব ও অপ্সরাদিগের নৃত্যের যে চিত্রটি পাওয়া যায়, তাহাতে কথকের অনুরূপ জামা পরিহিত একটি নর্তকীর উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার বেশভূষা অন্যান্য নর্তক নর্তকীগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। Dr. Charles Fabri এই নর্তকীর মূর্তিটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে,—The lovely, sinuous dancing girl in the Ajanta cave painting (Mahajan Jataka) is obviously completely differently dressed from all the other women in the caves, for she wears as long—sleeved garement with a plastron in front, probably bare at the back." তিনি বলিয়াছেন, আর কেহই এই ধরণের পোষাক পরে নাই কেন? তাঁহার মতে ইহা কোন যবন নারীর চিত্র। কারণ—ভারতীয় নারীগণ দেহের উপরার্ধে কোন বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। রাণী, মহারাণীদিগেরও যে খোদিত মূর্তি আছে তাহাতে জামার ব্যবহার নাই এবং বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত। এই সকল প্রাচীন চিত্র অথবা ভাস্কর্যের ভিতর কোন কোনও নারীকে জামা পরিতে দেখা যায় অথবা বক্ষঃস্থল আবরিত করিতে দেখা যায়। ইহারা অধিকাংশ পরিচারিকা অথবা নর্তকী এবং ইহারা যবন শ্রেণীভুক্ত। সংস্কৃত নাটকে, গ্রন্থে এইরূপ বহু বিবরণ পাওয়া যায় যে, পরিচারিকা এবং নর্তকীগণের ভিতর অধিকাংশ যবন শ্রেণীভুক্ত ছিল।

যাহাই হউক, উপরের আলোচনার দ্বারা আমরা ভারতের বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর রূপসজ্জার একটি স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক নৃত্যশৈলীর রূপসজ্জাগুলি একটি বৈশিষ্ট্য লইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের রসিক-সমাজের সমাদর লাভক রিয়াছে। রূপসজ্জাগুলি ভারতীয় ঐতিহ্যকে যথাযথরূপে অনুসরণ করিয়াছে বলিয়াই ইহাদের সৌন্দর্য বিশেষ ভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে।

তাল

তাল সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া সঙ্গীতাচার্য কোহল সৃষ্টি-রহস্যের এই দার্শনিক তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। সঙ্গীতজ্ঞ মতঙ্গও মাত্রার উল্লেখে বলিয়াছেন যে, শিব ও শক্তির মিলনই বিশ্ব সৃষ্টির কারণ।

কিন্তু এই শিবই বা কে এবং শক্তিই বা কে? শিব হইতেছেন সেই পরম পুরুষ, যাঁহার দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে। তিনি সকলের মধ্যে প্রকাশমান, তিনি অনন্ত, অসীম ও শুদ্ধ। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সমুদয় জগতের অস্তিত্ব। উপনিষদে বলা হইয়াছে—সেই অনন্ত আত্মা এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥"

(কঠ উপ—২।২।১৫)

সেখানে সূর্য, চন্দ্র, তারকা সব নিষ্প্রভ, বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি সেখানে কোথা হইতে আসিল? তাঁহারই আলোকে সকলে আলোকিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সব কিছু দীপ্তি পাইতেছে। কপিলের মতে প্রকৃতি হইতেছে তাঁহারই ছায়া, তাঁহারই শক্তির প্রকাশ। শঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।"

অর্থাৎ শক্তির সহিত যুক্ত হইলেই শিব কার্যকরী ক্ষমতা লাভ করেন, নতুবা তাঁহার স্পন্দিত হইবার শক্তিও থাকে না। শিব

শবে পরিণত হন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি সর্বব্যাপী জড়রাশি। তাহাতে এই জগতের সমুদয় কারণ রহিয়াছে। ইহা নিয়মাধীন হইয়া কাজ করিতেছে এবং পরমপুরুষের চিৎ বা চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এইরূপে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন হইয়াছে। কোহল বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে তালের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইহা কিরূপে হইল? ঋগ্বেদে সৃষ্টির বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, এই অনন্ত পুরুষ নিশ্চেষ্ট ও গতিশূন্য ছিলেন। আকাশ সেই অনন্তপুরুষে সুপ্তভাবে ছিল। এই অবস্থাকে অব্যক্ত বা স্পন্দন-রহিত বলা হয়। এই আকাশ সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী। ইহার সঙ্গে সর্বব্যাপী শক্তি রহিয়াছে। এই শক্তি হইতেছে প্রাণ। প্রাণ বারংবার আকাশের উপর আঘাত দিতে থাকে এবং তাহাতেই স্পন্দন বা গতির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এই প্রাণই হইতেছে গতি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সব শক্তি এই প্রাণেই লয় পায় এবং সকল পদার্থই আকাশে পর্যবসিত হয়। পুনরায় প্রাণ হইতে গতির সঞ্চার হয়। এই গতির নিবৃত্তি নাই। প্রকৃতির নিয়মে জন্ম ও মৃত্যু নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলিতেছে। এই গতির স্পন্দনেই জগৎ সৃষ্ট হইল—ফুল ফুটিল, প্রভাতের সূর্য রঙ ছড়াইল, সাগর লহর তুলিল, স্রোতস্বিনী ও শৈলমালা বক্ষে ধারণ করিয়া প্রকৃতি সজ্জিতা হইলেন। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে জগৎ চলিতে লাগিল। কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই, অনিয়ম নাই। এই নিরবচ্ছিন্ন গতি আমাদের প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দনে ছন্দিত হইতে লাগিল। এই ছন্দের অনুভবে মাত্রা, লয় প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। কোহল তাল সম্বন্ধীয় উপরিউক্ত শ্লোকটির দ্বারা ভারতীয় দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। 'রুদ্রডমরূদ্ভবসূত্রবিবরণম্'-এ তাল সম্বন্ধে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা আছে—

"তালাত্মকং জগৎ সর্বং তালস্তু ব্যাপকঃ স্মৃতঃ।
সূত্রে সূত্রে স তালঃ স্যাৎ স তালঃ কালসম্ভবঃ॥"

অনেকে বলেন, তাণ্ডব ও লাস্যের আদ্য অক্ষর দুইটি লইয়া

'তাল' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। তাণ্ডবের সৃষ্টিকর্তা শিব এবং লাস্যের সৃষ্টিকর্তা পার্বতী। যাহাই হউক, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ শিব ও শক্তিকেই তালের সৃষ্টিকর্তা বলিয়াছেন।



অনেকে বলেন, ধ্বনি না থাকিলে তালের সৃষ্টি হইত না। নাট্যশাস্ত্রকারগণ ইহারও দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই হইতেছে রূপ। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে 'স্ফোট' অথবা শব্দব্রহ্ম। ইহার একটি মাত্র বাচক শব্দ 'ওঁ' সমগ্র আকাশ জুড়িয়া পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। 'সঙ্গীত মকরন্দে' বলা হইয়াছে যে, এই নাদ দেবতাগণ শ্রবণ করেন। মহাত্মা ও যোগিগণ সংযতচিত্তে এই নাদে আত্মনিবেশ করিয়া মুক্তি লাভ করেন। ইহাই 'অনাহত' নাদ। এই 'অনাহত' নাদ যখন কোন পদার্থের সাহায্যে উত্থিত হয়, তখন তাহাকে 'আহত' নাদ বলে। এই অনাহত 'ওঁকার' ধ্বনি বায়ুতরঙ্গের কম্পনে কম্পনে বিস্তৃততর হইয়া সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কম্পনের স্থিতিকাল এক একটি মুহূর্ত বা ক্ষণ। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণ নাদের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলিয়াছেন, 'নকার' ও 'দকার' এই দুই বীজ অক্ষরের দ্বারা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

'প্রাণ' ও 'অগ্নিকে' বুঝায়। পরবর্তী শাস্ত্রকারগণও এই কথাই বলিয়াছেন—

"নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে॥"

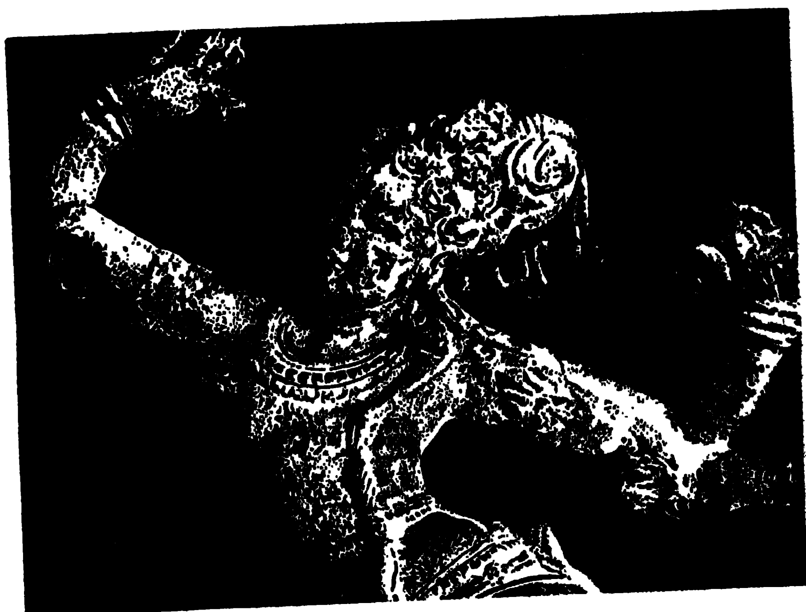
ইহা হইতে তালের সৃষ্টি।

"শম্ভোঃ সংপদ্যতে নাদো নাদাদ্যুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসো জায়তে কালঃ স কালস্তালসংজ্ঞিতঃ॥"

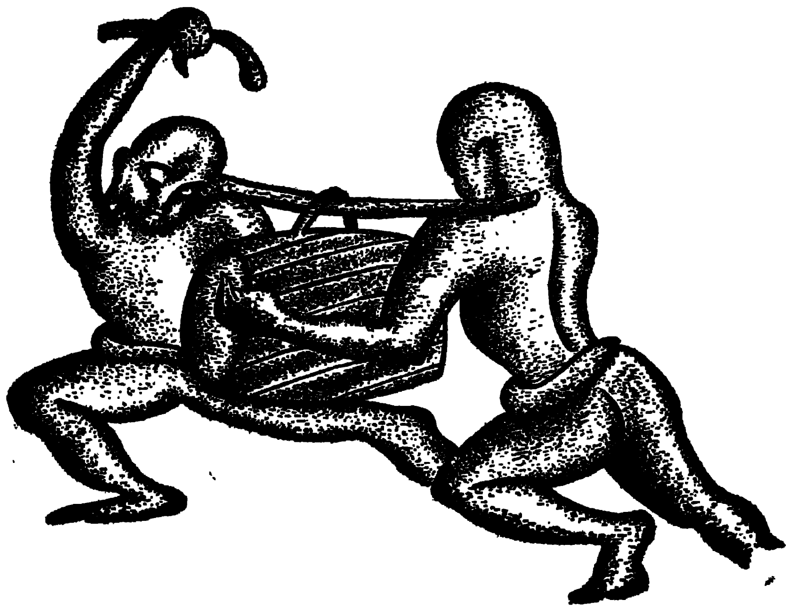
শম্ভু হইতে নাদের জন্ম, নাদ হইতে মনের এবং মন হইতে কালের জন্ম হইয়াছে। সেই কালই 'তাল' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, আকাশমার্গে বিদ্যমান বিভিন্ন স্তরের বায়ুতরঙ্গে শব্দ প্রবাহিত হইয়া আমাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে এবং আমরা এই শব্দ শুনিতে পাই। আমাদের দশেন্দ্রিয় ব্যতীত আরও একটি ইন্দ্রিয় রহিয়াছে। তাহা হইতেছে মন। আমাদের চেতনা অথবা বুদ্ধি মনকে সংবাদ দেয় এবং ইন্দ্রিয়গণের একটির দ্বারা আমরা তাহা গ্রহণ করি। নাদের ভিতর দিয়া মাত্রার অনুভূতি শ্রবণপথে চালিত হইয়া আমাদের দেহে ও মনে ছন্দের স্পন্দন জাগায়। এইরূপে আমরা ছন্দের স্পন্দন অনুভব করি।

আহত নাদকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে—নখজ (তত), বায়ুজ (সুষির), চর্মজ (আনদ্ধ), লোহজ (ঘন) ও শরীরজ। বীণা প্রভৃতির নাদ নখজ, বংশী প্রভৃতির নাদ বায়ুজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতির নাদ চর্মজ, মঞ্জিরা প্রভৃতির নাদ লোহজ। দেহ দ্বারা উৎপন্ন নাদকে শরীরজ বলা হয়। মনুষ্যদেহের বিভিন্ন স্থান হইতে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ণাত্মক। সর্বপ্রকার গীতই নাদাত্মক। নৃত্য, গীত ও বাদ্য নাদের অধীন। এই নাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রবিদ্ পাণিনীয় শিক্ষাকার একটি সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—



নৃত্যরত নটরাজ (ইলোরা, ৭৫০—৮৫০ শতাব্দী)



অবনদ্ধ বাদ্য (অমরাবতী, ২য় শতাব্দী)



অবনদ্ধ বাদ্য (পাহাড়পুর)



অবনদ্ধ বাদ্য (পাহাড়পুর)



কোনারক মন্দিরের মৃদঙ্গবাদিকা (১৩শ শতাব্দী)



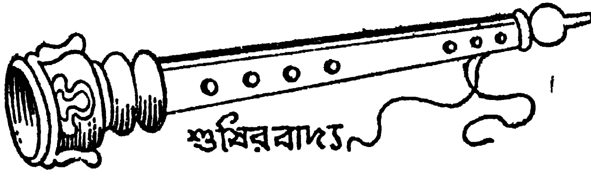
অবনদ্ধ বাদ্য (বরবুদুর, ৮ম শতাব্দী)

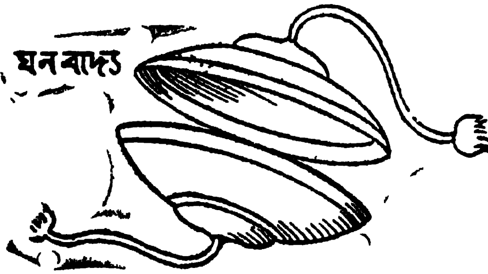


অনবদ্ধ-বাদ্য (তাঞ্জোর)

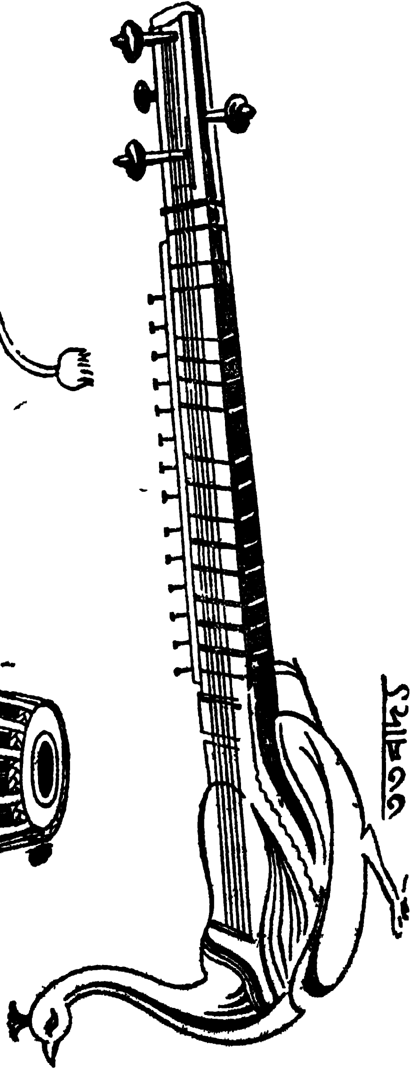


অনবদ্ধ বাদ্য (সাঁচি স্তূপ, ১ম শতাব্দী)


শুষিরবাদ্য


ঘনবাদ্য


অনবদ্ধ বাদ্য


ততবাদ্য

"আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি, স প্রেরয়তি মারুতম্।
মারুতস্তুরসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্॥"

অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সহিত অর্থকে প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রকাশ করিবার অভিলাষে মনকে নিযুক্ত করে। মন তখন দেহস্থিত অগ্নিকে আহত করে। সেই অগ্নি প্রাণবায়ুকে প্রেরণা দেয়। ঐ প্রাণবায়ু তখন বক্ষঃস্থলে বিচরণ করিতে করিতে নাদের সৃষ্টি করে।

এই নাদ হইতেই মাত্রা লয় এবং তালের সৃষ্টি। আমাদের মাত্রা নির্ণয় করিবার একটি পদ্ধতি রহিয়াছে। কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইবামাত্র তাহার স্থায়িত্ব দ্বারা আমরা গীতের মাত্রা নির্ণয় করি। শব্দের স্থিতি-কালটুকুকে মাপিবার মাধ্যম হিসাবে মাত্রার ব্যবহার হয়। শব্দটি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া বিলীন হওয়া পর্যন্ত সময়টুকুকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া মাত্রার গণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকার, টীকাকার, সূত্রকারগণ পশুপক্ষীর ডাক হইতে মাত্রা নির্ণয় করিয়াছেন। সূত্রকার সৌনক বলিয়াছেন—নীলকণ্ঠ পাখীর ডাক একমাত্রা, বায়সের ডাক দুই মাত্রা ও শিখীর ডাক তিনমাত্রা। এক কথায় আমরা বলিতে পারি, শব্দের স্থায়িত্বকে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশে ভাগ করিয়া অথবা শব্দের ক্ষণ পরিমাণ অনুসরণ করিয়া মাত্রার সৃষ্টি হইয়াছিল। নারদ মাত্রা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, নিমেষকাল অথবা বিদ্যুৎ চমকের কালই হইতেছে মাত্রা। সারদাতনয় বলিয়াছেন, পাঁচটি লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাই মাত্রা,-"পঞ্চলঘ্বক্ষরোচ্চারমিতা মাত্রা"। অমরকোষে বলা হইয়াছে—"অষ্টাদশনিমেষাস্তু কাষ্ঠা, ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ।" ভরতের মতে ৫টি নিমেষে একটি মাত্রা। গীতের সময় দুইটি কলার অন্তরে পাঁচটি নিমেষ 'কলান্তর' বলিয়া পরিচিত—"নিমেষাঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া গীতকালে কলান্তরম্"।

ক্ষণ বা মাত্রানুসারে স্বরের ভেদ নির্ণয় করা হইয়াছে। স্বরের সহিত অক্ষরযুক্ত হইয়া গীত, বাদ্য, তাল, বোল প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে।

তাল 'ঘন' (কাংস্য তালাদি)—শ্রেণীভুক্ত। তালের সহিত কলাপাত ও লয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভরত দুইটি প্রধান তালের উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—চতরস্র ও ত্র্যস্র। চতরস্রের অন্তর্গত 'চঞ্চতপুট' এবং ত্র্যস্রের অন্তর্গত 'চপপুট'। সঙ্গীত দর্পণে তালকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই তালগুলি হইতেছে—মার্গ, দেশী, শুদ্ধ, সালগ ও সঙ্কীর্ণ। নারদাদি নাট্যশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, দশটি প্রাণের সংযোগে এই তালের সৃষ্টি। দশটি প্রাণ বলিতে তালের বিশেষ বিশেষ গুণ ও কার্য পদ্ধতিকে বলা হইয়াছে। এই দশটি প্রাণ হইতেছে—কাল, মার্গ, ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি ও প্রস্তার। ভরত কিন্তু তালের ২০টি ভাগ বলিয়াছেন। এই ২০টি ভাগের ভিতর গীতের প্রক্রিয়াকেও গণ্য করা হইয়াছে। এই ২০টি ভাগ হইতেছে—আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক, শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, মাত্রা, বিদারী, অঙ্গুলি, যতি, প্রকরণ, গীত, অবয়ব, মার্গ, পাদভাগ, পদ, পাণি প্রভৃতি। ইহার ভিতর কয়েকটি নৃত্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। গীতের অবয়বের নাম 'বস্তু'। পদ ও বর্ণের সমাপ্তির নাম 'বিদারী'। মদ্রক, বর্ধমানাদি গীতকে প্রস্তুত করার নাম 'প্রকরণ'। গীতের চারিটি ভাগের প্রত্যেকটিকে 'পাদভাগ' বলা হইয়াছে। যাহা কিছু অক্ষর দিয়া তৈরী তাহাই 'পদ'। তালের দশটি প্রাণের বিবরণ নিম্নরূপ—

কাল—'কাল' বলিতে সময় বুঝায়। সঙ্গীতকারগণ বিভিন্ন ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সঙ্গীতমকরন্দে 'কাললক্ষণম্'এ বলা হইয়াছে যে,

"উপর্য্যুপরি বিন্যস্য পদ্মপত্রশতং সকৃৎ।
যঃ কালঃ সূচিসংভেদাৎ ক্ষণঃ স পরিকীর্তিতঃ॥"

৮টি ক্ষণে—১ লব	২ ত্রুটীতে—১ অনু
৮টি লবে—১ কাষ্ঠা	২ অনুতে—১ দ্রুত
৮টি কাষ্ঠায়—১ নিমেষ	২ দ্রুততে—১ লঘু

৮টি নিমেষে ১ কলা | ২ লঘুতে—১ গুরু
২টি কলায়—১ ত্রুটী | ৩ গুরুতে—১ প্লুত

১০ প্লুততে—১ পল। (২½ মিনিট কাল)

ভরত এইরূপ গণনাকে সঙ্গীতে কার্যকরী বলেন নাই।

মার্গ—তাল নির্ধারণ করিবার পদ্ধতিকে মার্গ বলা হইয়াছে। মাত্রাই হইতেছে তালের প্রধান মার্গ। সঙ্গীত মকরন্দে ৬টি মার্গের উল্লেখ করা হইয়াছে—দক্ষিণ, বার্তিক, চিত্রবিচিত্র, চিত্রতর ও অতিচিত্রতর। চিত্রতরকে লঘু ও দ্রুত ভেদে দুই প্রকার বলা হইয়াছে। দক্ষিণ মার্গে ৮ মাত্রা, বার্তিকে ৪ মাত্রা, চিত্রমার্গে ২ মাত্রা। অতিচিত্রতরে দ্রুত মাত্রা থাকিবে।

ক্রিয়া—তালকে হস্তের দ্বারা প্রদর্শন করিবার পদ্ধতিকে 'ক্রিয়া' বলা হয়। তালের দুইটি ক্রিয়া—মার্গ ও দেশী। মার্গ ক্রিয়া দুই প্রকার—সশব্দ ও নিঃশব্দ। সশব্দ ও নিঃশব্দের চারিটি করিয়া ভাগ আছে।

সশব্দ ক্রিয়া হইতেছে সম্য, তাল, ধ্রুব ও সন্নিপাত।

নিঃশব্দ ক্রিয়া হইতেছে আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশ।

সশব্দ ক্রিয়া—

সম্য—দক্ষিণ হস্তে তালি দিবার পদ্ধতি।

তাল—বাম হস্তে তালি দিবার পদ্ধতি।

ধ্রুব—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা তুড়ি দিয়া হস্ত নমিত করিবার পদ্ধতি।

সন্নিপাত—উভয় হস্তে তালি দিবার পদ্ধতি।

নিঃশব্দ ক্রিয়া—

আবাপ—উত্তান হস্তের অঙ্গুলি কুঞ্চনের নিয়মকে 'আবাপ' বলা হয়।

নিষ্ক্রাম—অধস্তলের অঙ্গুলিগুলিকে প্রসারিত করিবার নিয়মকে নিষ্ক্রাম বলে।

বিক্ষেপ—উত্তান হস্তের বিস্তৃত অঙ্গুলিগুলি দক্ষিণে স্থাপন করিবার নিয়মকে 'বিক্ষেপ' বলা হয়।

প্রবেশ—পুনরায় অঙ্গুলিগুলি সংকোচনের নিয়মকে 'প্রবেশ' বলা হয়।

দেশী ক্রিয়ায় ধ্রুবকা, সর্পিনী, কৃষ্যা, পদ্মিনী, বিসর্পিকা, বিক্ষিপ্তা, পতাকা ও পতিতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার করপাতনের দ্বাবা এইগুলি নির্ণয় করা হয়; যথা—'ধ্রুব' ছোটিকার দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

সর্পিনী ও কৃষ্যা হইতেছে যথাক্রমে বামগামিনী ও দক্ষিণগামিনী। পদ্মিনী ও বিসর্পিকা হইতেছে যথাক্রমে অধোগতা ও বহির্গতা। বিক্ষিপ্তাতে হস্তকে কুঞ্চিত করা হয়। পতাকা ও পতিতা হইতেছে যথাক্রমে ঊর্ধ্বগামিনী ও নিম্নগামিনী।

অঙ্গ—তালের বিভাগকে অঙ্গ বলা হইয়াছে। এই অঙ্গ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগ নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার দ্বারা গঠিত। এই পাঁচটি অঙ্গ হইতেছে অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু ও প্লুত। অনেকে দবিরাম ও লবিরামকেও অঙ্গের মধ্যে গণ্য করেন। অনুদ্রুতে ১ মাত্রা, দ্রুতে ২ মাত্রা, লঘুতে ৪ মাত্রা, গুরুতে ৮ মাত্রা ও প্লুতে ১২ মাত্রা ধরা হয়। পশুপক্ষীর ডাক হইতে এক একটি অঙ্গের মাত্রা নির্ণয় করা হইয়াছে। তিতির হইতে অনুদ্রুত, চটক হইতে দ্রুত, চাষ হইতে লঘু, বায়স হইতে গুরু ও কুক্কুট হইতে প্লুত মাত্রা নির্ধারিত হইয়াছে। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণ কল্পনা করেন যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান হইতে ইহাদের জন্ম হইয়াছে। অনুদ্রুত বায়ুজাত, দ্রুত জলসম্ভূত, লঘু অগ্নিজাত, গুরু আকাশসম্ভূত ও প্লুত পৃথিবী হইতে জাত। সঙ্গীত দর্পণে যে সাতটি অঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের মাত্রা এইরূপভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে; লঘুতে ১ মাত্রা, ইহার অধিষ্ঠাত্রাদেবী হইতেছেন পার্বতী। গুরুতে ২ মাত্রা, ইহার

অধিষ্ঠাত্রীদেবী হইতেছেন গৌরী ও লক্ষ্মী। প্লুততে তিন মাত্রা, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। দ্রুততে হইতেছে অর্ধমাত্রা; ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন শম্ভু। অনুদ্রুত হইতেছে অর্ধমাত্রার সিকি মাত্র। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রদেব। দ্রুতের উপর মাত্রা দিলে দবিরাম। দবিরামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কার্ত্তিকেয়। লঘুর উপর মাত্রা দিলে লবিবাম। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃহস্পতি। অতএব ১ মাত্রা লঘুতে অর্ধমাত্রা যোগ করিলে ১½ এবং লঘুর সহিত ⅛ যোগ কবিলে ১⅛ মাত্রা হইবে।

গ্রহ—তালের এক আবর্তনের ভিতর যে স্থান হইতে সংগীতের আরম্ভ হয়, তাহাকে 'গ্রহ' বলে। মুখ্যতঃ ৪টি গ্রহ আছে সম, বিষম, অনাগত ও অতীত।

সম—সমকালে সমপাণিতে গীত অথবা নৃত্য আরম্ভ হইলে তাহাকে 'সমগ্রহ' বলে।

বিষম—আদি ও অন্তের অনিয়ম হইলে তাহাকে বিষম 'গ্রহ' বলা হয়।

অতীত—গীতাদির পশ্চাতে তাল-প্রবৃত্তি হইলে তাহাকে 'অতীত-গ্রহ' বলা হয়। গ্রহভেদে তালকে চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা—তাল, বিতাল, অনুতাল ও প্রতিতাল। 'সম' হইতে তাল, 'অতীত' হইতে বিতাল, 'অনাগত' হইতে অনুতাল এবং 'বিষম' হইতে প্রতিতালের উদ্ভব হইয়াছে।

জাতি—মাত্রার তারতম্যে তাল-প্রবৃত্তির পরিবর্তনকে 'জাতি' বলা হয়। জাতি পাঁচ প্রকার—চতরস্র, ত্র্যস্র, খণ্ড, মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ। মানব-শ্রেণীর জাতিভেদের ন্যায় তালেরও জাতিভেদ নির্ণয় করা হইয়াছে। চতুর্মাত্রিক হইলে চতরস্র জাতি এবং ইহা ব্রাহ্মণজাতীয়। ত্রিমাত্রিক হইলে ত্র্যস্র জাতি এবং ইহা ক্ষত্রিয় জাতীয়। পঞ্চমাত্রিক হইলে খণ্ড জাতি হয় এবং ইহা বৈশ্য জাতীয়। নবমাত্রিক হইলে সঙ্কীর্ণ জাতীয় হয়।

কলা—সাধারণতঃ মাত্রার অপর নাম 'কলা'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিঃশব্দ ক্রিয়াকে কলা বলা হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রকার নারদের মতে কলার ৮টি ভাগ আছে। যথা—ধ্রুবকা, সর্পিনী, কৃষ্ণা, পদ্মিনী, বিসর্জিতা, বিক্ষিপ্তা, পতাকা, পতিতা। কিন্তু ভরতের মতে কলা তিন প্রকার। যথা—চিত্রা, বৃত্তি ও দক্ষিণা। চিত্রায় ২ মাত্রা, বৃত্তিতে ৪ মাত্রা ও দক্ষিণায় ৮ মাত্রা।

লয় :—ক্রিয়ার অন্তর যে বিশ্রান্তি তাহাকে 'লয়' বলে। শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন—"ক্রিয়ান্তর-বিশ্রান্তির্লয়ঃ।" অর্থাৎ কাল বা সময়ের অন্তরের নাম 'লয়'। অমরকোষে বলা হইয়াছে—"তালঃ কালক্রিয়ামানং লয়ঃ সাম্যমথাস্ত্রিয়াম্।" তাল, কাল ও ক্রিয়া, এই তিনটির ভিতর লয় সমতা রক্ষা করে। এক কথায় বলা যাইতে পারে, গীতের গতির সমতা রক্ষা করাকে 'লয়' বলে। লয় তিন প্রকার, স্থিত অথবা বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। তালের গতি অতি মন্দ হইলে বিলম্বিত, অপেক্ষাকৃত দ্রুত হইলে 'মধ্যলয়' এবং তদপেক্ষা দ্রুত হইলে 'দ্রুত লয়' হয়।

যতি—ভরতের মতে তালের লয়কে প্রয়োগ করার নিয়ম বা পদ্ধতি হইল 'যতি'। কতকগুলি সুসংবদ্ধ অক্ষরমালার সমষ্টিকে লয়ের গতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মাত্রার দ্বারা বিভক্ত করিয়া নির্দিষ্ট তালে নিয়ন্ত্রণ করিলে তাহাকে 'বোল' বলা হয়। এই বোল যতি সহকারে উচ্চারিত হইয়া লয়কে নিয়ন্ত্রিত করে। নিয়ন্ত্রণ করার এই পদ্ধতি হইল 'যতি'। শার্ঙ্গদেব বলিয়াছেন "লয়প্রকৃতিনিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে।" ভরত তিন প্রকার যতির উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা। পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রকারগণ আরও দুই প্রকার যতির উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—মৃদঙ্গা ও পিপীলিকা।

সমা—আদি, মধ্য ও অন্তে সম লয় থাকিলে তাহা 'সমা'।

স্রোতোগতা—আদিতে বিলম্বিত, মধ্যে ও অন্তে দ্রুত লয় থাকিলে তাহা 'স্রোতোগতা' হয়।

মৃদঙ্গা—আদি ও অন্তে দ্রুত ও মধ্যে বিলম্বিত হইলে তাহা 'মৃদঙ্গা' হয়।

অন্যমতে—আদি ও অন্তে দ্রুত ও মধ্যে মধ্য ও দ্রুতলয়ের মিশ্রণ হইলে তাহা 'মৃদঙ্গা' হয়।

পিপীলিকা—আদি ও অন্তে মধ্য এবং মধ্যে বিলম্বিত হইলে তাহা 'পিপীলিকা' হয়।

গোপুচ্ছা—আদিতে দ্রুত, মধ্যে মধ্য ও অন্তে বিলম্বিত হইলে তাহা 'গোপুচ্ছা' হয়।

অন্যমতে—আদিতে দ্রুত, মধ্যে দ্রুত ও অন্তে বিলম্বিত হইলে তাহা 'গোপুচ্ছা' হয়।

প্রস্তার—ইহার অর্থ হইতেছে তালের 'বিস্তার'। প্রস্তারের সময় তালের প্রকৃত ছন্দ, সশব্দ ক্রিয়া, মার্গ, কলা, মাত্রা, অঙ্গ প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণ জীবনের সহিত সঙ্গীতের একটি সাদৃশ্য খুঁজিয়াছিলেন। শুধু ইহাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হন নাই। দার্শনিক নাট্যশাস্ত্রকারগণ তাহার ভিতর দেবতাদিগের অবস্থান ও কল্পনা করিয়া লইতেন। তাঁহাদের মতে নাট্যের জনক শিবের পাঁচটি মুখ বলিয়া তাঁহার অপর নাম 'পঞ্চানন'। তাঁহার এই পাঁচটি মুখ হইতে পাঁচটি মার্গতালের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—

মুখ	জন্ম	জাতি	বর্ণ	যতি	নাম
পূর্বমুখ	ঋক্‌বেদ	ব্রাহ্মণ	গোক্ষীর	গোপুচ্ছা	চাচ্চৎপুট অথবা চঞ্চৎপুট
দক্ষিণমুখ	যজুর্বেদ	ক্ষত্রিয়	কুঙ্কুমকেশরী	পিপীলিকা	চাচপুট
পশ্চিমমুখ	অথর্ববেদ	বৈশ্য	কনকাভ	মুরজা	ষট্‌পিতা-পুত্রক
উত্তরমুখ	সামবেদ	তৎপুরুষ	মণিবর্ণ	গান্ধর্ব	সম্প-বেষ্টিক
ঊর্ধ্বমুখ	আগম	ঋষি	নীলবর্ণ	সমযতি	উদ্‌ঘট

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রগুলিতে দেখা যায় যে, পূর্বকালে সংগীতে বহুপ্রকার তালের প্রচলন ছিল। এই সকল তালগুলি দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল —মার্গ ও দেশী। ভরত একশত আটটি দেশী তালের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী শাস্ত্রকারগণ আরও অনেক তালের নাম করিয়াছেন। এই তালগুলি হইতেছে—

আদি-তাল, দ্বিতীয় তাল, তৃতীয় তাল, চতুর্থ-তাল, পঞ্চম-তাল, নিঃশঙ্কলীন, দর্পণ, সিংহবিক্রম, রতিলীল, সিংহলীল, কন্দর্প, বীরবিক্রম, রঙ্গ, শ্রীরঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, যতিলগ্ন, গজলীল, হংসলীল, বর্ণভিন্ন, ত্রিভিন্ন, রাজচূড়ামণি, রঙ্গধোত, রঙ্গপ্রদীপক, রাজতাল, ত্র্যস্রবর্ণ, চতুরস্র-বর্ণ, সিংহবিক্রাড়িত, জয়তাল, বনমালী, হংসনাদ, সিংহনাদ, কুড়ক্কতাল, তুরঙ্গলীল, সর্ভলীল, ত্রিভঙ্গী, রঙ্গাভরণ, মণ্ঠ, মণ্ঠ (দ্বিতীয়), মণ্ঠ (তৃতীয়), মুদ্রিত মণ্ঠক, কোকিলপ্রিয়, নিঃসারুক, রাজবিদ্যাধর, জয়মঙ্গল, মল্লিকামোদ, বিজয়ানন্দ, জয়শ্রী, মকরন্দ, কীর্তি, শ্রীকীর্তি, প্রতিতাল, বিজয়, বিন্দুমালিনী, সম, নন্দন, মণ্ঠিকা, ক্রীড়াতাল, মণ্ঠিকা (দ্বিতীয়), দীপক, উদীক্ষণ, ঢেঙ্কী, বিষম, বর্ণমণ্ঠিকা, অভিনন্দন, অনঙ্গ, নান্দী, মল্লতাল, পূর্ণ, খণ্ডতাল, সম, বিষম (২য়), কন্দুক, একতালিকা, কুমুদ, কুমুদ (২য়), চতুস্তাল, ডোম্বুলী, অভঙ্গ, রায়বেঙ্কল, বসন্ত, লঘুশেখর, প্রতাপশেখর, ঝম্পাতাল, গজঝম্প, চতুর্মুখ, মদন, প্রতিমণ্ঠক, পার্বতীলোচন, রতিতাল, লীলাতাল, করণযতি, ললিতগারুগি, রাজনারায়ণ, লক্ষ্মীশা, ললিতপ্রিয়, শ্রীনন্দন, জনক, বর্ধন, রাগবর্ধন, ষট্‌তাল, অন্তরক্রীড়া, হংস, উৎসব, বিলোকিত, গজ, বর্ণযতি, সিংহ, করুণ, সারস, খণ্ডতাল, চন্দ্রকলা, লয়, স্কন্দ, অড্ডতালী, ধত্তা, দ্বন্দ্ব, মুকুন্দ, কুবিন্দুক, কলধ্বনি, গৌরী, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ভগ্নতাল, রাজমৃগাঙ্ক, রাজমার্তণ্ড, নিঃশঙ্ক, শার্ঙ্গদেব, চর্চরী, মিশ্রবর্ণ, সিংহনন্দন।

মতান্তরে কতকগুলি দেশী তালের নাম তবলার ঠেকার সহিত নীচে প্রদত্ত হইল।

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
পটতাল	৪ । ৪	৮	২
	+ ২		
ঠেকা	ধা ত্রেকে ধিন্ না । ধা ধিন্ ধাগে ত্রেকে ।		
মহেশতাল	৪ । ২ । ৩	৯	৩
	+ ২ ৩		
ঠেকা	ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকে । ধিন্ না । ধিন্ ধাগে ত্রেকে ।		
করাল মঞ্চ	১ । ২ । ২	৫	৩
	+ ২ ৩		
ঠেকা	ধা । ধিন — । ধা ত্রেকে ।		
লঘু শেখর	৪।৩	৭	২
	+ ২		
ঠেকা	ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকে । ধিন্ ধিন্ না ।		
শঙ্খতাল	১।১।৪।১।৩	১০	৫
	+ ২ ৩ ৪ ৫		
ঠেকা	ধিন্ । ধিন্ । ধা ত্রেকে থুন্ না । ধিন্ । ধাগে ত্রেকে থুনা		
ঝম্পা	৩।৩।৪	১০	৩
	+ ২ ৩		
ঠেকা	ধিন্ ধিন্ না । ধিন্ ধিন্ না । ধিন্ ধিন্ ধাগে ত্রেকে		
বিশব তাল	২।২।১।১।২।১।১।১।২	১৩	৯
	+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭		
ঠেকা	ধা — । ধিন্ — । ধা । ধা । ধিন্ — । ধা । ধা		
	৮ ৯		
	। ধিন্ । ধাগে ত্রেকে		

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
শিখর তাল	৫।৬।২।৪	১৭	৪

+ ২
ঠেকা খিন্ ধা ত্রেকে তিন্ না | খিন্ খিন্ ধা ত্রেকে তি না |
৩ ৪
ক তা | খিন্ খিন্ ধাগে ত্রেকে ।

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
শঙ্কর তাল	১।২।১।১।২।১।১।১।১	১১	৯

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ঠেকা ধা | খিন্ — | ধা | ধা | খিন্ — | ধা | ঘেনে |
৮ ৯
নাগ | তেটে

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
শক্তিতাল	২।১।২।১।১।১।২	১০	৭

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ঠেকা ধা — | খিন্ | ধা — | খিন্ | ধাগে | ত্রেকে |
থুন্ — |

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
ইন্দ্রতাল	৪।৪।২।২।৩	১৫	৫

+ ২ ৩
ঠেকা খিন্ খিন্ ধা ত্রেকে | খিন্ খিন্ ধা ত্রেকে | খিন্ ধা |
৪ ৫
ত্রেকে তিন্ | খিন্ ধাগে ত্রেকে

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
ব্রহ্মযোগ	২।১।২।১।১।২।১।১।১।৩	১৫	১০

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
ঠেকা খিন্ না | খিন্ | ধাগে ত্রেকে | খিন্ | খিন্ | ধাগে
৭ ৮ ৯ ১০
ত্রেকে | খিন্ | না | খিন্ | ধাগে ত্রেকে থুনা |

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
বিষ্ণুতাল	৪।২।৪।২।২।৩	১৭	৬

+ ২ ৩ ৪
ঠেকা ধা—ধিন্ না। ধা ত্রেকে। ধা ধা ধিন্ না। ধা
৫ ৬
ত্রেকে। ধিন্ —। ধিন্ ধাগে ত্রেকে।

সুদর্শন তাল	২।২।২।২।২।২।৮	২০	৭

+ ২ ৩ ৪ ৫
ঠেকা ধা —। ধা গে। ধা ত্রেকে। ধিন্ না। ধা ত্রেকে।
৬ ৭
ধিন্ না। ধিন্ — ধিন্ — ধিন্ ধিন্ ধা ত্রেকে।

অর্জুন তাল	৪।২।৪।২।২।৪।২	২০	

+ ২ ৩ ৪
ঠেকা ধা—তেরে কেটে। ধি না। ধা — ধি না। ধাগে
৫ ৬ ৭
ত্রেকে। ধিন্ —। ধা — থু না। তেরে কেটে।

গণেশ তাল	৪।১।৪।১।১।৪।১।১।১।৩	২১	১০

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
ঠেকা ধা — কে টে। ধা। ধিন্—ধিন্ ধিন্। ধা। ধিন্। ধা
৭ ৮ ৯ ১০
ত্রেকে থু না। ধিন্। ধা। কৎ। ধাগে তেরেকেটে
থুনা।

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
রুদ্র তাল	২।২।১।২।১।১।২।১।১।২।১	১৬	১১

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ঠেকা ধা — | ধিন্ না | ত্রেকে | ধিন্ না | কৎ | ধা | ধিন্

৮ ৯ ১০ ১১

না | ত্রেকে | ধা | ধি না | ত্রেকে |

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
জগঝম্পা	৮।২।২।৩	১৫	৪

+ ২ ৩

ধা — ধিন্ না থুন্ না ক তা | ধিন্ ধিন্ | ধা

৪

তেরেকেটে | ধিন্ ত্রেকে ধিনা |

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
বারপঞ্চ	৪।২।২।৪।২।২	১৬	৬

+ ২ ৩ ৪

ঠেকা ধা ত্রেকে ধি না | ধিন্ না | ধা ত্রেকে | ধি গ ধি না |

৫ ৬

ধিন্ ধিন্ | ধাগে ত্রেকে |

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
দোবাহার	৩।১।১।১।২।১।১।১।২	১৩	৯

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ধিন্ ধা ত্রেকে | ধিন্ | ধা | ধিন্ | ধা কৎ | ধিন্ |

৭ ৮ ৯

ধা | ধিন | ধাগে ত্রেকে |

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালী
লক্ষ্মী তাল	১।১।২।১।১।২।১।১।১।১।১।১ ১।১।২	১৮	১৫

+ ২ ৩ ৪ ৫

ধিন্ | ধা | তেরেকেটে তিন্ | ধিন্ | তেরেকেটে |

নাম	ছন্দ	মাত্রা	তালা

৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
ধাধা তিন্ | ধাধা | তেরেকেটে | ধিন্ | ধা | ধিন্ |
১২ ১৩ ১৪ ১৫
ধাগে | তেরেকেটে | ধিন্ | ধাগে তেরেকেটে |

ব্রহ্ম তাল (১ম) ২।১।২।১।১।২।১।১।১।২ ১৪ ১০
\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ধা — | ধা | ধিন্ — | ধা | ধা | ধিন্ — | ধা |
৮ ৯ ১০
ঘেঘে | নাগ | থুন্— |

ব্রহ্মতাল (২য়) ৪।২।৪।২।২।৪।২।২।২।৪ ২৮ ১০
\+ ২ ৩ ৪
ধা গে ধিন্ তা | কেটে ধা | তেটে ধা ধিন্ তা | ধা
৫ ৬ ৭
দেৎ | ধাগে তেটে | গদি ঘেনে তা দেৎ | ঘেঘে তেটে |
৮ ৯ ১০
গদি ঘেনে | তাগে তেটে | গদি ঘেনে তা দেৎ |

গজঝম্পা ৪।৪।৩।৪ ১৫ ফাঁক ১, ৩
\+ ২ ০
ধা তেরেকেটে ধিন্ না | ত্রেকে ধিন্ ধিন্ না | তিন্
৩
তিনা তেরেকেটে | ধিধি না-তেটে ধিধি না-তেটে |

প্রাচীনকালে মাত্রার চিহ্ন নিম্নরূপে দেওয়া হইত। এক কলা—ৎ, দ্বিকলা—ৎৎ, চতুষ্কলা—ৎৎৎৎ। কলা অর্থে মাত্রা। চতুষ্কলা চচ্চতপুট হইতেছে—ৎৎৎৎ, ৎৎৎৎ, ৎৎৎৎ, ৎৎৎৎ। দ্বিকলা চচ্চতপুট হইতেছে—ৎৎ, ৎৎ, ৎৎ, ৎৎ।

আধুনিক কালে উত্তর ভারতীয় তালের সহিত দক্ষিণ ভারতীয় তালের একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ভারতে জাতি হিসাবে তাল নির্ণয় করা হয় না। মাত্রার সংখ্যানুসারে তালের জাতি নির্ণয় করা হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে জাতি হিসাবে তালের মাত্রা নির্ণয় করা হয়। দক্ষিণভারতে কর্ণাটক পদ্ধতিতে অতি প্রাচীনকালে ১০৮টি তাল-ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে উক্ত ১০৮টি তালের ভিতর ৫৬টি বিশেষ তাল প্রচলিত হয়। আধুনিক কালে ৫৬টির ভিতর সাতটি প্রধান তাল এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১০৮ তাল 'অষ্টোত্তরশত তালম্', ৫৬টি তাল 'অপূর্বতালম্' এবং শেষোক্ত সাতটি তাল 'সপ্ততালম্' নামে পরিচিত। ইহাতে জাতি অনুসারে মাত্রার পরিবর্তন হয়। কর্ণাটক পদ্ধতিতে নাট্যশাস্ত্রোক্ত প্রাচীন তালপদ্ধতির ছায়াপাত দেখা যায়! পাঁচটি জাতিতেই সপ্ততালমের মাত্রার পরিবর্তন হইবে। তালের অঙ্গের ভিতর দ্রুত ও অনুদ্রুতের পরিবর্তন হয় না। কর্ণাটক পদ্ধতিতে অনুদ্রুততে ১ মাত্রা, দ্রুততে ২ মাত্রা, গুরুতে ৮ মাত্রা, প্লুততে ১২ মাত্রা এবং কাকপদে ১৬ মাত্রা গণ্য করা হয়। সপ্ততালমে দ্রুত ও অনুদ্রুতের মাত্রা পরিবর্তিত হয় না; কিন্তু জাতি হিসাবে লঘুর মাত্রা পরিবর্তিত হয়।

'সপ্ততালমে' সাতটি তালের সমাবেশ হইয়াছে। এই সাতটি তাল হইতেছে—ধ্রুবম্, মতম্, রূপকম্, ঝম্পা, ত্রিপুট, অঠ ও একম্। এই নামগুলি অপভ্রংশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম লইয়াছে। ইহাদের অঙ্গের চিহ্ন নিম্নরূপ—

লঘু— | , দ্রুত—০, অনুদ্রুত—◡॥

শুদ্ধ	অপভ্রংশ	চতরস্র জাতি	মাত্রার চিহ্ন
ধ্রুবম্	তুরুবম্		। ০ । ।

মৃদঙ্গের ঠেকা—তাকাদিমি তাকা তাকাদিমি তাকাদিমি ১৪ মাত্রা।

শুদ্ধ	অপভ্রংশ	চতরশ্র জাতি	মাত্রার চিহ্ন
মতম্	মট্টিয়ম্		। ০ ।
মৃদঙ্গের ঠেকা—তাকাদিমি তাকা তাকাদিমি		১০ মাত্রা	
রূপকম্	রূপকম্		০ ।
মৃদঙ্গের ঠেকা—তাকা তাকাদিমি		৬ মাত্রা	
ঝম্পা	ঝম্পা		। ⌣ ০
মৃদঙ্গের ঠেকা—তাকাদিমি তা কিটা		৭ মাত্রা	
ত্রিপুট	তিরপুড়াই		। ০ ০
মৃদঙ্গের ঠেকা—তাকাদিমি তাকা দিমি		৮ মাত্রা	
অঠ	অড্ড		। । ০ ০
মৃদঙ্গের ঠেকা—তাকাদিমি তাকাদিমি তাকা দিমি		১২ মাত্রা	
একম্	একম্		।

মৃদঙ্গের ঠেকা—তাকাদিমি। 8 মাত্রা

'জাতি' হিসাবে লঘুর মাত্রার পরিবর্তন হওয়াতে তালের মাত্রারও পরিবর্তন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, চতরশ্রে তুরুবম্ ১৪ মাত্রা হইলে ত্র্যস্রে ১১ মাত্রা হইবে।

শুদ্ধ	অপভ্রংশ	ত্র্যস্রজাতি	মাত্রার চিহ্ন
ধ্রুবম্	তুরুবম্	তাকিটা তাকা তাকিটা তাকিটা	১১ মাত্রা।

কথাকলি নৃত্যে ভিন্ন ধরণের তাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই তালগুলি হইতেছে চেম্বাড়া অথবা আদি, চম্পা অথবা ঝম্পা আতা অথবা আড়ান্দা, পঞ্চারি অথবা রূপক। কথাকলি নৃত্যে তালের চিহ্ন নিম্নরূপে দেওয়া হইয়া থাকে—

। = হাতের আঘাত।

০ = অঙ্গুলির কর গুণা।

X = ফাঁকের ইঙ্গিত।

চেম্বাড়া আটমাত্রা

তালের স্বরূপ

। ০ ● ০ । X X

চম্পা = ১০ মাত্রা

তালের স্বরূপ

০ ০ ০ ০ ০ । । X

আড়ান্দা = ১৪ মাত্রা

তালের স্বরূপ

। ০ ০ ০ ০ । ● ০ ০ ০ । X । X

ত্রিপতা = ৭ মাত্রা

তালের স্বরূপ

● ০ । X । X

পঞ্চারি = ৬ মাত্রা

তালের স্বরূপ

০ ০ ০ । X

কথাকলি নৃত্যের তালে 'জাতি' হিসাবে মাত্রার পরিবর্তন হয় না। মাত্রা হিসাবে তাল নির্ণয় করা হয়।

পুরী নৃত্যে খোলের বোলের সহিত নৃত্য করা হয়। ঠেকাগুলিও খোলের বোলের অনুযায়ী হইয়া থাকে। বহুপূর্বে মণিপুরে যে সকল তালগুলি প্রচলিত ছিল, সেইগুলি কামরূপীয় তাল নামে পরিচিত। এই তালগুলি হইতেছে রুদ্রত, গণেশ, নবগ্রহ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, রূপক, বরপুট, খরপুট, ত্রিপুট, ছুটা, লেহেমযতি, খরযতি, যতিমান বা খরপরি তাল, মাঠপরি, একতালী, ত্রিতালী, খামার ও জিকরি। বর্তমানে এই সকল অধিকাংশ তালই অপ্রচলিত। অধুনা যে সকল তাল প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে মণিপুরী নৃত্যে

নিম্নলিখিত তালগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা—রাজমেল, চৌতাল, রূপক, তানচপ, সুরফাঁক, ঝম্পা, অচৌবা।

'রাজমেলভূষণা' তাল 'ভঙ্গী পারেং' এ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ঠেকা নিম্নরূপ—

+ ২ ০ ৩
ধিন্—ঘিন্— | ধেন্ তা— | ধিন্—থেন্— | ধিন্ তাং—

+ ২ ০ ৩
তেন্—তা— | তেন্ তা— | তা— — — | খিৎ ঘিনা গ্রা |

'রাজমেলভূষণা' ৭ মাত্রার তাল হইলেও ২৮ মাত্রায় ইহার একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয়! কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, ৭ মাত্রার পর অথবা ১৪ মাত্রার পরও 'সোম' আসিতে পারে। শিল্পী ২৮ মাত্রার ঠেকাতে ৭ মাত্রা অথবা ১৪ মাত্রার পর 'সোম' দেখাইতে পারেন অথবা গীত ও নৃত্য শেষ করিতে পারেন। এই অবাধ স্বাধীনতাটুকু রক্ষা করিবার জন্যই ইহাকে ৭ মাত্রার তাল গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে এই স্বাধীনতা নাই। অর্থাৎ ১৬ মাত্রার তাল হইলে ১৬ মাত্রার পর নির্দিষ্ট তালে 'সোমে' আসিতে হইবে। 'সোম' ব্যতীত অন্য কোন তালের উপর অথবা ৮ মাত্রার পর গীত, বাদ্য অথবা নৃত্য শেষ করা যাইবে না এবং ঠেকার পুরা আবর্তন শেষ হইবার পূর্বে অন্য যে কোন তালে 'সোম' প্রদর্শনও চলিতে পারে না। তাহার কারণ ১৬ মাত্রাকে নির্দিষ্ট ৪টি তালে ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি তালের নামকরণ করা হইয়াছে। সুতরাং এই তালগুলি অতিক্রম করিয়া 'সোমে' আসিতে হইবে।

'রাজমেলভূষণা' ও 'রাজমেল' তালের ভিতর একটি পার্থক্য রহিয়াছে। 'রাজমেলভূষণা' ঠেকা 'ভঙ্গী অচৌবা' নৃত্যে বাজান হইয়া থাকে। কিন্তু 'রাজমেল' ঠেকা অতি বিলম্বিত লয়ে কীর্তনে বাজান হইয়া থাকে। বড় বড় তালগুলিকে 'মৈতৈ' ভাষায় 'তানজাও'

বলা হইয়া থাকে। শুদ্ধ ভাষায় 'তানচাও' বলে। বড় বড় তালগুলির অধিকাংশ হিন্দুস্থানী তালক্রিয়া পদ্ধতি হইতে আসিয়াছে বলিয়া তালগুলির মাত্রার সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। তালের সেই নির্দিষ্ট আবর্তনের ভিতরই নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বোলগুলি সম্পন্ন করিতে হইবে।

চৌতাল — মাত্রা ১২, ছন্দ ৪, তালি ৪, ফাঁক ২, জাতি চতরশ্র

+ ০ ১ ০ ৩ ৪
ধা—তেন্ তেন | তাং—তেন্ তাং | খিত্র গধিন্— তাখিতা |

ঝম্পা — মাত্রা ১০, ছন্দ ২।৩, তালি ৩, ফাঁক ১, জাতি খণ্ড

+ ২ ০ ৩
খিতা তেন্ | খিন—তেন্ | খিন্ তেন্ | খিন—তেন্ |

রূপক — মাত্রা ৭, ছন্দ ৩।৪, তালি ৩, জাতি মিশ্র।

+ ২ ৩
ধৎ খেন্ তা | ধৎ খিন্ ঘিন্ তা

+ ২ ৩
তাৎ তেন্ তা | তাতা তাতা খিতা তাতা |

'তানচপ্', 'মেনকুপ্' প্রভৃতি তালগুলি মৈতৈগণের প্রাচীন দেশীয় তাল।

তানচপ্ — মাত্রা ৮, ছন্দ ৪।৪ তালি ২

+ ২
খিন্ তা খেন্তা তা | খিন্ খিন্ তেন্ তা

+
তা — —তা | —তা থেন্ ঘিত্রাগ্রা

মেনকুপ্ — মাত্রা ৬, ছন্দ ৩।৩, তালি ২

+ ২
খিন্ ঘিনা খিন্ | খিন তেন্ তা |

+ ২
তা—তা | তা থেন তা |

আমরা প্রাচীন তাল পদ্ধতির যে আলোচনা করিলাম, তাহার সহিত উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতির বিশেষ সামঞ্জস্য নাই। তবে ইহা স্বীকার্য যে, উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সরল। উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে 'লয়কারী' করিবার সুযোগ আছে। এই লয়কারী অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন। কতকগুলি উত্তর ভারতীয় তালের ঠেকার পরিচয় দেওয়া হইল নিম্নে—

ত্রিতাল ১ম পদ্ধতি, মাত্রা ১৬, ছন্দ ৪।৪, তালি ৩, ফাঁক ১

+ ২
ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধি্ ধিন্ ধা
০ ৩
না তিন্ তিন্ তা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

ত্রিতাল ২ য় পদ্ধতি, মাত্রা ১৬, ছন্দ ৪!৪, তালি ৩, ফাঁক ১,

+ ৩
ধা ধিন্ ধিন্ ধা | ধা ধিন্ ধিন্ ধা |
০ ১
না তিন্ তিন্ তা | তেটে ধিন্ ধিন্ ধা |

চৌতাল (বিলম্বিত) মাত্রা ১২, তালি ৪, ফাঁক ২

+ ০ ২ ০ ৩
ধা ধা | দিন তা | কৎ তাগে | দিন্ তা | তেটে
৪
কতা | গদি ঘেনে

আড়া চৌতাল—মাত্রা ১৪, তালি ৪ ফাঁক ৩

+ ২ ০ ৩ ০
ধা গে | ধা গে | দিন্ তা | কৎ তাগে | দিন্ তা |
৪ ০
তেটে কতা | গদি ঘেনে।

ধমার (১ম পদ্ধতি) মাত্রা ১৪, তালী ৩, ফাঁক ১

\+ ০ ২ ০ ৩

কৎ ধে টে | ধে টে | ধা— | গ দি নে | দি নে তা—।

ধমার—(২য় পদ্ধতি) তালী ৩, ফাঁক ১

\+ ২ ০ ৩

ক ধে টে ধে টে | ধা — | গ দি নে | দি নে তা — |

ধমার (৩য় পদ্ধতি) তালী ৩

\+ ২ ৩

ক ধে টে ধে টে | ধা — গ দি নে | দি নে তা— |

ঝাঁপতাল—মাত্রা ১০, তালী ৩, ফাঁক ১

\+ ২ ০ ৩

ধি না | ধি ধি না | তি না | ধি ধি না |

সুরফাঁকতাল—মাত্রা ১০, তালী ৩,

\+ ২ ৩

ধা ঘেনে নাগ্ ধি | ঘেনে নাগ্ | গদ দি ঘেনে নাগ্ |

তেওরা—মাত্রা ৭, তালী ৩

\+ ২ ৩

ধা ঘেনে নাগ্ | গদ্ দি | ঘেনে নাগ্ |

পঞ্চম সওয়ারী—মাত্রা ৩০, তালী ৫, ফাঁক ৩

\+ ০ ২

ধা গে ধা গে | দিন্ তা ক তা | তেটে ধা তেটে ধা |

০

দিন্ তা ক তা |

৩ ০ ৪

ধা দেৎ ধাগে তেটে | গদি ঘেনে তা— | দিন্ তা কে |

৫

দিন্ তা কে |

একতাল—মাত্রা ১২, তালী, ৩, ফাঁক ১,

+ ২ ০
ধিন্ ধিন্ ধা | ধাগে তুন্ না | কৎ তে ধাগে

তেরেকেটে থিন্ না

পঞ্চম সওয়ারী—মাত্রা ১৫, তালী ৫

ধা ধিন্ ধাগে নাগে | তিক্রে তিন্না তিন্না তিন্না |
৩ ০ ৪ ৫
কৎতা ধিধি নাধি ধিনা | ধাক্রে ধিন্না ধাতিৎ |

মানুষের চেতনাতে ছন্দের উৎপত্তি হয় গতিশীল প্রাকৃতিক ক্রিয়া হইতে। নদীর সুমধুর কলতান, সমুদ্রের প্রবল গর্জন, ঝর্ণার ঝির্ ঝির্ শব্দ, বেণুবনে মলয়ের কলতান মানুষের মনে এক বিচিত্র ছন্দবোধের সৃষ্টি করে। ধ্বনির বিচিত্র ছন্দ বিভিন্ন লয়ে, বিভিন্ন গতি ও তালে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। কিন্তু এই সকল ছন্দের কোন ভাষা নাই, সুর নাই, অর্থ নাই। মানুষ এই ভাষাহীন ছন্দে ভাষা দিল, বৈচিত্র্যহীন গতিতে বৈচিত্র্য আনিল। ইহাকে অনুসরণ করিয়া বিচিত্র সুরে, ভাষায়, গতিতে ছন্দের সৃষ্টি হইল। এই ছন্দই নৃত্যে, গীতে, বাদ্যে প্রযুক্ত হইয়া সৌন্দর্য সৃষ্টি করিল, এই সৌন্দর্য সৃষ্টিই ছন্দের একমাত্র কার্য। নৃত্যে ছন্দ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। চরণের বিভিন্ন প্রকার আঘাতে বিভিন্ন ছন্দের উৎপত্তি হয়।

একটি নির্দিষ্ট তালকে ভগ্নাংশে বিভক্ত করিয়া এই ছন্দের সৃষ্টি হয়। উত্তর ভারতীয় কথক নৃত্যে ইহাকে 'লয়কারী' বলা হয়। গতি পরিবর্তন, তালাঘাত পরিবর্তন, মাত্রার বিরাম এবং শব্দের স্থায়িত্ব দ্বারা ছন্দে বৈচিত্র্য আনয়ন করা হয়। একটি গতি হইতে আর একটি গতি পরিবর্তন করার নাম 'লয়' পরিবর্তন। ইহাকে

বাংলা ভাষায় 'গুণ' বলা হয়; যেমন—সমগুণের দুইগুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ ইত্যাদি। অর্থাৎ চারিমাত্রার ২গুণ অথবা ৩গুণ করার অর্থ ৪কে ২ অথবা ৩ দিয়া গুণ করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর (৪ গুণনের সময় পর্যন্ত) এই গণনা শেষ করিতে হইবে।

পৌণ লয়—৪ মাত্রার ভিতর তিন গুণিতে হইবে।

বরাবর লয়—৪ মাত্রার ভিতর চার গুণিতে হইবে।

সওয়া লয়—৪ মাত্রার ভিতর পাঁচ গুণিতে হইবে।

দেড়ী লয়—৪ মাত্রার ভিতর ছয় গুণিতে হইবে।

পৌণে দুই লয়—৪ মাত্রার ভিতর সাত গুণিতে হইবে। ইহাকে 'ঝুলনা' লয়ও বলা হয়।

দুই লয়—৪ মাত্রার ভিতর আট গুণিতে হইবে। সওয়া দুই লয়—৪ মাত্রার ভিতর নয় গুণিতে হইবে। ইহাকে 'কুয়ার' লয়ও বলা হয়।

আড়াই লয়—৪ মাত্রার ভিতর ১০ গুণিতে হইবে।

তিন লয়—৪ মাত্রার ভিতর ১২ গুণিতে হইবে।

সাড়ে তিন লয়—৪ মাত্রার ভিতর ১৪ গুণিতে হইবে।

চার লয়—৪ মাত্রার ভিতর ১৬ গুণিতে হইবে।

এইরূপে ৫, ৬, ৭ গুণ করিয়া ক্রমান্বয়ে বাড়িতে বাড়িতে ৮ গুণ হইলে ৪ মাত্রার ভিতর ৩২ গুণিতে হইবে।

উত্তর ভারতে লোক সঙ্গীতের ভিতর 'ভখার' লয় বলিয়া একটি লয় প্রচলিত আছে। ইহাতে ৪ মাত্রার ভিতর ৩½ গুণিতে হইবে এবং ৮ মাত্রার ভিতর ৬½ গুণিতে হইবে।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারগণের উক্তি দিয়া 'তাল' অধ্যায় শেষ করিব—

"তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং চ গচ্ছতি" অর্থাৎ তালজ্ঞ হইলে মানুষ অনায়াসে মোক্ষপ্রাপ্তির অধিকারী হয়।



বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী
এ্যানা পাভলোভা

ইউরোপের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী
ইসাডোরা ডানকান



যুগোশ্লাভিয়ার সামরিক নৃত্য



অঙ্গহার



"আঙ্গিকস্তু ভবেচ্ছাখা হ্যঙ্কুরঃ সূচনা ভবেৎ।
অঙ্গহারবিনিষ্পন্নং নৃত্তং তু করণাশ্রয়ম্॥"

অঙ্গহার

আঙ্গিক অভিনয়কে অঙ্গহার বলা হইয়াছে। সুসঙ্গত বিভিন্ন অঙ্গহার প্রয়োগের অপূর্ব কলা কৌশল নৃত্যে মাধুর্য দান করে। ভরত অঙ্গহার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি ইহাদের কার্য ও প্রয়োগ সম্বন্ধেও বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে আঙ্গিক তিন প্রকারের হইতে পারে—'শারীর' 'মুখজ' ও 'চেষ্টাকৃত'। 'শারীর' বলিতে সর্বদেহের সঞ্চালন, 'মুখজ' বলিতে মুখাভিনয় এবং 'চেষ্টাকৃত' বলিতে অঙ্গ, উপাঙ্গ প্রভৃতির সঞ্চালন। অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের সংযোগে ষড়্ অঙ্গ হইতেছে—শির, হস্ত, কটী, বক্ষ, পার্শ্ব ও পাদদ্বয়। উপাঙ্গ হইতেছে—নেত্র, ভ্রূ, অক্ষিপুট, তারা, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, হনু, অধর, দন্তপংক্তি, জিহ্বা, চিবুক ও মুখ। এই বারোটি শিরঃস্থিত উপাঙ্গ। মতান্তরে পার্ষ্ণি, গুল্‌ফ, অঙ্গুলী, হস্ত ও পদের তলদেশ। নাট্যশাস্ত্রে প্রত্যঙ্গের কোন বিশ্লেষণ নাই। অভিনয় দর্পণে 'প্রত্যঙ্গ' বলিতে স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়কে বলা হইয়াছে। অভিনয় দর্পণে আঙ্গিক অভিনয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, আঙ্গিক অভিনয় অঙ্গ সমূহের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ভরতের মতে আঙ্গিক অভিনয়ের তিনটি ভাগ। এই তিনটি ভাগ হইতেছে—শাখা, অঙ্কুর ও নৃত্ত। শুধুমাত্র অঙ্গের দ্বারা যাহা প্রদর্শিত হয় তাহা 'শাখা'। যাহা ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সূচনা করে তাহা 'অঙ্কুর'। করণাশ্রয়ী অঙ্গহারকে 'নৃত্ত' বলে।

নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, করণ ও অঙ্গহারের আশ্রয়ে নৃত্ত নিষ্পন্ন হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক শুভঙ্কর 'সঙ্গীত দামোদরে' অঙ্গহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—অঙ্গবিক্ষেপের জন্য অঙ্গচেষ্টাই 'অঙ্গহার'। ভরত বলিয়াছেন, অঙ্গসমূহের নানাপ্রকার ক্রিয়ার মিলনকে 'অঙ্গহার' বলে। হরকর্তৃক অঙ্গ-ক্রিয়ার বিবিধ প্রয়োগই হইতেছে 'অঙ্গহার'।

ভরতের মতে ১০৮টি করণ আছে। 'করণ' বলিতে হস্ত ও পাদপ্রচার সহ বিবিধ ভঙ্গী। বিবিধ ভঙ্গীতে অবস্থানের পূর্বে পাদ-ক্রমণ করিতে হইবে। দ্বিপাদক্রমণকে 'করণ' বলা হইয়াছে। অভিনব গুপ্ত করণের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহা 'ক্রিয়া'। কিন্তু কিসের 'ক্রিয়া'? নৃত্যের 'ক্রিয়া'। ভরত বলিয়াছেন—"হস্তপাদ-সমায়োগো নৃত্যস্য করণং ভবেৎ।" এইরূপ দুইটি নৃত্ত করণের সমাবেশকে 'নৃত্তমাতৃকা' বলা হয়, "নৃত্তস্যাঙ্গহারাত্মনো মাতৃকা উৎপত্তি-কারণম্।" স্থানক, চারী এবং নৃত্তহস্তকে এক কথায় 'মাতৃকা' অর্থাৎ 'করণমাতৃকা' বলা হয়। ইহাদের যোগেই করণের সৃষ্টি। তিনটি করণে কলাপের সৃষ্টি হয়। চারটি করণে 'ষণ্ডক', পাঁচটিতে 'সঙ্ঘাত' এবং ছয়টি, সাতটি, আটটি অথবা নয়টি করণে অঙ্গহারের সৃষ্টি হয়। দুইটি, তিনটি অথবা চারটি 'নৃত্তমাতৃকা'ও অঙ্গহারের সৃষ্টি করে। অঙ্গহারের বত্রিশটি ভেদ আছে—স্থিরহস্ত, পর্যস্তক, সূচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, আক্ষিপ্ত, উদ্ঘটিত, বিষ্কম্ভ, অপরাজিত, বিষ্কম্ভাপসৃত, মত্তাক্রীড়, স্বস্তিকরেচিত, পার্শ্বস্বস্তিক, বৃশ্চিকাপসৃত, ভ্রমর, মত্তস্খলিতক, মদবিলসিত, গতিমণ্ডল, পরিচ্ছিন্ন, পরিবৃত্তচিত, বৈশাখরেচিত, পরাবৃত্ত, অলাতক, পার্শ্বচ্ছেদ, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত, উরূদ্বৃত্ত, আলীঢ়, রেচিত, আচ্ছুরিত, আক্ষিপ্তরেচিত. সম্ভ্রান্ত, অপসর্পি, অর্ধনিকুট্টক।

করণ নৃত্যের মুখ্য অংশ। করণে বামহস্ত বক্ষস্থিত হইবে, দক্ষিণ হস্ত চরণের অনুগামী হইবে। করণের দ্বারা অঙ্গহারের নিষ্পত্তি হয়—"সর্বেষামঙ্গহারাণাং নিষ্পত্তিঃ করণৈর্যতঃ।" নাট্যশাস্ত্রে ১০৮টি করণের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ১০৮টি করণ হইতেছে—তলপুষ্পপুট, বর্তিতম, বলিতোরুক, অপবিদ্ধ, সমনখ, লীন, স্বস্তিক-রেচিত, মণ্ডলস্বস্তিক, নিকুট্টক, অর্ধনিকুট্টক, কটীছিন্ন, অর্ধরেচিতক, বক্ষঃস্বস্তিক, উন্মত্তক, স্বস্তিক, পৃষ্ঠস্বস্তিক, দিক্‌স্বস্তিক, অলাতক, কটীসন, আক্ষিপ্তরেচিত, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক, অর্ধস্বস্তিক, অঞ্চিত, ভুজঙ্গ-ত্রাসিত, ঊর্ধ্বজানু, নিকুঞ্চিত, মত্তল্লি, অর্ধমত্তল্লি, রেচিতনিকুট্টিত,

পাদাপবিদ্ধক, বলিত, ঘূর্ণিত, লোলিত, দণ্ডপক্ষ, ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত, নূপুর, বৈশাখরেচিত, ভ্রমরক, চতুর, ভুজঙ্গাঞ্চিতক, দণ্ডকরেচিত, বৃশ্চিককুট্টিত, কটিভ্রান্ত, লতাবৃশ্চিক, ছিন্ন, বৃশ্চিকরেচিত, বৃশ্চিক, ব্যংসিত, পার্শ্বনিকুট্টক, ললাটতিলক, ক্রান্তক, কুঞ্চিত, চক্রমণ্ডল, উরোমণ্ডল, আক্ষিপ্তক, তলবিলাসিত, অর্গল, বিক্ষিপ্ত, আবর্ত, ডোলাপাদ, বিবৃত্ত, বিনিবৃত্ত, পার্শ্বক্রান্ত, নিস্তম্ভিত, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত, অতিক্রান্ত, বিবর্তিতক, গজক্রীড়িতক, তলসংস্ফোটিত, গরুড়প্লুতক, গণ্ডসূচী, পরিবৃত্ত, পার্শ্বজানু, গৃধাবলীনক, সন্নত, সূচী, অর্ধসূচি, সূচীবিদ্ধ, অপক্রান্ত, ময়ূরললিত, সর্পিত, দণ্ডপাদ, হরিণপ্লুত, প্রেঙ্খোলিতক, নিতম্ব, স্খলিত, করিহস্ত, প্রসর্পিতক, সিংহবিক্রীড়িতক, সিংহাকর্ষিত, উদ্‌বৃত্ত, উপসৃতক, তলসঙ্ঘট্টিত, জনিত, অবহিত্থক, নিবেশ, এলকা-ক্রীড়িত, উরূদ্‌বৃত্ত, মদস্খলিতক, বিষ্ণুক্রান্ত, সম্ভ্রান্ত, বিষ্কম্ভ, উদ্‌ঘট্টিত, বৃষভক্রীড়িত, লোলিত, নাগাপসর্পিত, শকটাস্য, গঙ্গাবতরণ।



অঙ্গহার প্রয়োগে ভাণ্ডবাদ্যের বিধান আছে। শুদ্ধ ভাণ্ডবাদ্যের বিধান চারিপ্রকার—সম, রিক্ত, বিভক্ত ও স্ফুট। গীতবাদ্যের সহিত নর্তকীদের নিষ্ক্রামণ বিধেয়। তাণ্ডবে নৃত্তের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া

বাদকগণ বাদ্য বাজাইবেন। এইরূপে বাদ্যের সহিত আসারিত অভিনয় প্রয়োগে পিণ্ডীবন্ধ করিয়া অঙ্গহার প্রয়োগ করিতে হইবে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রেচক, পিণ্ডীবন্ধ, অঙ্গহার প্রভৃতি শব্দগুলির উল্লেখ আছে, কিন্তু ইহার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ নাই। যাহা আছে, তাহাতে রেচক, পিণ্ডীবন্ধ ও অঙ্গহারের ভিতর একটি সূক্ষ্মভেদ বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়। রেচক বলিতে পাদ, কটি, হস্ত ও গ্রীবা, এই চতুরঙ্গের বিভিন্নভাবে চালনা বুঝায়। দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট হইবার পর সন্ধ্যাকালে চারিপ্রকার আতোদ্যবাদ্যের দ্বারা শঙ্কর কর্তৃক এই রেচক ও অঙ্গহার প্রদর্শিত হইয়াছিল। চঞ্চল অথবা স্খলিতপদে একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে গমন প্রভৃতি 'পাদরেচকের' ক্রিয়া। ত্রিকের উদ্বর্তন, কটিদেশের বলন প্রভৃতি 'কটিরেচকের' ক্রিয়া। উদ্বর্তন, বিক্ষেপ, পরিবর্তন প্রভৃতি 'হস্তরেচকের' ক্রিয়া। গ্রীবার সন্নমন, ভ্রমণ, প্রভৃতি 'গ্রীবা-রেচকের' ক্রিয়া।

পিণ্ডীবন্ধ—অঙ্গহারাদির সঙ্ঘাতে উৎপন্ন আকৃতিবিশেষ। অর্থাৎ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তদাকৃতির দ্যোতক নিশ্চল ভঙ্গী বিশেষ। নানালয়তাল সমন্বিত অঙ্গহারে পিণ্ডীবন্ধ দেখিয়া নন্দীপ্রমুখ শিবের গণ তাহার নামকরণ করিতে লাগিলেন, যথা—মহেশ্বরের ঈশ্বরী পিণ্ডী, চণ্ডিকার সিংহবাহিনী পিণ্ডী, বিষ্ণুর তার্ক্ষ্য (গরুড়) পিণ্ডী, ব্রহ্মার পদ্ম পিণ্ডী ইত্যাদি। ইহা মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—'স্বজাতীয়' ও 'বিজাতীয়'। 'স্বজাতীয়' বলিতে মনুষ্যজাতীয় জীবের কোন বিশেষ রূপের প্রকাশভঙ্গী এবং 'বিজাতীয়' বলিতে মনুষ্যেতর জীবের কোনও বিশেষরূপের প্রকাশভঙ্গীকে বুঝায়। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে যে সকল ভঙ্গী উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাদের পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—পিণ্ডী, শৃঙ্খলিকা, লতাবন্ধ ও ভেদ্যক। পিণ্ডী হইতেছে পিণ্ডাকৃতি, শৃঙ্খলিকা হইতেছে গুল্মাকৃতি এবং লতাবন্ধ হইতেছে জালাকৃতি। ভেদ্যকে নৃত্তের যোগ থাকিবে। অঙ্গহারের আলোচনা পূর্বেই করিয়াছি।

নানাভাবরসাশ্রিত হইলে তাহাকে 'মুখজ' অভিনয় বলা হইয়া থাকে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, 'মুখজ' অভিনয়ের প্রথম কর্ম হইতেছে 'শিরোভেদ।' নাট্যশাস্ত্রে ত্রয়োদশ প্রকারের শিরোভেদের উল্লেখ আছে এবং অভিনয় দর্পণে নয় প্রকার শিরোভেদের উল্লেখ আছে। সঙ্গীত দামোদরে চতুর্দশ শিরোভেদের উল্লেখ আছে। ত্রয়োদশ শিরোভেদ হইতেছে—আকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, আধুত, অবধুত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও লোলিত। সঙ্গীত দামোদরে 'প্রকৃত' নামে আর একটি শিরঃকর্মের যোগ হইয়াছে। নিহঞ্চিতের পরিবর্তে 'নিকুঞ্চিতে'র উল্লেখ আছে। অভিনয় দর্পণে যে নয়প্রকার শিরোভেদের উল্লেখ আছে, তাহা হইতেছে—সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ আলোলিত, ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত।

আকম্পিত—মস্তক উর্ধ্বে ও নীচে ধীরে ধীরে কম্পিত হইলে তাহাকে 'আকম্পিত' শির বলে। স্বাভাবিক বাক্যালাপে, গোপন করিতে, নির্দেশদানে, আবাহনে, অনুসন্ধানে, প্রশ্নে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কম্পিত—উহাই দ্রুতভাবে বহুবার করিলে 'কম্পিত' শির হয়। রোষে, বিতর্কে, বিজ্ঞানে, প্রতিজ্ঞায়, তর্জনে, প্রশ্নে ইহা ব্যবহৃত হয়। ধুত—ধীরে মস্তক [1]রেচনের নাম ধুত শির। অনিচ্ছায় ও বিষাদে, বিস্ময়ে, প্রত্যয়ে, পার্শ্বে অবলোকনে, শূন্যে অবস্থানে ও নিষেধে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বিধুত—দ্রুতভাবে মস্তক রেচনের নাম 'বিধুত'। শীতে, ভয়ে, ত্রাসে, জ্বরে, মদ্যপানে ও পানমাত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়।

পরিবাহিত—পর্যায়ক্রমে উভয়পার্শ্বে মস্তক-চালনাকে 'পরিবাহিত' বলা হয়। সাধন, বিস্ময়, হর্ষ, স্মরণ, [2]অমর্ষ, বিচার, গোপন, লীলা প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। অন্যমতে মণ্ডলাকারে শির ঘুরাইলে পরিবাহিত হয়।

---

(১) ঝাড়া দেওয়া ; (২) ঈর্ষা।

আধুত—একবার তির্যগ্‌ভাবে উর্ধ্বে মস্তক উত্তোলনের নাম আধুত।

অবধুত—একবার অধোমুখে আক্ষিপ্ত হইলে 'অবধুত' মস্তক হয়। [৩]সন্দেশে, আলাপে, আবাহনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

অঞ্চিত—কিঞ্চিৎ পার্শ্বে নতগ্রীব শির 'অঞ্চিত' বলিয়া খ্যাত। ব্যাধিতে, মূর্চ্ছাতে, মত্ত অবস্থাতে, চিন্তা ও [৪]হনুধারণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

নিহঞ্চিত—স্কন্ধদেশ উৎক্ষিপ্ত এবং ঈষৎ কুঞ্চিত হইলে তাহা 'নিহঞ্চিত' হয়। ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রযোজ্য। গর্বে, আত্মাভিমানে, বিলাসে, মোট্টায়িতে, কুট্টমিতে, বিব্বোকে, কিলকিঞ্চিতে, স্তম্ভে ও মানে ইহা ব্যবহৃত হয়।

পরাবৃত্ত—পশ্চাৎ ফিরিবার অনুকরণের নাম 'পরাবৃত্ত'। মুখ ফিরাইয়া লওয়া ও পশ্চাদ্‌ভাগ দর্শনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

উৎক্ষিপ্ত—উন্মুখে অবস্থিত শিরকে 'উৎক্ষিপ্ত' শির বলা হয়। দৈববাণী প্রভৃতিতে এবং আকাশস্থিত বস্তু ও উচ্চবস্তু দর্শনে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অধোগত—অধোদিকে নমিত শিরের নাম 'অধোগত'। লজ্জায়, প্রণামে ও দুঃখে ইহার প্রয়োগ হয়।

লোলিত—চারিদিকে ভ্রমিত শিরকে 'লোলিত' বলা হয়। মূর্চ্ছা ব্যাধি, মদাবেশগ্রহ, নিদ্রা প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

অভিনয় দর্পণের মতানুসারে—

সম—অনুন্নত ও উন্নত ভাববর্জিত এবং নিশ্চল শিরকে 'সম' বলা হয়। নৃত্যারম্ভে, জপের প্রারম্ভে, গর্ব ও প্রণয়কোপে, স্তম্ভনে, ও নিষ্ক্রিয়ভাব প্রদর্শনে ইহা প্রযুক্ত হয়।

উদ্বাহিত—মুখ উর্ধ্বে উন্নত হইলে 'উদ্বাহিত' হয়। চন্দ্র, ধ্বজ, আকাশ, পর্বত, আকাশগামী বস্তু ও উচ্চ বস্তু দর্শনে 'উদ্বাহিত' শির প্রযোজ্য।

(৩) তথ্য ; (৪) চিবুক।

অধোমুখ—অধোদিকে নমিত বদন অধোমুখ বলিয়া খ্যাত। লজ্জা, খেদ, প্রণাম, দুশ্চিন্তা, মূর্ছা, অধঃস্থিত পদার্থের নির্দেশ ও জলমজ্জনে ইহার প্রয়োগ হয়।

আলোলিত—মণ্ডলাকারে চারিদিকে ভ্রমিত হইলে 'আলোলিত' শির হয়। নিদ্রার উদ্বেগ, গ্রহাবেশ, মদ, মূর্ছা, ভ্রমণ, ও বিকট অট্টহাস্যে ইহা প্রযোজ্য।

ধুত—বাম ও দক্ষিণ ভাগে শির চালিত হইলে 'ধুত' হয়। পুনঃ পুনঃ পার্শ্বদেশ দর্শনে, অনাশ্বাসে, বিস্ময়ে, বিষাদে, অনিচ্ছায়, শীতার্তে, জ্বরগ্রস্তে, ভীত ও মদ্যপানের অবস্থায়, যুদ্ধে, যত্নে, নিষেধাদিতে, অসহভাব প্রকাশে, স্বঅঙ্গে দৃষ্টি-পাতনে, পার্শ্বদেশ হইতে আহ্বানে ইহার প্রয়োগ হয়।

কম্পিত—ঊর্ধ্বে ও অধোভাগে চালিত হইলে 'কম্পিত' হয়। ক্রোধে, 'থাম' এইরূপ উক্তিতে, প্রশ্নে, গণনায়, নিকট হইতে আহ্বানে, আবাহনে ও তর্জনে কম্পিত শির প্রযুক্ত হয়।

পরাবৃত্ত—মস্তককে পশ্চাতে ফিরাইলে 'পরাবৃত্ত' হয়। কোপে, লজ্জাদিতে মুখাপসারণে, অনাদরে, তূণীর হইতে শর গ্রহণাদি কার্যে ও কেশবন্ধনাদি কর্মে ইহার প্রয়োগ হয়।

উৎক্ষিপ্ত—পার্শ্বে ও ঊর্ধ্বভাগে চালিত শিরকে 'উৎক্ষিপ্ত' বলে।

পরিবাহিত—উভয় পার্শ্বে চামরের ন্যায় আন্দোলিত হইলে 'পরিবাহিত' হয়। মোহ, বিরহ, স্তুতি, সন্তোষ, অনুমোদন, বিচার প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

নাট্যশাস্ত্রে ৩৬ প্রকার দৃষ্টিভেদ এবং অভিনয় দর্পণে ৮ প্রকার দৃষ্টিভেদের উল্লেখ আছে। নাট্যশাস্ত্রানুসারে ৩৬ প্রকার দৃষ্টিভেদের ভিতর ৮ প্রকার স্থায়ি-দৃষ্টি, ৮ প্রকার রসদৃষ্টি এবং ২০ প্রকার সঞ্চারি দৃষ্টি। ইহা ব্যতীত ৮ প্রকার দর্শনের উল্লেখ আছে।

স্থায়ী দৃষ্টি—স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনা, ক্রুদ্ধা, দৃপ্তা, ভয়ান্বিতা, জুগুপ্সিতা ও বিস্মিতা।

রসদৃষ্টি—কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা, করুণা, অদ্ভুতা, রৌদ্রী, বীরা ও বীভৎসা।

সঞ্চারিদৃষ্টি—শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা, লজ্জান্বিতা, গ্লানা, শঙ্কিতা, বিষণ্না, মুকুলা, কুঞ্চিতা, অভিতপ্তা, জিহ্মা, ললিতা, বিতর্কিতা, অর্ধমুকুলা, বিভ্রান্তা, বিপ্লুতা, আকেকরা, বিকোশা, মদিরা ও ত্রস্তা।

স্থায়ীদৃষ্টি :—

স্নিগ্ধা—সানন্দ ভ্রূলতা, চক্ষুতারকা স্থির ও মধুর এবং দৃষ্টির মধ্যভাগ বিকশিত হইলে তাহাকে 'স্নিগ্ধা' বলে। রতিভাব হইতে ইহার জন্ম।

হৃষ্টা—দৃষ্টি কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, চঞ্চল, হাস্যময়ী ও চক্ষুতারকা পল্লবে অর্ধাবৃত হইলে তাহাকে হৃষ্টা বলা হয়। হাস্যরসে ইহা প্রযুক্ত হয়।

দীনা—ঊর্ধ্ব পল্লব আনত, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইবার ফলে তারা রুদ্ধ এবং দৃষ্টি মন্থর হইলে তাহাকে দীনা বলা হয়। শোকে ইহা প্রযুক্ত হয়।

ক্রুদ্ধা—দৃষ্টি যদি রুক্ষ, স্থির, ভ্রূকুটি-কুটিল ও ক্রোধান্বিত হয় এবং চক্ষুপল্লব বিস্ফারিত এবং তারকা নিশ্চল ও ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়, তবে তাহাকে 'ক্রুদ্ধা' বলে। ইহা ক্রোধে প্রযুক্ত হয়।

দৃপ্তা—যদি চক্ষুতারকা স্থির, স্তব্ধ ও বিকশিত হয় এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক দৃষ্টির দ্বারা স্বভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'দৃপ্তা' বলা হয়। ইহা উৎসাহ ভাবাশ্রিত।

ভয়ান্বিতা—যদি নেত্রপল্লব দুইটি বিস্ফারিত হয় ও তারকা ভয়ে কম্পিত হয় এবং দৃষ্টির মধ্যভাগ স্ফীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'ভয়ান্বিতা' বলে। ইহা ভীতিভাবাশ্রিত।

জুগুপ্সিতা—পল্লব সঙ্কুচিত, তারকা অর্ধস্ফুট এবং দৃষ্টি লক্ষ্য বস্তুর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ও বিকৃত হইলে তাহাকে জুগুপ্সিতা বলা হয়।

বিস্মিতা—তারকা বিশেষভাবে উর্ধ্বে উত্থিত, পল্লবযুগল অত্যন্ত বিস্ফারিত, দৃষ্টি বিকশিত ও সম অবস্থায় থাকিলে তাহাকে 'বিস্মিতা' বলে। ইহা বিস্ময়ভাবাশ্রিত।

রসদৃষ্টি :—

কান্তা—হর্ষপ্রসাদজনিত শৃঙ্গার রসাত্মক ভ্রূক্ষেপ ও কটাক্ষযুক্ত দৃষ্টিকে কান্তা বলে।

ভয়ানকা—চক্ষুপল্লব উর্ধ্বে উত্থিত ও নিশ্চল, স্ফুরিত তারকা চঞ্চল এবং দৃষ্টি অত্যন্ত ভীতা হইলে 'ভয়ানকা' দৃষ্টি হয়। ইহা ভয়ানক রসাশ্রিত।

হাস্যা—ক্রমশঃ চক্ষুপল্লব কুঞ্চিত এবং বিভ্রান্ত চক্ষুতারকা ঈষৎ দৃষ্ট হইলে 'হাস্যা' হয়। মোহজাল বিস্তারে ইহা ব্যবহৃত হয়।

করুণা—উর্ধ্বপল্লব নত, চক্ষুতারকা দুঃখে মন্থর, অরুণাভ দৃষ্টি নাসাগ্রে নিবদ্ধ থাকিলে তাহাকে 'করুণা' দৃষ্টি বলে। ইহা করুণ রসাশ্রিত।

অদ্ভুতা :—চক্ষুপল্লবের অগ্রভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত, চক্ষুতারকা আশ্চর্যজনকভাবে স্ফুরিত এবং চক্ষুর প্রান্তভাগ বিকশিত ও দৃষ্টি সৌম্য হইলে তাহাকে 'অদ্ভুতা' বলে। ইহা অদ্ভুত রসাশ্রিত।

বীরা—দৃষ্টি যদি দীপ্ত, বিকসিত, ক্ষোভযুক্ত ও গম্ভীর হয় এবং চক্ষুতারকা সমভাবে থাকিয়া মধ্যভাগ উৎফুল্ল হয়, তাহাকে 'বীরা' দৃষ্টি বলে। ইহা বীররসাশ্রিত।

রৌদ্রী—দৃষ্টি যদি ক্রুর, রুক্ষ, অরুণ ও ভ্রূকুটি-কুটিল হয় এবং চক্ষুপল্লব ও তারকা যদি নিশ্চল হয়, তাহা হইলে 'রৌদ্রী' হয়। ইহা রৌদ্ররসাশ্রিত।

বীভৎসা—তারকা ঘূর্ণায়মান এবং স্থির ও কুঞ্চিত পল্লবে অপাঙ্গে বিক্ষেপ হইলে তাহাকে 'বীভৎসা' দৃষ্টি বলা হয়। ইহা বীভৎস রসাশ্রিত।

সঞ্চারি দৃষ্টি—

শূন্যা—সমতারা, সমপুট, নিষ্কম্প ও শূন্যদর্শনা, বাহ্যার্থ গ্রহণে অসমর্থ ও বিকৃত দৃষ্টি হইলে 'শূন্যা' দৃষ্টি হয়। চিন্তায় ইহা ব্যবহৃত হয়।

মলিনা—চক্ষুপল্লব চঞ্চল, কিঞ্চিৎ বিকশিত এবং তারকা বিভ্রান্ত ও নয়নপ্রান্ত মলিন হইলে 'মলিনা' হয়। [১] নির্বেদ ও বিবর্ণতা বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

শ্রান্তা—শ্রমক্লান্তিতে নেত্রপুট ম্লান, ক্ষীণলোচন, শ্রান্তিতে চক্ষু-তারকা পতিত ও অবসন্ন হইলে 'শ্রান্তা' হয়। শ্রমে ও ঘর্মাক্ত অবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হয়।

লজ্জান্বিতা—লজ্জাহেতু নেত্রপল্লবের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ আনত ঊর্ধ্বপুট পতিত এবং নেত্রতারকা অধোগতা হইলে 'লজ্জান্বিতা' দৃষ্টি হয়। লজ্জা প্রভৃতিতে এই দৃষ্টি ব্যবহৃত হয়।

গ্লানা—ভ্রূ, পুট ও পক্ষ্ম, যদি ম্লান, শিথিল এবং ধীর মন্থর গতিবিশিষ্ট হয় ও চক্ষুতারকা ভিতরে ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হয়, তবে 'গ্লানা' দৃষ্টি হয়। অপস্মার ব্যাধি ও গ্লানিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

শঙ্কিতা—চক্ষুতারকা কিঞ্চিৎ স্থির, কিঞ্চিৎ চঞ্চল, কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বমুখী ,তির্যগ্‌গতি, আয়ত, মোহগ্রস্ত ও চকিত হইলে 'শঙ্কিতা' দৃষ্টি হয়। উহা শঙ্কাতে ব্যবহৃত হয়।

বিষণ্ণা—নেত্রপুট বিষাদে বিস্তীর্ণ, তারকা কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ, দৃষ্টি নিমেষযুক্ত ও উদ্ভ্রান্ত হইলে 'বিষণ্ণা' দৃষ্টি হয়। বিষাদে এই দৃষ্টি ব্যবহৃত হয়।

মুকুলা—ইহাতে পক্ষ্মের অর্ধভাগ স্ফুরিত, ঊর্ধ্বপুট আশ্লিষ্ট, দৃষ্টি প্রফুল্ল ও সুখে তারা উন্মীলিত হইবে। এইরূপ দৃষ্টিকে 'মুকুলা' বলা হয়। নিদ্রা স্বপ্ন ও সুখাবিষ্টভাবে ইহা প্রযোজ্য।

---

(১) দুঃখ।

কুঞ্চিতা—পক্ষ্মের অগ্রভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত, পুটদ্বয় ও তারকাদ্বয় কুঞ্চিত এবং দৃষ্টি যদি অবসাদগ্রস্ত হয় তাহা হইলে 'কুঞ্চিতা' দৃষ্টি হয়। অসূয়ায়, অবাঞ্ছিত বস্তু দর্শনে ও অনিষ্টে ইহা ব্যবহৃত হয়।

অভিতপ্তা—চক্ষুতারকা ও পুটদ্বয় মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইলে, দুঃখে অভিভূত ও ব্যথাযুক্ত হইলে তাহাকে 'অভিতপ্তা' দৃষ্টি বলা হয়। নির্বেদে, আকস্মিক আঘাতে ও তাপে ইহা ব্যবহৃত হয়।

জিহ্মা—দৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী এবং পুট কুঞ্চিত হইলে, ধীরে ধীরে তির্যগ্‌ভাবে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলে এবং তারাটিও গুপ্ত হইলে 'জিহ্মা' দৃষ্টি হইবে। অসূয়া, জড়তা ও আলস্য প্রভৃতিতে ইহা প্রযোজ্য।

লোলিতা—মধুর, কুঞ্চিত, ভ্রূবিলাসযুক্ত, সর্পিত ও কামাতুরা দৃষ্টি 'লোলিতা' বলিয়া কথিত হয়। লজ্জিত অবস্থায় এবং ধৈর্য ও হর্ষে ইহা প্রযোজ্য।

বিতর্কিতা—চক্ষুপল্লব ঊর্ধ্বে উত্থিত, তারকা উৎফুল্ল এবং মুখের নিম্নভাগ বিকৃত হইলে 'বিতর্কিতা' হয়। তর্কে বিতর্কিতা প্রযোজ্য।

অর্ধমুকুলা—চক্ষুপল্লব অর্ধ বিকশিত, পুট আহ্লাদে অর্ধ মুকুলিত এবং ঈষৎ চঞ্চল তারকাযুক্ত দৃষ্টিকে অর্ধমুকুলা বলা হয়। ইহা গন্ধ. স্পর্শ, সুখ ও আহ্লাদে প্রযোজ্য।

বিভ্রান্তা—চক্ষুতারকা চঞ্চল, দৃষ্টি বিভ্রান্ত ও আকুল এবং নেত্র সম্পূর্ণ বিস্তীর্ণ ও উৎফুল্ল হইলে তাহাকে 'বিভ্রান্তা' বলে। আবেগে, সম্ভ্রমে ও বিভ্রমে ইহা প্রযোজ্য।

বিপ্লুতা—নেত্রপুটদ্বয় প্রস্ফুরিত ও নিশ্চল হইয়া পুনরায় পতিত হইলে, চক্ষুতারকা আকুল হইয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত থাকিলে সেই দৃষ্টিকে 'বিপ্লুতা' বলা হইয়া থাকে। চাপল্য, উন্মাদনা, আর্তি, দুঃখ, মরণ প্রভৃতিতে ইহা প্রযোজ্য।

আকেকরা—নেত্রপুট ও অপাঙ্গ আকুঞ্চিত হইলে এবং দৃষ্টি অর্ধনিমেষিণী হইলে তাহাকে 'আকেকরা' বলে। ব্যথাভরা বিচ্ছেদ-দর্শনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বিকোশা—নেত্রপুটদ্বয় বিশেষভাবে বিস্ফারিত, দৃষ্টি নিমেষহীন ও উৎফুল্ল হইলে এবং তারকা অনবস্থিত হইলে 'বিকোশা' হয়। বিষাদ, গর্ব, অমর্ষ প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ত্রস্তা—ত্রাসে পুটযুগল ঊর্ধ্বে উত্থিত, তারকাদ্বয় উৎকম্পিত, দৃষ্টির মধ্যভাগ উৎফুল্ল ও ত্রাসযুক্ত হইলে 'ত্রস্তা' হয়। ত্রাস বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মদিরা—দৃষ্টির মধ্যভাগ ঈষৎ ঘূর্ণ্যমান, অন্তভাগ ক্ষীণ এবং অপাঙ্গ বিকশিত হইলে 'মদিরা দৃষ্টি হয়। জাগরণে, গর্বে, অসহিষ্ণুতায়, উগ্রমতিতে ইহা প্রযোজ্য। মত্ততার প্রথম অবস্থা বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। মত্ততার মধ্যাবস্থায় নেত্রপুটযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত, তারকাযুগল ঈষৎ চঞ্চল ও দৃষ্টি অস্থির হয়। মত্ততার শেষ অবস্থায় দৃষ্টি কখনও নিমেষযুক্ত কখনও নিমেষহীন হইবে, চক্ষুতারকা কিঞ্চিৎ দৃষ্ট হইবে এবং দৃষ্টি সকল সময় নিম্নগামা হইবে। মত্তাবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হয়।

দর্শন—ভরত দৃষ্টি ও দর্শনের মধ্যে একটি পার্থক্য করিয়াছেন। দৃষ্টি হইতেছে রসভাবযুক্ত এবং দর্শন হইতেছে তারাকর্ম অর্থাৎ অক্ষিতারকার ক্রিয়া।

সম—এই দর্শনে অক্ষিতারকা ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত হইলে এবং সৌম্যভাবযুক্ত হইলে 'সম' হয়।

সাচি—এই দর্শনে চক্ষুতারকা পুটের অন্তর্গত থাকে এবং তির্যক্ হয়।

অনুবৃত্ত—এইরূপ দর্শনে রূপ নিরীক্ষণ করা হয়।

আলোকিত—যে দর্শন সহসা দেখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা আলোকিত।

বিলোকিত—যে দর্শনে পশ্চাদ্‌ভাগ দৃষ্ট হয় তাহা বিলোকিত।

প্রলোকিত—যে দর্শনে উভয়পার্শ্ব দৃষ্ট হয় তাহা প্রলোকিত।

উল্লোকিত—যে দর্শনে ঊর্ধ্বভাগ দৃষ্ট হয় তাহা উল্লোকিত।

অবলোকিত—যে দর্শনে অধোদেশ দৃষ্ট হয় তাহা অবলোকিত।

অভিনয় দর্পণে আট প্রকার দৃষ্টিভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—সম, আলোকিত, সাচি, প্রলোকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, অনুবৃত্ত ও অবলোকিত।

নাট্যশাস্ত্রে নয়প্রকার তারাক্রিয়া আছে,—ভ্রমণ, বলন, পাতন, চলন, প্রবেশন, বিবর্তন, সমুদ্বৃত্ত, নিস্ক্রামণ ও প্রাকৃত।

তারাযুগল পুটের মধ্যে মণ্ডলাকারে ঘুরিলে তাহা ভ্রমণ হয়। ত্র্যস্রভাবে ঘুরিলে বলন এবং নীচের দিকে শিথিলভাবে থাকিলে পাতন হয়। তারার কম্পন হইলে 'চলন' এবং ভিতরদিকে প্রবেশ করিলে 'প্রবেশন' হয়। কটাক্ষপাত হইলে বিবর্তন, তারাদ্বয় সমুন্নত থাকিলে 'সমুদ্বৃত্ত' এবং নির্গত হইলে 'নিস্ক্রাম', স্বাভাবিক থাকিলে 'প্রাকৃত' হয়। বীর ও রৌদ্ররসে ভ্রমণ, বলন, সমুদ্বৃত্ত ও নিস্ক্রাম ব্যবহৃত হয়। হাস্য ও বীভৎস রসে 'প্রবেশনে'র প্রয়োগ হয়। করুণ রসে 'পাতন' ও অদ্ভুত রসে 'নিস্ক্রামণ' ব্যবহৃত হয়। শৃঙ্গারে 'বিবর্তন' ও অবশিষ্ট রসে 'প্রাকৃত' প্রযোজ্য।

নাট্যশাস্ত্রে নয় প্রকার পুটকর্মের উল্লেখ আছে। উন্মেষ, নিমেষ, প্রসৃত, কুঞ্চিত, সম, বিবর্তিত, স্ফুরিত, পিহিত ও বিতাড়িত।

পুটদ্বয় বিশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকিলে তাহা 'উন্মেষ' হয়। পুটদ্বয় সংযুক্ত অবস্থায় থাকিলে 'নিমেষ', বিস্তৃত থাকিলে 'প্রসৃত', আকুঞ্চিত থাকিলে 'কুঞ্চিত' এবং স্বাভাবিক থাকিলে 'সম,' উন্নত অবস্থায় থাকিলে বিবর্তিত, স্পন্দিত হইলে 'স্ফুরিত,' আচ্ছাদিত হইলে 'পিহিত' এবং আহত হইলে 'বিতাড়িত' হয়।

ক্রোধে 'নিমেষ' এবং 'উন্মেষের' সহিত 'বিবর্তিত' ও ব্যবহৃত হয়। বিস্ময়, হর্ষ এবং বীরত্ব প্রকাশে 'প্রসৃত' প্রযুক্ত হয়। অনিষ্ট-দর্শনে, গন্ধ, রস ও স্পর্শে 'কুঞ্চিত' এবং শৃঙ্গারে 'সমের' প্রয়োগ হয়। ঈর্ষা প্রকাশে স্ফুরিত, সুপ্তি, মূর্ছা, বায়ু, উষ্ণতা ধূম, বর্ষা, অঞ্জন, লেপন, আর্তি ও নেত্র রোগে 'পিহিত' এবং অভিঘাতে 'বিতাড়িত' প্রযুক্ত হয়।

নাট্যশাস্ত্রানুসারে সাতপ্রকার ভ্রূকর্মের উল্লেখ আছে—উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রূকুটি, চতুর, কুঞ্চিত, রেচিত ও সহজ। ভ্রূদ্বয়ের একসাথে অথবা একটির পর একটির উন্নত অবস্থাকে 'উৎক্ষেপ' বলা হয়। কোপে, বিতর্কে, হেলায়, লীলায়, স্বাভাবিক দর্শনে ও শ্রবণে একটি ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত হয়। বিস্ময়ে, হর্ষে ও রোষে দুইটি ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত হয়। দুইটি ভ্রূর ক্রমে ক্রমে অধোমুখে পতন হইলে 'পাতন' হয়। অসূয়া, জুগুপ্সা, হাস্য ও ঘ্রাণে 'পাতন' ব্যবহৃত হয়। ভ্রূদ্বয়ের মূল (ললাট ও নাসিকার সংযোগস্থল) উৎক্ষিপ্ত হইলে 'ভ্রূকুটি' বলিয়া পরিকীর্তিত হয়। ক্রোধ অথবা দীপ্তভাব বুঝাইতে 'ভ্রূকুটি' ব্যবহৃত হয়। কোন প্রকার উচ্ছ্বাসহেতু ভ্রূদ্বয়ের মধুর ও আয়তবিক্ষেপকে 'চতুর' বলা হয়। ইহা স্ত্রীপুরুষের আলাপে ও নানাপ্রকার মধুর ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। একটি অথবা উভয় ভ্রূর মৃদু কুঞ্চন হইলে, তাহাকে 'কুঞ্চিত' বলা হয়। মোট্টায়িত ভাব, কুট্টমিত ভাব, অথবা কিলকিঞ্চিত ভাব প্রকাশে 'কুঞ্চিত' ব্যবহার হয়। কিন্তু নৃত্তে 'রেচিত' ব্যবহার করা কর্তব্য। একটি ভ্রূ ললিতভাবে উৎক্ষিপ্ত হইলে 'রেচিত' হয়। স্বাভাবিক ভ্রূকর্মকে 'সহজ' বলা হয় এবং স্বাভাবিকভাবে ইহার প্রকাশ।

নাট্যশাস্ত্রানুসারে ছয় প্রকার নাসাকর্মের উল্লেখ আছে; যথা—নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছ্বাসা, বিকূণিতা ও স্বাভাবিকা।

নাসাপুটদ্বয় মুহুর্মুহুঃ সংশ্লিষ্ট হইলে 'নতা' বলিয়া অভিহিত হয়। মত্ততাজনিত কম্পনে, নারীদিগের অনুরোধ প্রকাশে ও নিঃশ্বাসে ইহা ব্যবহৃত হয়। নাসাপুট স্থির অবস্থায় থাকিলে 'মন্দা' বলা হয়। নির্বেদ, ঔৎসুক্য, চিন্তা ও শোকে 'মন্দা' ব্যবহৃত হয়। নাসাপুট স্ফুরিত হইলে 'বিকৃষ্টা' বলিয়া কীর্তিত হয়। তীব্র গন্ধে, রৌদ্র ও বীর রসে ইহা ব্যবহৃত হয়। শ্বাসগ্রহণকালীন অবস্থাকে 'সোচ্ছ্বাসা' বলে। ইষ্ট ঘ্রাণে, উচ্ছ্বাসে ইহা ব্যবহৃত হয়। নাসাপুট সঙ্কুচিত করিলে 'বিকূণিতা' হয়। জুগুপ্সা ও অসূয়াতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

নাসাপুটদ্বয়ের স্বাভাবিক অবস্থাকে 'স্বাভাবিকা' অথবা 'সমা' বলা হয়। অবশিষ্ট ভাবসমূহে অভিজ্ঞ নটগণ ইহা ব্যবহার করেন।

গণ্ডকর্ম—নাট্যশাস্ত্রে ছয়প্রকার গণ্ডকর্মের উল্লেখ আছে—ক্ষাম, ফুল্ল, ঘূর্ণ, কম্পিত, কুঞ্চিত ও সম। গণ্ডের অবনত অবস্থাকে 'ক্ষাম' বলে। ইহা দুঃখে প্রযুক্ত হয়। বিকশিত অবস্থাকে 'ফুল্ল' বলে। ইহা হর্ষে ব্যবহৃত হয়। বিস্তৃত অবস্থাকে 'ঘূর্ণ' বলা হয়। উৎসাহ ও গর্বে ইহা ব্যবহৃত হয়। স্ফুরিত অবস্থাকে 'কম্পিত' বলা হয়। রোষ ও হর্ষে ইহা প্রযুক্ত হয়। সঙ্কুচিত অবস্থাকে 'কুঞ্চিত' বলা হয়। স্পর্শে, শীতে, ভয়ে ও জ্বরে রোমাঞ্চের সহিত ইহা ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে 'সম' বলা হয়। অবশিষ্ট ভাবসমূহে ইহা ব্যবহৃত হয়।

অধরক্রিয়া—নাট্যশাস্ত্রে ছয়প্রকার অধরকর্মের উল্লেখ আছে—বিবর্তন, কম্পন, বিসর্গ, বিনিগূহন, সংদষ্টক ও সমুদ্গ। অধরের সঙ্কুচিত ভাবকে 'বিবর্তন' বলে। অসূয়া, বেদনা, অবজ্ঞা, হাস্য প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। অধরের কম্পিতভাবকে 'কম্পন' বলে। ভয়, রোষ ও গতি প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। অধরকে সম্মুখদিকে বাড়াইয়া দিলে 'বিসর্গ' হয়। স্ত্রীগণের বিলাসে, বিব্বোকে এবং অধরের অনুরঞ্জনে ইহা ব্যবহৃত হয়। অধর ভিতরের দিকে প্রবেশ করাইলে 'বিনিগূহন' হয়। অভিনন্দন ও অনুকম্পাতে ইহা ব্যবহৃত হয়। দন্ত দ্বারা অধর দংশন করাকে 'সংদষ্টক' বলে। যে সকল কার্যে ক্রোধের উদ্রেক হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার হয়। অধর স্বাভাবিকভাবে উন্নত থাকিলে 'সমুদ্গ' হয়।

নাট্যশাস্ত্রের মতে সাতপ্রকার চিবুককর্মের কথা উক্ত হইয়াছে, যথা—কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, চুক্কিত, লেহিত, সম ও সংদষ্ট। দন্তের সংঘর্ষ হইলে 'কুট্টন' হয়। ওষ্ঠদ্বয় মুহুর্মুহুঃ পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে 'খণ্ডন' হয়। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকিলে 'ছিন্ন' হয়। ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত বিচ্যুত হইলে 'চুক্কিত' হয়। জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে

'লেহিত' এবং ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ যুক্ত থাকিলে 'সম' ও দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিলে 'সংদষ্ট' হয়। ভয়, শীত, জ্বর ও ক্রোধে 'কুট্টন' ব্যবহৃত হয়। জপ, অধ্যয়ন, আলাপ ও ভক্ষণে 'খণ্ডন' ব্যবহৃত হয়। ব্যাধি, ভয়, শীত, ব্যায়াম, রোদন ও মৃত্যুতে 'ছিন্ন' ব্যবহৃত হয়। জৃম্ভণে, চুক্কিতে, লৌল্যে, লেহনে এবং স্বাভাবিক ভাবে 'সম প্রযুক্ত হয়। ক্রোধে 'সংদষ্ট' ব্যবহৃত হয়।

নাট্যশাস্ত্রে ছয়প্রকার আস্যকর্মের কথা বলা হইয়াছে, যথা—বিনিবৃত্ত, বিধুত, নির্ভুগ্ন, ভুগ্ন, বিবৃত ও উদ্বাহি। মুখ ব্যাবৃত হইলে 'বিনিবৃত্ত' হয়। অসূয়া, ঈর্ষা, কোপ এবং স্ত্রীদিগের অবজ্ঞা ও বিহার প্রভৃতি বিষয়ে ইহা প্রযুক্ত হয়। তির্যক্ ও আয়ত মুখকে 'বিধুত' বলা হয়। বারণ ও অস্বীকৃতি বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। অবাঙ্মুখ হইলে 'নির্ভুগ্ন' হয়। গাম্ভীর্যপূর্ণ দর্শনাদিতে ইহা প্রযুক্ত হয়। কিঞ্চিৎ আয়ত অবস্থায় থাকিলে 'ভুগ্ন' হয়। বিধবাদিগের স্বাভাবিক লজ্জায়, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, চিন্তা এবং বিনয় বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ওষ্ঠ বিশ্লিষ্ট হইলে 'বিবৃত' হয়। বিবৃত মুখ সাধারণতঃ হাস্য, শোক, ভয় ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। আস্যের উদ্বাহি কর্ম রমণীদিগের লীলা, গর্ব ও অনাদর প্রকাশ করে। বিচক্ষণ নটগণ পূর্বোক্ত নাম ও কার্যের অনুসরণে সম, সাচী প্রভৃতি দর্শনের প্রয়োগ করিবেন।

প্রয়োজন অনুসারে মুখরাগের পরিবর্তনের উল্লেখ আছে। চারিপ্রকার মুখরাগের বর্ণনা আছে। যথা—স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত ও শ্যাম। স্বাভাবিক অভিনয়ে 'স্বাভাবিক' মুখরাগ কর্তব্য। 'প্রসন্ন' মুখরাগ অদ্ভুত, হাস্য ও শৃঙ্গারে ব্যবহৃত হয়। বীর, রৌদ্র ও করুণে 'রক্ত' মুখরাগ প্রযোজ্য এবং ভয়ানক ও বীভৎসে 'শ্যাম' মুখরাগ ব্যবহৃত হয়। এইরূপে ভাবজনিত রসসমূহে মুখরাগের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অভিনয়ে মুখরাগের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সামান্যতম শারীর অভিনয়ও মুখরাগ ভিন্ন পূর্ণাঙ্গ হয় না।

নাট্যশাস্ত্রমতে নয়প্রকার এবং অভিনয় দর্পণের মতে চারিপ্রকার গ্রীবাভেদের উল্লেখ আছে। নাট্যশাস্ত্রমতে সমা, নতা, উন্নতা, ত্র্যস্রা, রেচিতা, কুঞ্চিতা, অঞ্চিতা, বলিতা ও বিবৃত্তা এই নয়প্রকার গ্রীবা কর্ম আছে। 'সমা' স্বাভাবিক অবস্থানে থাকে। ধ্যান, জপ প্রভৃতি বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। 'নতা'তে গ্রীবা নত অবস্থায় থাকে। কণ্ঠলগ্ন অলঙ্কার বন্ধনে ইহা ব্যবহৃত হয়। উর্ধ্বমুখী গ্রাবাকে 'উন্নতা' বলা হয়। উর্ধ্বে অবস্থিত বস্তুদর্শনে 'উন্নতা' গ্রীবা ব্যবহৃত হয়। স্কন্ধভার ও দুঃখ বুঝাইতে ইহার প্রয়োগ হয়। গ্রীবা পার্শ্বগত হইলে 'ত্র্যস্রা' হয়। গ্রীবা কম্পিত ও আন্দোলিত হইলে 'রেচিতা' হয়। ইহা মথনে ও নৃত্তে ব্যবহৃত হয়। গ্রীবা ঈষৎ অবনত হইলে 'কুঞ্চিতা' হয়। মস্তকে ভারবহন, গলরক্ষণ প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োগ হয়। উর্ধ্বে ঈষৎ অপসৃত হইলে 'অঞ্চিতা' হয়। উদ্বদ্ধ কেশকর্ষণে ও উর্ধ্ব-দর্শনে ইহা প্রযুক্ত হয়। গ্রীবা পার্শ্বাভিমুখী হইলে 'বলিতা' হয়। গ্রীবাভঙ্গে ও পার্শ্ববীক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। গ্রীবা অভিমুখী হইলে 'বিবৃত্তা' হয়। স্বস্থানে ও অভিমুখে ইহা প্রযুক্ত হয়।

অভিনয় দর্পণে চারিপ্রকার গ্রীবাভেদের নাম হইতেছে—সুন্দরী, তিরশ্চীনা, পরিবর্তিতা ও প্রকম্পিতা। ভাবার্থ প্রকাশে গ্রীবার ভেদ অনেক প্রকার হইতে পারে। সকল গ্রীবাকর্মই শিরঃকর্মের অনুগামী।

নাট্যশাস্ত্রানুসারে বক্ষঃস্থলের কর্ম পাঁচ প্রকার—আভুগ্ন. নির্ভুগ্ন, প্রকম্পিত, উদ্বাহিত ও সম।

আভুগ্ন—বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত করিয়া পৃষ্ঠভাগের মধ্যদেশ উন্নত রাখিলে এবং স্কন্ধদেশ দুইটি মধ্যে মধ্যে শিথিল করিলে 'আভুগ্ন' হয়। সম্ভ্রম, বিষাদ, মূর্ছা, শোক, ভয়, ব্যাধি, বাণবিদ্ধ হৃদয়, শীতস্পর্শ, সলজ্জভাব প্রভৃতির প্রকাশে ইহা ব্যবহৃত হয়।

নির্ভুগ্ন—পৃষ্ঠদেশ স্তব্ধ ও নিম্ন, স্কন্ধদেশ বক্র ও উন্নত থাকিলে 'নির্ভুগ্ন' হয়। স্তম্ভে, মানগ্রহণে, বিস্ময়ে, সত্যবচনে, 'আমি' এইরূপ গর্বিত বচনে ইহার প্রয়োগ হয়। মতান্তরে দীর্ঘনিঃশ্বাসে, জৃম্ভণে (হাই

তোলা), মোটনে (পেষণে), স্ত্রীলোকদিগের বিব্বোকভাব প্রকাশে ইহা ব্যবহৃত হয়।

প্রকম্পিত—বক্ষঃস্থল নিরন্তর স্ফীত হইলে তাহাকে 'প্রকম্পিত' বলা হয়। হাস্যে, রোদনে, শ্রমে, ভয়ে, শ্বাসকাসে, হিক্কায় ও দুঃখে ইহার প্রয়োগ হয়।

উদ্বাহিত—বক্ষঃস্থল উন্নত করিলে 'উদ্বাহিত' বলা হয়। দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে, উন্নতবস্তু দর্শনে, জৃম্ভণাদিতে ইহার প্রয়োগ হয়।

সম—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক বিন্যাসহেতু বক্ষঃস্থলের যে সুন্দর ও স্বাভাবিক অবস্থা হয়, তাহাকে 'সম' বলে।

পার্শ্বদ্বয়ের কর্ম পাঁচ প্রকার—নত, উন্নত, প্রসারিত, বিবর্তিত ও অপসৃত।

নত—কটিদেশ বিশেষভাবে এবং পার্শ্বদেশ ঈষৎ বক্র হইলে ও স্কন্ধদেশ কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলে, তাহাকে 'নত' বলে।

উন্নত—নত-পার্শ্বের বিপরীত পার্শ্বকে 'উন্নত' বলা হয়। ইহাতে কটিদেশ, পার্শ্বদেশ, বাহু ও স্কন্ধদেশ সমস্তই উন্নত রাখিতে হয়।

প্রসারিত—পার্শ্বদেশ উভয়দিকে প্রসারিত করিলে, তাহাকে 'প্রসারিত' বলা হয়।

বিবর্তিত—তিনটির (কটিদেশ, পার্শ্বদেশ ও স্কন্ধদেশ) নানাপ্রকার পরিবর্তন করিলে তাহাকে 'বিবর্তিত' বলে।

অপসৃত—পার্শ্বদেশ বারম্বার বাহিরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ভিতরের দিকে টানিয়া লওয়াকে 'অপসৃত' বলা হয়। সম্মুখগমনে 'নত', পশ্চাৎ অপসরণে 'উন্নত', হর্ষাদি প্রকাশে 'প্রসারিত', পরিবর্তনে 'বিবর্তিত' এবং নিবৃত্তিতে 'অপসৃত' পার্শ্ব ব্যবহৃত হয়।

ভরত তিন প্রকার জঠর কর্মের উল্লেখ করিয়াছেন—ক্ষাম, খল্ব ও পূর্ণ। মতান্তরে 'সম' যোগ করিয়া চারিপ্রকার বলিয়াছেন।

ক্ষাম—শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা উদরটিকে ক্ষীণ করিলে 'ক্ষাম', নত করিলে 'খল্ব' এবং বায়ুর দ্বারা উদর পূর্ণ করিলে 'পূর্ণ' বলা হয়।

হাস্যে, রোদনে, জৃম্ভণে ও নিঃশ্বাসে ক্ষামের প্রয়োগ হয়। ব্যাধিগ্রস্তে, তপস্যায়, শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় 'খল্ব' ব্যবহৃত হয়। উচ্ছ্বাসে, স্থূলে, প্লীহাদি ব্যাধিগ্রস্তে ও অতি ভোজনে 'পূর্ণ' ব্যবহৃত হয়।

নাট্যশাস্ত্রে পাঁচপ্রকার কটিকর্মের উল্লেখ আছে—ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, কম্পিতা ও উদ্বাহিতা।

ছিন্না—কটির মধ্যদেশ চক্রাকারে ঘুরাইলে 'ছিন্না' হয়।

নিবৃত্তা—কটিদেশকে পরাঙ্মুখী করিলে 'নিবৃত্তা' হয়।

রেচিতা—কটিদেশকে বৃত্তাকারে চতুর্দিকে ভ্রমণ করাইলে 'রেচিতা' হয়।

কম্পিতা—কটিদেশকে তির্যগ্‌ভাবে সত্বর চালনা করিলে 'কম্পিতা' হয়।

উদ্বাহিতা—নিতম্বের পার্শ্বদেশ পর্যায়ক্রমে উন্নতাবনত হইলে উদ্বাহিতা হয়।

ব্যায়ামে, সম্ভ্রমে ও পশ্চাৎ অবলোকনে 'ছিন্না' ব্যবহৃত হয়। পরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থানে 'নিবৃত্তা' ব্যবহৃত হয়। কটিদেশের ভ্রমণাদিতে 'রেচিতা' ব্যবহৃত হয়। কুব্জ, বামন ও নীচদিগের গমনে 'কম্পিতা' ব্যবহৃত হয়। স্থূলকায় স্ত্রীলোকের গমনে এবং বিশেষ ভঙ্গীসহকারে চলনে 'উদ্বাহিতা' ব্যবহৃত হয়।

পাঁচপ্রকার উরুকর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে—কম্পন, বলন, স্তম্ভন, উদ্বর্তন ও নিবর্তন।

কম্পন—বারম্বার গোড়ালিকে উপরে ও নিম্নে চালনা করিলে 'কম্পন' হয়।

বলন—জানু দুইটি ভিতরদিকে চালনা করিলে 'বলন' হয়।

স্তম্ভন—উরু দুইটি স্তব্ধভাবে থাকিলে 'স্তম্ভন' হয়।

উদ্বর্তন—উরুর মাংসপেশীকে ঊর্ধ্বদিকে মৃদু মৃদু চালনা করিলে 'উদ্বর্তন' হয়।

নিবর্তন—গোড়ালী ভিতর দিকে চালনা করিলে 'নিবর্তন' হয়। অধমপাত্রদিগের গমনে ও ভয়ে 'কম্পন', স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক গমনে 'বলন', ভয়ে ও বিষাদে 'স্তম্ভন', ব্যায়াম ও তাণ্ডবে 'উদ্বর্তন' এবং ব্যস্তভাবে পরিক্রমাদিতে 'বিবর্তম' ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত লোকব্যবহারের অনুসরণে প্রয়োজনমত উরুকর্ম করা যাইতে পারে।

জঙ্ঘাকর্ম পাঁচপ্রকার হইয়া থাকে—আবর্তিত, নত, ক্ষিপ্ত, উদ্বাহিত ও পরিবৃত্ত। পদদ্বয় যথাক্রমে দক্ষিণ হইতে বাম এবং বাম হইতে দক্ষিণে স্বস্তিকভাবে স্থাপন করিলে 'আবর্তিত', জানুদ্বয় আনত করিলে 'নত' এবং জঙ্ঘা বহির্ভাগে বিক্ষেপ করিলে 'ক্ষিপ্ত' হয়। জঙ্ঘা উর্ধ্বভাগে উত্তোলন করিলে 'উদ্বাহিত' হয়। বিপরীতভাবে জঙ্ঘার স্থাপনে 'পরিবৃত্ত' হয়। বিদূষকের পরিক্রমায় 'আবর্তিত', স্থানাসন ও গমনাদিতে 'নত', ব্যায়াম ও তাণ্ডবে 'ক্ষিপ্ত', জঙ্ঘাদ্বয় উর্ধ্বদিকে উত্তোলন করিতে করিতে (বকের মতন চলনে) অগ্রসর হইলে 'উদ্বাহিত' এবং তাণ্ডবাদিতে 'পরিবৃত্ত' হয়।

পাদকর্ম পাঁচপ্রকার—উদঘট্টিত, সম, অগ্রতলসঞ্চর, অঞ্চিত ও কুঞ্চিত।

উদঘট্টিত—পদতলের অগ্রভাগের সাহায্যে দণ্ডায়মান হইয়া যদি গোড়ালি ভূমিতে স্থাপন করা যায়, তবে তাহাকে 'উদ্‌ঘট্টিত' বলা হয়। এই 'উদ্‌ঘট্টিত' পদ দ্রুত অথবা মধ্যলয়ে 'উদ্বেষ্টিত'-করণে একবার অথবা বার বার প্রয়োগ করিতে হয়।

সম—পদদ্বয় স্বাভাবিক অবস্থায় সমভাবে সমতল ভূমিতে স্থাপন করিলে 'সম' পদ হয়। ভরত সমপদের প্রসঙ্গে তদঙ্গীভূত আর একটি পদকর্মের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার নাম 'ত্র্যস্রপদ'। সমপদের পার্ষ্ণিদ্বয় অভ্যন্তরে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর বিপরীতমুখে পার্শ্বদেশে স্থাপন করিলে 'ত্র্যস্র' পদ হয়। ভয়ভীতাদি অবস্থার প্রকাশে ইহা ব্যবহৃত হয়।

অগ্রতলসঞ্চর—অঙ্গুলিগুলি সম্মুখভাগে প্রসারিত এবং পার্ষ্ণিদ্বয় (গোড়ালিদ্বয়) উৎক্ষিপ্ত করিয়া সমস্ত অঙ্গুলিগুলি চালিত করিলে 'অগ্রতলসঞ্চর' হয়। পীড়নে, একস্থানে অবস্থান করিয়া ঝুঁকিবার ক্রিয়ায়, ভূমিতে আঘাত-করণে, ভ্রমণ প্রভৃতি কার্যে ইহা ব্যবহৃত হয়।

অঞ্চিত—পার্ষ্ণি এবং পদের অগ্রভাগ ভূমিতে স্থাপন করিয়া অঙ্গুলিসকল প্রসারিত করিলে অঞ্চিত হয়। সম্মুখভাগে অগ্রসরে, বর্তিতোদ্বর্তনে, পদতাড়নায় এবং নানাপ্রকার ভ্রমরীতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কুঞ্চিত—পার্ষ্ণি উৎক্ষিপ্ত, অঙ্গুলিসকল কুঞ্চিত এবং পদের মধ্যভাগও কুঞ্চিত হইলে তাহাকে 'কুঞ্চিত' পদ বলে। উদাত্ত গমনে, বর্তিতোদ্বর্তনে এবং অতিক্রমণে ইহা ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে ভরত আর একটি পদকর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার নাম 'সূচী' পদ। বামপদ স্বাভাবিক রাখিয়া দক্ষিণপদের পার্ষ্ণি উৎক্ষিপ্ত করিয়া দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সাহায্যে অবস্থান করিলে 'সূচী' পদ হয়। নৃত্তে এবং 'নূপুর' করণে ইহার প্রয়োগ হয়।

চারী—অভিনয় দর্পণে বলা হইয়াছে যে, গতিপ্রধান হইতেছে 'চারী' এবং স্থিতি-প্রধান হইতেছে 'স্থান'। গতির পর স্থিতি এবং স্থিতির পর গতি। নাট্যশাস্ত্রে 'চারী' সম্বন্ধে ভরত বলিয়াছেন—

এবং পাদস্য জঙ্ঘায়া উরোঃ কট্যাস্তথৈব চ।
সমান-করণে চেষ্টা চারীতি পরিকীর্তিতা॥

পাদ, জঙ্ঘা, উরু এবং কটির সমানভাবে সঞ্চালনকে 'চারী' বলা হয়। শৃঙ্খলাযুক্ত ও বিধিবদ্ধ চারীসমূহের পরস্পর সম্পাদনকে 'ব্যায়াম' বলে। ব্যায়ামের চারিটি ভেদ আছে—চারী, করণ, খণ্ড ও মণ্ডল। পদের প্রচার 'চারী' নামে অভিহিত হয়। দ্বিপাদ-ক্রমণকে 'করণ' বলা হয়। তিনটি করণের সমাযোগ হইলে 'খণ্ড' হয়। তিনটি অথবা চারটি খণ্ডের সমাযোগে একটি 'মণ্ডল' হয়। নৃত্তে, গতিতে, অস্ত্রনিক্ষেপে ও যুদ্ধে ইহার প্রয়োগ হয়। নাট্যে চারী অতি প্রয়োজনীয়।

নাট্যে ইহা ব্যতীত কোন অঙ্গহার নিষ্পন্ন হইতে পারে না। ভৌমী ও আকাশিকীভেদে ইহা দুইপ্রকার। তন্মধ্যে ভৌমী চারী ষোলপ্রকার—সমপাদা স্থিতাবর্তা, শকটাস্যা, অধ্বর্ধিকা, চাষগতি, বিচ্যবা, এড়কা-ক্রীড়িতা, বদ্ধা, উরুদ্বৃত্তা, অড্ডিতা, উৎস্পন্দিতা, জনিতা, স্যন্দিতা, অপস্যন্দিতা, সমোৎসরিতমত্তল্লী ও মত্তল্লী। আকাশিকীও ষোলপ্রকার—অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, উর্দ্ধজানু, সূচী, নূপুরপাদিকা, ডোলপাদা, আক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদ্বৃত্তা, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তা, অলাতা, ভুজঙ্গ-ত্রাসিতা, হরিণপ্লুতা, দণ্ডপাদা ও ভ্রমরী।

সমপাদা—পদদ্বয় সমানভাবে স্থাপন করিয়া একস্থানে অবস্থান করিলে 'সমপাদা' চারী হয়। সমপাদে স্থানান্তরে গমন করিলেও 'সমপাদা' চারী হয়।

স্থিতাবর্তা—এক পদের অগ্রতলের দ্বারা মণ্ডলাকারে অভ্যন্তরভাগে ভূমি ঘর্ষণ করিয়া দ্বিতীয় পার্শ্বে জানুস্বস্তিক করিতে হইবে। পুনরায় অপরপদের দ্বারা পূর্ববৎ করিলে 'স্থিতাবর্তা' হয়।

শকটাস্যা—দুই হস্তে মস্তক ধারণ করিয়া এক পদ সমান রাখিয়া অন্যপদের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত করিয়া বিপরীত পার্শ্বে রাখিয়া জানু কুঞ্চিত ও জঙ্ঘা প্রসারণ করিয়া নিজের পার্শ্বে ত্রিকোণাকৃতি সৃষ্টি করিলে 'শকটাস্যা' হয়। ইহাতে বক্ষঃস্থল সম্মুখভাগে বাধত করিতে হয়।

অধ্বর্ধিকা—দক্ষিণপদের গোড়ালির দিকে বামপদ স্থাপন করিয়া এইরূপে চলিতে হইবে, যাহাতে বাম ও দক্ষিণপদদ্বয় পর্যায়ক্রমে একে অপরের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান করে।

চাষগতি—দক্ষিণপদ সম্মুখভাগে একতালমাত্র প্রসারিত করিয়া পুনরায় দুইতাল পশ্চাদ্‌ভাগে অপসারণ কালে কিঞ্চিৎ উৎপ্লুত হইয়া বামপদটিকেও দক্ষিণপদের সহিত সংশ্লিষ্টভাবে পশ্চাতে আনিতে হইবে।

বিচ্যবা—সমপাদ বিচ্যুত করিয়া পদদ্বয়ের তলদেশের অগ্রভাগ দ্বারা ধরণীতল ঘর্ষণ করিতে থাকিলে 'বিচ্যবা' হয়।

এড়কাক্রীড়িতা,—তলসঞ্চর পদদ্বয়ের দ্বারা পর্যায়ক্রমে উল্লম্ফন ও পতন হইলে 'এড়কাক্রীড়িতা' হয়।

বদ্ধা—কাহারও মতে কেবলমাত্র উরুদ্বয়কে সুবিন্যস্ত রাখিয়া জঙ্ঘাদ্বয় দ্বারা স্বস্তিক রচনা করিলেই 'বদ্ধা' হয়। কেহ কেহ বলেন, জঙ্ঘা-স্বস্তিক অপসারণপূর্বক পদতলদ্বয়ের অগ্রভাগ ক্রমান্বয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরাইয়া স্ব স্ব পার্শ্বে গমন করিলে 'বদ্ধা' হয়।

উরূদ্বৃত্তা—তলসঞ্চর পদের গোড়ালি বহির্মুখী হইলে এবং জানুটি নমিত হওয়ায় জঙ্ঘাটি বিস্ফারিত হইলে তাহাকে 'উরূদ্বৃত্তা' বলে।

অড্ডিতা—সম্মুখের অথবা পশ্চাতের যে কোন একটি পদের গোড়ালি উচ্চ করিয়া অপর পদটির দ্বারা যুক্ত করিলে 'অড্ডিতা' হয়।

উৎস্পন্দিতা—যদি পদদ্বয় রেচকানুসারে বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'উৎস্পন্দিতা' বলে। বহির্ভাগে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা এবং অভ্যন্তর ভাগে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা 'রেচক' করিতে হয়।

জনিতা—তলসঞ্চরপদে দণ্ডায়মান হইয়া একটি হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বক্ষে স্থাপন করিলে এবং অন্য হস্তটি স্বাভাবিক রাখিলে 'জনিতা' হয়।

স্যন্দিতা ও অপস্যন্দিতা—প্রথম পদকে পঞ্চতাল পরিমাণ প্রসারিত করিলে 'স্যন্দিতা' হয়। দ্বিতীয় পদের দ্বারা সেইরূপ করিলে 'অপস্যন্দিতা' হয়।

সমোৎসরিত-মত্তল্লী—তলসঞ্চর পদদ্বয়ের দ্বারা জঙ্ঘা-স্বস্তিক করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হইলে 'সমোৎসরিত-মত্তল্লী' হয়। ইহা একপ্রকার ব্যায়াম।

মত্তল্লী—সমোৎসরিত-মত্তল্লীতে উদ্বেষ্টিত ও অপবিদ্ধ হস্তের প্রয়োগ হইলেই 'মত্তল্লী' হয়।

আকাশিকী চারী—

অতিক্রান্তা—একটি পদকে কুঞ্চিত করিয়া অপর পদের গোড়ালিতে স্থাপন করিয়া সম্মুখভাগে কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিতে হইবে এবং

উহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পদের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে 'অতিক্রান্তা' চারী হয়।

অপক্রান্তা—উরুদ্বয়কে ঘুর্ণিত করিয়া কুঞ্চিত পদটিকে উঠাইয়া পার্শ্বে নিক্ষেপ করিলে 'অপক্রান্তা' হয়।

পার্শ্বক্রান্তা—একটি পদকে কুঞ্চিত অবস্থায় স্তন পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া উদ্‌ঘট্টিত পদে পার্শ্বে নিক্ষেপ করিলে 'পার্শ্বক্রান্তা' হয়।

ঊর্ধ্বজানু—একটি পদকে কুঞ্চিত করিয়া স্তন পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক দ্বিতীয় পদটিকে নিশ্চল রাখিলে ঊর্ধ্বজানু হয়।

সূচী—একই পদকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া জানু পর্যন্ত জঙ্ঘাকে প্রসারিত করিয়া পুনরায় অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিলে 'সূচী' হয়।

নূপুরপাদিকা—একটি পদ অঞ্চিত করিয়া তাহাকে পৃষ্ঠদেশে বাঁকাইয়া গোড়ালিকে নিতম্ব পর্যন্ত লইয়া 'অগ্রতল' পদের দ্বারা দ্রুত ভূমিতে স্থাপন করিলে 'নূপুরপাদিকা' হয়।

ডোলপাদা—কুঞ্চিত পদকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত দোলাইয়া 'অঞ্চিত' পদে স্থাপন করিলে 'ডোলপাদা' হয়।

আক্ষিপ্তা—কুঞ্চিত পদকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া 'অঞ্চিত' অবস্থায় স্থাপন করিবার পর জঙ্ঘাস্বস্তিক করিলে 'আক্ষিপ্তা' হয়।

আবিদ্ধা—'স্বস্তিকে' দাঁড়াইয়া সম্মুখের পদটি কুঞ্চিত অবস্থায় প্রসারিত করিয়া পুনরায় ওই পদটিকে নিজস্থানে আনিয়া অপর পদের গোড়ালির পার্শ্বে গোড়ালির দ্বারা স্থাপন করিলে 'আবিদ্ধা' হয়।

উদ্‌বৃত্তা—'আবিদ্ধা' পদকে উরু পর্যন্ত উঠাইয়া ভ্রমরী করিয়া লাফাইয়া ভূমিতে রাখিয়া দ্বিতীয় পদটিকে পুনরায় পূর্ববৎ করিলে 'উদ্‌বৃত্তা' হয়।

বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তা—উরুদেশের মূল হইতে পদটিকে পৃষ্ঠদেশে ঘুরাইয়া মস্তক স্পর্শ করাইয়া পরে ঊর্ধ্বে, পার্শ্বে ও অধোমুখে মণ্ডলাকারে ঘুরাইয়া প্রসারিত করিলে 'বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তা' হয়।

অলাতা—প্রথমে একটি পদকে প্রসারিত করিয়া পুনরায় অভ্যন্তরে আনিয়া দ্বিতীয় উরুদেশের পাশ ঘেঁসিয়া পার্শ্ব পার্ষ্ণির দ্বারা ভূমিতে রাখিলে 'অলাতা' হয়।

ভুজঙ্গত্রাসিতা—দ্বিতীয়পদের উরুমূল পর্যন্ত কুঞ্চিত পদকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কটি ও জানু বিবর্তনের (ঘূর্ণন) দ্বারা নিতম্বের সম্মুখভাগে পার্ষ্ণি স্থাপনপূর্বক ত্রিকোণাকৃতি সৃষ্টি করিয়া উরুকে চালনা করিলে 'ভুজঙ্গত্রাসিতা' হয়।

হরিণপ্লুতা—কুঞ্চিত পদকে উৎক্ষিপ্ত এবং উৎপ্লুত করিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া দ্বিতীয় জঙ্ঘাটিকে পশ্চাদ্‌ভাগে ক্ষেপণ করিলে 'হরিণপ্লুতা' হয়।

দণ্ডপাদা—'নূপুরপাদিকাকে' অপর পার্ষ্ণিগত করিয়া সম্মুখভাগে ক্ষিপ্রতার সহিত প্রসারিত করিলে 'দণ্ডপাদা' হয়।

ভ্রমরী—অতিক্রান্ত চারীতে নির্দিষ্ট কুঞ্চিতপদকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ভুজঙ্গত্রাসিতের মত ত্র্যস্রভাবে উরুকে বিবর্তিত করিয়া দ্বিতীয় পদের তলদেশের দ্বারা তিনবার ঘুরিলে 'ভ্রমরী' হয়।

চারীর সংযোগে 'মণ্ডল' হয়। নাট্যশাস্ত্রানুসারে 'মণ্ডল' বিশপ্রকার। ইহার মধ্যে দশপ্রকার 'আকাশগ' মণ্ডল ও দশপ্রকার 'ভূমি' মণ্ডল। 'আকাশগ' মণ্ডল হইতেছে—অতিক্রান্ত, বিচিত্র, ললিতসঞ্চর, সূচীবিদ্ধ, দণ্ডপাদ, বিহৃত, অলাতক, বামবিদ্ধ, সললিত ও ক্রান্ত। 'ভূমি' মণ্ডল হইতেছে—ভ্রমর, আস্কন্দিত, আবর্ত, সমোৎসরিত, এড়কাক্রীড়িত, অড্ডিত, শকটাস্য, অধ্যর্ধক, পিষ্টকুট্ট, চাষগত।

গতি—অভিনয় দর্পণে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রাণীর প্রসিদ্ধ গতির অনুকরণে কয়েকটি বিশিষ্ট গমন ভঙ্গীকে 'গতি' বলা হইয়াছে। উহাদের সংখ্যা মাত্র দশটি—হংসী, ময়ূরী, মৃগী, গজলীলা, তুরঙ্গিনী, সিংহী, ভুজঙ্গী, মণ্ডুকী, বীরা ও মানবী।

নাট্যশাস্ত্রেও বিভিন্ন গতিভঙ্গীর আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল গতিভঙ্গীর সহিত অভিনয় দর্পণের গতিভঙ্গীর বিন্দুমাত্র

সাদৃশ্য নাই। নাট্যে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণকারী পাত্রের জন্য ভরত বিভিন্নপ্রকার রসানুযায়ী বিভিন্নপ্রকার গতির সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এইরূপ সুবিস্তৃত আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে বলিয়া সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। তিনি উত্তমপাত্রের পক্ষে 'ধীরা', মধ্যমের পক্ষে 'মধ্যা' ও অধমের পক্ষে 'দ্রুতা' গতির নির্দেশ দিয়াছেন। তবে, স্থান-কাল অনুসারে এই নির্দিষ্ট গতির তারতম্য বিধানেরও স্বাধীনতা দিয়াছেন। যেমন, যুদ্ধবিগ্রহাদি বিষয়ে উত্তমেরও দ্রুত গতি হইতে পারে এবং শোকাদি বিষয়ে অধমেরও ধীরাগতি হইতে পারে। এই গতি ও তাললয়াদি পরস্পর পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। ভরত যানবাহনাদিতে আরোহণ ও অবরোহণ করিবার এবং জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে গমনাগমনের গতিভঙ্গীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বৃক্ষে ও প্রাসাদাদিতে আরোহণ ও অবরোহণের নানাপ্রকার নির্দেশ দিয়াছেন। অবস্থান্তরভেদে বৃদ্ধ, কৃশ, ব্যাধিগ্রস্ত, তপঃশ্রান্ত, ক্ষুধিত ও উন্মত্ত প্রভৃতিরও গতিভেদের কথা বলা হইয়াছে। ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি জাতির গতি দেশানুসারে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভরত স্ত্রীলোক-দিগের স্বাভাবিক গতির সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আবাহন, বিসর্জন, দান, চিন্তা, গোপন প্রভৃতি বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের গতিতে বিভিন্নপ্রকার স্থানক-ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মন্মথোদ্ভূত ও ঈর্ষোদ্ভূত কোপে, নিষেধে, গর্বে, গাম্ভীর্যে, মৌনাবলম্বনে ও মানে গতিভঙ্গীর বিশেষ নির্দেশ আছে। দাসী, বালিকা ও নপুংসকদিগের গতিভঙ্গীও আলোচিত হইয়াছে। পুরুষদিগের স্ত্রীবেশে ও স্ত্রীদিগের পুরুষবেশে কিরূপ গতি হইবে তাহারও বিবরণ আছে। স্ত্রীলোকদিগের উদ্ধত 'চারী' ও অঙ্গহার বর্জনীয়।

স্থানক—"সংনিবেশবিশেষোঽঙ্গে নিশ্চলঃ স্থানমুচ্যতে।" অর্থাৎ কোনও বিশেষ ভঙ্গীতে নিশ্চল অবস্থানের নাম 'স্থানক'। নাট্যশাস্ত্রে পুরুষদিগের ছয়টি স্থানকের উল্লেখ আছে—বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ়। অভিনয় দর্পণেও ছয়প্রকার

স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে—সমপাদ, একপাদ, নাগবন্ধ, ঐন্দ্র, গারুড় ও ব্রাহ্ম।

বৈষ্ণব—দুইপদ আড়াই তাল অন্তরে স্থাপিত হইবে এবং তাহার ভিতর একটি ত্র্যস্র ও অপরটি পক্ষস্থিত হইবে। জঙ্ঘা কিঞ্চিৎ অঞ্চিত (বক্র) হইবে এবং অঙ্গে সৌষ্ঠব থাকিবে। ইহাকে 'বৈষ্ণব' স্থান বলা হয়। ইহার অধিদেবতা হইতেছেন বিষ্ণু। স্বাভাবিক সংলাপে ইহার প্রয়োগ হয়।

সমপাদ—'সমপাদে' দুইটি পদই একতাল অন্তরে স্থাপিত হইবে ও অঙ্গে স্বাভাবিক সৌষ্ঠব থাকিবে। ব্রহ্মা ইহার অধিদেবতা। দ্বিজ কর্তৃক আশীর্বাদে, পক্ষিরূপধারণে, বরদানে, কৌতুকে, শূন্যমার্গে রথে ও বিমানে অবস্থানে ইহার প্রয়োগ হয়।

বৈশাখ—সাড়ে তিনতাল অন্তরে উরু 'নিষণ্ণ' থাকিবে। পদদ্বয় ত্র্যস্র ও পক্ষস্থিত থাকিবে। ইহাকে 'বৈশাখ' বলে। ইহার অধিদেবতা স্কন্দ। ব্যায়ামে, অশ্বের বাহনে, স্থূলপক্ষী-নিরূপণে, ধনু আকর্ষণে ইহার প্রয়োগ হয়।

মণ্ডল—রেচকে ইহা কর্তব্য। পদদ্বয় চারি তাল অন্তরে থাকিবে ও ত্র্যস্র এবং পক্ষস্থিত হইবে। কটি ও জানু সমভাবে থাকিবে। ইহাকে ভরত 'মণ্ডলস্থান' বলিয়াছেন। ধনু, বজ্র, প্রহরণ, হস্তীর বাহন ও স্থূলপক্ষী-নিরূপণে ইহা ব্যবহৃত হয়।

আলীঢ়—মণ্ডলস্থানকের দক্ষিণ পদ পঞ্চতাল প্রসারিত করিয়া এই 'স্থানক' করিতে হয়। রুদ্র ইহার অধিদেবতা। বীর ও রৌদ্ররসে ইহা ব্যবহার করা হয়। রোষে, অমর্ষে, মল্লগণের আস্ফালনে, শত্রু-নিরূপণে ও অস্ত্রমোক্ষণে ইহার প্রয়োগ হয়।

প্রত্যালীঢ়—দক্ষিণ পদ কুঞ্চিত ও বামপদ প্রসারিত করিয়া 'আলীঢ়' স্থানের পরিবর্তন করিলে 'প্রত্যালীঢ়' হয়। আলীঢ় স্থানকে শস্ত্র আকর্ষণ করিয়া প্রত্যালীঢ়ে মোক্ষণ করিতে হয়।

নাট্যশাস্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের তিনটি স্থানকের উল্লেখ করা হইয়াছে—আয়ত, অবহিত্থ ও অশ্বক্রান্ত।

আয়ত—বামপদ স্বাভাবিক সমপাদে থাকিবে। দক্ষিণপদ একতাল অন্তর 'ত্র্যস্রে' রাখিয়া পক্ষস্থিত হইবে। বদন প্রসন্ন এবং বক্ষঃস্থল সমভাবে উন্নত থাকিবে। 'লতা' হস্তদ্বয় নিতম্বে থাকিবে। রঙ্গাবতরণের প্রারম্ভে, পুষ্পাঞ্জলি-ত্যাগে, কামজনিত এবং ঈর্ষা হইতে উদ্ভূত কোপে, তর্জনী-মোটনে, নিষেধে, গর্বে, গাম্ভীর্যে, মৌনে, মান-অবলম্বনে ও দিগন্ত-পর্যবেক্ষণে ইহার প্রয়োগ হয়। মতান্তরে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণপদ সমস্থানে ও বামপদ 'ত্র্যস্রে' রাখিয়া পক্ষস্থিত করিতে হইবে এবং বাম কটি সমুন্নত হইবে। ইহাকে 'আয়ত' স্থানক বলা হয়। আবাহনে, বিসর্জনে, পর্যবেক্ষণে, চিন্তা প্রভৃতিতে এই স্থানকের ব্যবহার হয়।

অবহিত্থ—যে কোন একটি পদ সম্মুখে ত্র্যস্রভাবে চালিত করিতে হইবে। অন্য পদটি সমপাদে একতাল অন্তরে ন্যস্ত করিতে হইবে। 'ত্রিক' ঈষৎ উন্নত রাখিতে হইবে। যে কোন একটি হস্ত 'লতাখ্য' করিতে হইবে এবং অপরটি নিতম্বে স্থাপন করিতে হইবে। ইহাকে 'অবহিত্থ' বলা হয়। লীলা, বিব্বোক, শৃঙ্গার, আত্মনিরূপণ ও স্বামীর পথনিরীক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয়। মতান্তরে, বামপদ সমপাদে ন্যস্ত হইলে এবং দক্ষিণ পদ 'ত্র্যস্রে' রাখিয়া পক্ষস্থিত হইলে ও বাম কটি সমুন্নত হইলে অবহিত্থ' হয়। স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক সংলাপে, নিশ্চয়ে, পরিতোষে, বিতর্কে ও সলজ্জভাবপ্রকাশে এই স্থানকের ব্যবহার হয়।

অশ্বক্রান্ত—সূচীবিদ্ধ বা অবিদ্ধভাবে যদি একটি পদ সমপাদে ন্যস্ত হয় এবং অপরটির অগ্রতল অঞ্চিত হয়, তাহা হইলে 'অশ্বক্রান্ত' হয়। স্খলিত, ঘূর্ণিত ও গলিত বস্ত্রধারণে, কুসুমস্তবকগ্রহণে ও পরিরক্ষণে এবং সুন্দরভঙ্গীতে তরুশাখায় অবলম্বনে এই স্থানক ব্যবহৃত হয়। মতান্তরে বলা হইয়াছে যে, শাখা-অবলম্বনে, স্তবক গ্রহণে, নীচ নরদিগের প্রয়োজন মত নানাপ্রকার বিশ্রামে 'অশ্বক্রান্ত'

ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীত রত্নাকরে আরও চারিপ্রকার স্ত্রীস্থানকের উল্লেখ করা হইয়াছে—গতাগত, বলিত, মোটিত ও বিনিবর্তিত।

সঙ্গীত রত্নাকরে ত্রয়োবিংশতি প্রকার দেশী স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে। কয়েকটি দেশী স্থানকের উল্লেখ আমরা নৃত্যজগতে প্রায়ই পাই। সেইজন্য দেশী স্থানকের উল্লেখ করিতেছি। এইগুলি হইতেছে স্বস্তিক, বর্ধমান, নন্দ্যাবর্ত, সংহত, সমপাদ, একপাদ, পৃষ্ঠোত্তানতল, চতুরস্র, পার্ষ্ণিবিদ্ধ, পার্ষ্ণিপার্শ্বগত, একপার্শ্বগত, একজানুনত, পরাবৃত্ত, সমসূচী, বিষমসূচী, খণ্ডসূচী, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, গারুড় কূর্মাসন, নাগবন্ধ, বৃষভাসন। ইহা ব্যতাত উপবিষ্ট স্থানক ও ছয় প্রকার সুপ্ত স্থানকের উল্লেখ আছে।

স্বস্তিক—কুঞ্চিত পদদ্বয়ের একটি অপরটিকে অতিক্রম করিলে যদি উভয়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে 'স্বস্তিক' স্থানক হয়।

বর্ধমান—গোড়ালিদ্বয় সংযুক্ত করিয়া পদদ্বয় তির্যগ্‌ভাবে রাখিলে 'বর্ধমান' স্থানক হয়।

নন্দ্যাবর্ত—বর্ধমান স্থানকে পদদ্বয় যদি ছয় অঙ্গুলি অথবা এক বিতস্তি (১২ অঙ্গুলি পরিমাণ) ব্যবধানে থাকে, তাহা হইলে 'নন্দ্যাবর্ত' হয়।

সংহত—দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিয়া পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও গুলফ দুইটি পরস্পর সংযুক্ত করিলে 'সংহত' হয়। ইহা পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সমপাদ—দেহ স্বাভাবিক এবং পদদ্বয় বিতস্তি পরিমাণ ব্যবধানে সরল অবস্থায় থাকিলে 'সমপাদ' হয়।

একপাদ—সমপাদের একটি পদের জানু উর্ধ্বে উত্থিত করিয়া পদটির বাহিরের পার্শ্ব অন্য পদটির বাহিরের পার্শ্বভাগের সহিত যুক্ত করিলে 'একপাদ' স্থানক হয়।

পৃষ্ঠোত্তানতল—পদদ্বয়ের একটির অঙ্গুলিপৃষ্ঠ পশ্চাদ্‌ভাগে ভূমিসংলগ্ন হইলে এবং অপরটি সম্মুখভাগে সমপাদে থাকিলে 'পৃষ্ঠোত্তানতল' হয়।

চতুরস্র—'নন্দ্যাবর্ত' স্থানকে পদদ্বয়ের ব্যবধান যদি অষ্টাদশ অঙ্গুলি হয়, তাহা হইলে উহাকে 'চতুরস্র' বলে।

পার্ষ্ণিবিদ্ধ—একটি গোড়ালি যদি অপরপদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে 'পার্ষ্ণিবিদ্ধ' হয়।

পার্ষ্ণিপার্শ্বগত—ভিতরের দিকে একটি গোড়ালির পার্শ্বে অপর গোড়ালিটি স্থাপন করিলে 'পার্ষ্ণিপার্শ্বগত' হয়।

একপার্শ্বগত—একটি সমপাদের কিঞ্চিৎ পুরোভাগে বাহিরের পার্শ্বদেশে অপর পদটি তির্যগ্‌ভাবে স্থাপন করিলে 'একপার্শ্বগত' হয়।

একজানুনত—একটি পদ সমপাদে রাখিয়া অন্য পদটি চার অঙ্গুলি ব্যবধানে তির্যগ্‌ভাবে জানু কুঞ্চিত করিয়া স্থাপন করিলে 'একজানুনত' হয়।

পরাবৃত্ত—একটি পদের অঙ্গুষ্ঠ ও অপর পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি গোড়ালির সহিত সমসূত্রে স্থাপন করিলে 'পরাবৃত্ত' হয়।

সমসূচী—বাম অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ-গোড়ালির সহিত এবং দক্ষিণ কনিষ্ঠ বাম-গোড়ালির সহিত অথবা দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ বাম গোড়ালির সহিত এবং বাম-অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ-গোড়ালির সহিত একই স্থানে স্থাপন করিলে 'সমসূচী' হয়।

বিষমসূচী—সূচী পদদ্বয় পৃথগ্‌ভাবে একই সময়ে অগ্রে ও পশ্চাতে প্রসারিত করিলে 'বিষমসূচী' হয়।

খণ্ডসূচী—একটি পদ কুঞ্চিত ও অন্যটির গোড়ালি ও উরু তির্যগ্‌ভাবে প্রসারিত হইয়া ভূসংলগ্ন হইলে 'খণ্ডসূচী' হয়।

ব্রাহ্ম—একটি পদ সমভাবে রাখিয়া অপর পদটি জানুসন্ধি পর্যন্ত কুঞ্চিত করিয়া পৃষ্ঠদেশে উৎক্ষিপ্ত করিলে 'ব্রাহ্মস্থান' হয়। অভিনয় দর্পণের পুরুষস্থানে বর্ণিত ব্রাহ্মস্থানের সহিত ইহার কোন সঙ্গতি নাই। কেহ কেহ সঙ্গীত রত্নাকরে বর্ণিত সমপাদকেই ব্রাহ্মস্থান বলিয়াছেন, যে হেতু ব্রহ্মা ইহার অধিদেবতা। কিন্তু গ্রন্থকার সে বিষয়ে নীরব। সুতরাং এই অভিমত সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ সঙ্গীত

রত্নাকরের সপ্তম অধ্যায়ে পুরুষস্থানকের ১০৫২ শ্লোকে এবং দেশীস্থানকের ১০৮৮ শ্লোকে সমপাদের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া পুনরায় ওই অধ্যায়েই ১০৯৯ শ্লোকে ব্রাহ্মস্থানের পৃথক লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, যাহার সহিত দুই প্রকার সমপাদের কোনই সাদৃশ্য নাই।

বৈষ্ণব—একপদ সমপাদে রাখিয়া অন্যপদটি ঈষৎ কুঞ্চিত ও তির্যগ্‌ভাবে সম্মুখে প্রসারিত করিলে 'বৈষ্ণবস্থান' হয়।

শৈব—বামপদটি 'সম' অবস্থায় রাখিয়া অপর পদটি কুঞ্চিতাকারে বামপদের জানুশীর্ষ সমান উত্থিত করিলে 'শৈবস্থান' হয়।

গারুড়—ভূমিতে উভয় জানু স্থাপন করিয়া কুঞ্চিত অবস্থায় বামপদ সম্মুখে ও দক্ষিণপদ পশ্চাতে রাখিলে 'গারুড়স্থান' হয়

কূর্মাসন—

"দক্ষিণশ্চরণো জানুবাহ্যগুল্‌ফমিলৎক্ষিতিঃ।
বামঃ সমো ভবেদ্ যত্র কূর্মাসনমদো বিদুঃ॥" সঃ রঃ ৭।১১০৩।

অর্থাৎ দক্ষিণপদের জানু, ও গুল্‌ফের বাহ্যদেশ ভূমি স্পর্শ করিলে এবং বামপদ 'সম' হইলে 'কূর্মাসন' হয়। এইস্থলে 'সম' বিশেষণটির তাৎপর্য সুস্পষ্ট নহে।

নাগবন্ধ—উপবেশন করিয়া বাম উরুর পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ জঙ্ঘা ন্যস্ত করিলে 'নাগবন্ধ' হয়।

বৃষভাসন—জানুদ্বয় সংযুক্ত অথবা বিযুক্তভাবে ভূমি সংলগ্ন করিলে 'বৃষভাসন' হয়।

পিণ্ডীবন্ধ ও স্থানকের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পিণ্ডীবন্ধে এক বা একাধিক পাত্রের প্রয়োজন হয় এবং অঙ্গহারাদির সংঘাতে উৎপন্ন ইহার বিশেষ বিশেষ নিশ্চল ভঙ্গীগুলি দেখিলে তদাকৃতির কোন বিশেষ দেবতার ভঙ্গীবিশেষ স্মরণে উদিত হয়। কিন্তু ক্রিয়ান্তে পিণ্ডীবন্ধের সহিত স্থানকের নিশ্চলতার সাদৃশ্য থাকিলেও, স্থানক তাদৃশ কোন দেবতাবিশেষের ভঙ্গীর স্মারক নহে।

হস্তভেদ



হস্তভেদ

নৃত্যে অর্থ প্রকাশের জন্য অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা বাহু প্রকরণ ও মুখের অভিব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন। বাহু প্রকরণের কার্য বলিতে সমগ্র বাহুটির কার্য বুঝায়। নাট্য-শাস্ত্রকারগণ এই বাহুর কার্যকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করিয়াছেন ; যথা—বাহুপ্রকরণ, করকরণ, হস্তভেদ, নৃত্যকরণ ইত্যাদি। এক একটির নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে নটগণ বুঝিতে পারেন বাহুর কোন্ অংশের এবং কি ধরণের কার্যের কথা বলা হইতেছে। যেমন, হস্তভেদ বলিতেই আমরা অঙ্গুলিগুলির বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি ও তাহাদের স্থিতি বুঝি। এই অঙ্গুলিচালনা বিশেষ বিশেষ রস ও গভীর অর্থের দ্যোতক। নৃত্যের জগতে সাধারণ ভাষায় ইহাকে 'মুদ্রা' বলা হয়। মুদ্রার নানারকম অর্থ করা হইয়াছে। সঙ্গীত দর্পণে বলা হইয়াছে—"সম্প্রদায়ানুসরণং মুদ্রা হৃদয়রঞ্জনী।" মুদ্রা অঙ্গহারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং ইহার একটি সুস্পষ্ট অর্থ থাকে। অনেক সময় একটি মুদ্রার বিভিন্ন প্রকার প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা নানারূপ অর্থ ও ব্যক্ত করা যায়। বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার সুসংবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রকাশে এক একটি কাহিনীর রূপায়ণও সম্ভবপর হয়। মুদ্রা শব্দের অর্থ হইতেছে "মুদম্ আনন্দং রাতি দদাতি"—অর্থাৎ যাহা আনন্দ দান করে। নৃত্যের মধ্যে যখন রূপ, রস, ভাব, ব্যঞ্জনা মূর্ত হইয়া উঠে তখনই আমরা আনন্দ পাই। এই সকল গুণগুলিকে মূর্ত হইয়া উঠিতে সহায়তা করে অঙ্গহার, তাল, হস্তভেদ ও ভাব ইত্যাদি। সুতরাং এক কথায় বলা যাইতে পারে, হস্তভেদ বা মুদ্রা হইতেছে নৃত্যের ভাষা। এই ভাষার সাহায্যে নৃত্যের বক্তব্য ব্যক্ত করা হয়।

ভরত দশপ্রকার বাহুকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে—তির্যক্, উর্ধ্বসংস্থ, অধোমুখ, অঞ্চিত, অপবিদ্ধ, মণ্ডলগতি, স্বস্তিক, পৃষ্ঠানুসারী, উদ্বেষ্টিত ও প্রসারিত। শার্ঙ্গদেব যোড়শপ্রকার বাহুর ইঙ্গিত দিয়াছেন। ভরতের দশপ্রকারের সহিত তিনি আরও

ছয় প্রকার বাহুকরণ যোগ করিয়াছেন। এইগুলি হইতেছে—আবিদ্ধ, কুঞ্চিত, নম্র, সরল, আন্দোলিত ও উৎসারিত। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয় অবলম্বনপূর্বক এই ষোড়শবিধ বাহুর সহিত আবেষ্টিতাদির চতুর্বিধ করণের সমস্ত বা ব্যস্তভাবে যোজনের ফলে সহস্র সহস্র বর্তনা সৃষ্ট হইতে পারে: এই বর্তনাগুলি অত্যন্ত শোভা-নিষ্পাদক। ভট্টতণ্ডু চতুর্বিংশতি বর্তনার উল্লেখ করিয়াছেন—পতাকা, অরাল, শুকতুণ্ড, পল্লব, খটকামুখ, মকর, উর্ধ্ব, আবিদ্ধ, রেচিত, নিতম্ব, কেশবন্ধ, কক্ষ, উরোব, খড়্গ, পদ্ম, দণ্ড, পল্লব, অর্ধমণ্ডল, ঘাতব, ললিত, বলিত, গাত্র, প্রতি ও বর্তনা।

ভরত ও শার্ঙ্গদেব চারিপ্রকার করকরণের উল্লেখ করিয়াছেন—আবেষ্টিত, উদ্বেষ্টিত, ব্যবর্তিত ও পরিবর্তিত।

আবেষ্টিত—তর্জনী হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠ পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি যথাক্রমে করতলের অভ্যন্তরে সঙ্কুচিত করিতে হইবে।

উদ্বেষ্টিত—ইহাতে তর্জনী হইতে কনিষ্ঠা পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি যথাক্রমে বহির্মুখে প্রসারিত করিতে হইবে।

ব্যবর্তিত—কনিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জনী পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি যথাক্রমে করতলাভিমুখে সঙ্কুচিত করিতে হইবে।

পরিবর্তিত—কনিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জনী পর্যন্ত অঙ্গুলিগুলি ক্রমশঃ বহির্মুখে প্রসারিত করিতে হইবে।

ভরত বলিয়াছেন—

"বিযুতাঃ সংযুতাশ্চৈব নৃত্তহস্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ"॥

তাঁহার মতে করণের সহিত নৃত্তহস্তের প্রয়োগ এবং অর্থাভিনয়ে পতাকাদি হস্তের প্রয়োগ হয়। প্রয়োজনানুসারে ইহাদের মিশ্রণও চলিতে পারে। অর্থাভিনয় প্রকাশের জন্য হস্তভেদগুলি সংযুত ও অসংযুতভেদে নানাপ্রকার হয়। নাট্যশাস্ত্র ও হস্তলক্ষণ দীপিকায় ২৪ প্রকার ও অভিনয় দর্পণে ২৮ প্রকার অসংযুত হস্তের উল্লেখ আছে।

একটি হস্তের দ্বারা যখন অর্থ প্রকাশ করা হয়, তখন তাহাকে অসংযুত হস্ত বলা হয়। নাট্যশাস্ত্রে এই ২৪ প্রকার নাম আছে—

"পতাকস্ত্রিপতাকশ্চ তথা বৈ কর্তরীমুখঃ।
অর্ধচন্দ্রো হ্যরালশ্চ শুকতুণ্ডস্তথৈব চ ॥
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিত্থঃ খটকামুখঃ।
সূচ্যাস্যঃ পদ্মকোশঃ সর্পশিরা মৃগশীর্ষকঃ ॥
কাঙ্গুলকোহলপদ্মশ্চ চতুরো ভ্রমরস্তথা।
হংসাস্যো হংসপক্ষশ্চ সন্দংশো মুকুলস্তথা ॥
ঊর্ণনাভস্তাম্রচূড়শ্চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ।
অসংযুতাঃ সংযুতাংশ্চ গদতো মে নিবোধত ॥"

অভিনয় দর্পণে ২৮ প্রকার অসংযুত হস্তভেদের উল্লেখ আছে—

"পতাকস্ত্রিপতাকোঽর্ধপতাকঃ কর্তরীমুখঃ।
ময়ূরাখ্যোঽর্ধচন্দ্রশ্চ অরালঃ শুকতুণ্ডকঃ ॥
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিত্থঃ কটকামুখঃ।
সূচী চন্দ্রকলা পদ্মকোশঃ সর্পশিরস্তথা ॥
মৃগশীর্ষঃ সিংহমুখঃ কাঙ্গুলশ্চালপদ্মকঃ।
চতুরো ভ্রমরশ্চৈব হংসাস্যো হংসপক্ষকঃ ॥
সন্দংশো মুকুলশ্চৈব তাম্রচূড়স্ত্রিশূলকঃ।
ইত্যসংযুত-হস্তানামষ্টাবিংশতিরীরিতা ॥"

হস্তলক্ষণ দীপিকায় ২৪টি মূল হস্তভেদের লক্ষণ আছে। সেইগুলি হইতেছে এইরূপ—পতাক, ত্রিপতাক, মুদ্রাক্ষ, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ, সূচী, কটক, সর্পশীর্ষ, মৃগশীর্ষ, হংসপক্ষ, মুকুর, ভ্রমর, হংসাস্য, অঞ্জলি, মুকুল, ঊর্ণনাভ, পল্লব, বর্ধমানক।

পতাক—সকল অঙ্গুলিগুলি সমান ভাবে প্রসারিত করিলে এবং কেবলমাত্র অঙ্গুষ্ঠটি কুঞ্চিত রাখিলে 'পতাক' হস্ত হয়। প্রহারে, প্রতাপে, প্রেরণে, হর্ষে, গর্বে, 'আমি,' 'আমার' প্রভৃতি গর্ব প্রকাশে

হস্তদ্বয় পার্শ্বান্তর হইতে নিজ পার্শ্বে আগমনকালে ললাটাভিমুখে উর্ধ্বে তুলিতে হয়। হস্তদ্বয় উর্ধ্বে উত্থিত করিয়া অগ্নিধারা নিরূপণ করিতে এবং অঙ্গুলিগুলি উর্ধ্বমুখী করিয়া মস্তকের উপর রাখিয়া পুনরায় অধোমুখী করিয়া পুষ্পবৃষ্টি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। পতাক হস্তদ্বয়কে যুক্ত করিয়া স্বস্তিক এবং স্বস্তিককে বিচ্যুত করিয়া পতাক হস্তদ্বয়কে মণিবন্ধের সহিত সংযুক্ত করিয়া বাহুর পরিভ্রমণের দ্বারা পল্বল (ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্পোপহার, শস্প (নবতৃণ) প্রভৃতি পৃথিবীতে অবস্থিত বস্তুকে নির্দেশ করা হয়। স্বস্তিককে বিচ্যুত করিয়া, পুনরায় বিচ্যুত হস্তদ্বয়কে স্বস্তিক করিয়া, এই ক্রমে সংবৃত, বিবৃত, অর্ধ্বসংবৃত ও অর্ধ্ববিবৃত ইত্যাদি নানাভাবে হস্তদ্বয়কে রাখিয়া পতনোন্মুখকে রক্ষা করা, অপরের দৃষ্টি হইতে গোপন করা প্রভৃতি ব্যক্ত করা হয় এবং হস্তদ্বয়কে অধোমুখে ও উর্ধ্বাভিমুখে চালনা করিয়া বায়ুচালিত উর্মিবেগ দ্বারা বেলাভূমির বিক্ষোভ ও বেগ প্রদর্শন করা হয়। রেচকের সাহায্যে হস্তদ্বয় চালনার দ্বারা পক্ষীকুলের পক্ষ উৎক্ষেপের অভিনয় করিতেও ইহা প্রযোজ্য হয়। পতাক হস্তদ্বয়ের তলদেশ ঘর্ষণ দ্বারা কোন দ্রব্য ধৌত করা, মর্দন করা, পেষণ করা প্রভৃতি বুঝায়। ইহা ব্যতীত শৈলধারণ ও উদ্‌ঘাটনে ইহা ব্যবহৃত হয়। দশক, শতক, সহস্র সংখ্যা বুঝাইতেও 'পতাক' ব্যবহার করা হয়।

ত্রিপতাক—পতাক হস্তে 'অনামিকা' বক্র হইলে 'ত্রিপতাক' হস্ত হয়। নিম্নলিখিত কার্যাবলী প্রদর্শনে ইহা ব্যবহৃত হয়—আবাহন, অবতরণ, বিসর্জন, বারণ, প্রবেশ, চিবুকাদি স্পর্শ (দুই অঙ্গুলির দ্বারা), প্রণাম, উপমান-উপমেয় ভাব-বিচার, বিবিধ বচন, মঙ্গল দ্রব্য (পূর্ণকুম্ভাদি) স্পর্শ, মস্তক স্পর্শ, উষ্ণীষ ধারণ, মুকুট ধারণ, অনিষ্ট গন্ধে বা শব্দে নাক, মুখ, কান আচ্ছাদন, অঙ্গুলিদ্বয়ের তরঙ্গায়িত ভাবে চালনার দ্বারা তীব্রবেগে বিহগ পতন, জলস্রোত, ভুজগ ও ভ্রমরাদির পতন, অশ্রুমার্জন, তিলক বিরচন, রোচনা দ্বারা শরীর স্পর্শন, ত্রিপতাককে স্বস্তিক করিয়া গুরুজনের পাদবন্দন এবং ত্রিপতাক

হস্তদ্বয়ের অগ্রভাগ পরস্পর সংশ্লিষ্ট করিয়া বিবাহ দর্শন, বিচ্যুত পূর্বক চালনা করিয়া নৃপদর্শন, তির্যগ্‌ভাবে স্বস্তিক করিয়া গ্রহদর্শন, ঊর্ধ্ব ও নিম্নাভিমুখে তপস্বীদর্শন, পরস্পরাভিমুখে দ্বারদর্শন, উত্তান অবস্থায় চিবুকের নিকট অবস্থান করিলে বড়বানল ও মকর দর্শন, বানরদিগের উল্লম্ফন, সম্মুখদিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিয়া বালেন্দু দর্শন, ত্রিপতাক হস্ত পশ্চাতে ফিরাইয়া মানুষের গমন।

কর্তরীমুখ—ত্রিপতাক হস্তে মধ্যমা হইতে তর্জনী বিশ্লিষ্ট অবস্থায় হস্তের পৃষ্ঠদেশ দৃষ্ট হইলে 'কর্তরীমুখ' হয়। পথপ্রদর্শনে চরণরচনাতে (উল্কিরচনায়), চরণ-রঞ্জনে (অলক্তক-রঞ্জনে), কুম্‌কুমাদি দ্বারা তিলক রচনে 'কর্তরীমুখ' অধোমুখী হইবে ; দংশনে, কর্তনে, শৃঙ্গে, লেখনে ইহা ঊর্ধ্বমুখী হইবে। পতনে, মরণে, অপরাধে, পশ্চাদবলোকনে, বিতর্কে (অনুমান, সন্দেহ, কল্পনা প্রভৃতিতে), নিক্ষেপে, কর্তরীমুখের অঙ্গুলিদ্বয় (মধ্যমা ও তর্জনী) পৃষ্ঠগত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবে এবং পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা রুরু (একপ্রকার মৃগ), চমর, মহিষ, সুরগজ (ঐরাবত), বৃষ, গোপুর (তোরণদ্বার), শৈলশিখর নির্দেশ করিতে সংযুত বা অসংযুত হস্তের ব্যবহার করেন।

অর্ধচন্দ্র—অঙ্গুষ্ঠসহ অঙ্গুলিগুলি ধনুকের ন্যায় বক্রাবস্থায় নত হইলে 'অর্ধচন্দ্র' হয়। বালতরু, চন্দ্রকলা, শঙ্খ, কলসী, বলয়, বলপ্রয়োগে উন্মোচন, গণ্ড ও ভ্রূবিভ্রমের দ্বারা খেদ, ক্রোধ প্রভৃতির প্রকাশে, কৃষ ও স্থূল বস্তুর নির্দেশে ইহা ব্যবহৃত হয়। নারীদিগের রশনা (নিতম্ব), জঘন (উরুদেশ), কটী, মুখে উল্কাদি রচনা, কুন্তল প্রভৃতির অভিনয়েও ইহা ব্যবহৃত হয়।

অরাল—তর্জনী ধনুকের ন্যায় নত, অঙ্গুষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলি উন্নত ও পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইলে 'অরাল' হস্ত হয়। ইহা দ্বারা স্থৈর্য, গর্ব, উৎসাহ, কান্তি (শোভা), আকাশস্থ বস্তু নির্দেশ, গাম্ভীর্য প্রকাশ, আশীর্বাদ এবং অন্যান্য শুভ কার্যের অভিনয়

করা হয়। স্ত্রীদিগের কেশবন্ধনে, কেশবিন্যাসে, আত্মসংক্রান্ত দর্শনে একাধিক গতি সহযোগে অরাল হস্তের প্রয়োগ হয়। অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ স্বস্তিকাকারে বিন্যস্ত করিয়া অরাল হস্তের প্রদক্ষিণ দ্বারা বিবাহের পূর্বে স্ত্রী-আচার, দেবতাদিগকে বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ, পুষ্পাদির অভিনয়, আবাহন, নিবারণ, নির্মাণ, খেদের অপনোদন, শুভগন্ধ আঘ্রাণ অভিনীত হয়। পূর্বোক্ত ত্রিপতাক হস্ত দ্বারা অভিনেয় আবাহন অবতারণাদি বিষয়ে কেবলমাত্র স্ত্রীলোকগণই অরাল হস্তের প্রয়োগ করিতে পারেন। পুরুষদিগের পক্ষে ত্রিপতাক স্থানে অরালের প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

শুকতুণ্ড—অরাল হস্তের অনামিকা বক্র হইলে 'শুকতুণ্ড' হয়। 'আমি নই', 'তুমি নও', 'করিও না' ইত্যাদির অভিনয়ে, আবাহনে, বিদায়ে এবং অবজ্ঞার সহিত ধিক্কার প্রদানে ইহা প্রযুক্ত হয়।

মুষ্টি—হস্তের তলমধ্যে অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ স্থাপিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উহাদিগকে চাপিয়া ধরিলে 'মুষ্টি' হয়। প্রহারে, ব্যায়ামে, যুদ্ধে (প্রতিপক্ষের হস্তধারণে, খণ্ডযুদ্ধে), নির্গমে (আদা প্রভৃতি নিঙড়ানে), পীড়নে (মহিষাদির দোহন ইত্যাদিতে), সংবাহনে (মাটি চটকান), অসি ও যষ্টিধারণে, কেশ ও দন্তের ধারণে ও মার্জনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

শিখর—'মুষ্টি' হস্তের অঙ্গুষ্ঠটি যদি ঊর্ধ্বে উত্থিত থাকে, তাহা হইলে 'শিখর' হস্ত হয়। রশ্মি (অশ্ব রজ্জু), কুশ, অঙ্কুশ, ধনুক ধারণে এবং তোমর (একপ্রকার অস্ত্র) শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রের নিক্ষেপে, অধর ও ওষ্ঠরঞ্জনে, পদরঞ্জনে এবং অলকের উৎক্ষেপণাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কপিত্থ—শিখর হস্তে অঙ্গুষ্ঠের উপর তর্জনীটি যদি বক্রভাবে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে 'কপিত্থ' হস্ত হয়। অসি, ধনুক, চক্র, তোমর, বর্শা, গদা, শক্তি ও বজ্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রয়োগে ইহা ব্যবহৃত হয়।

খটকামুখ—কপিত্থ হস্তে কনিষ্ঠার সহিত অনামিকা উৎক্ষিপ্ত ও বক্র হইলে 'খটকামুখ' হয়। [১]'হোত্রে', [২]'হোব্যে' ছত্র এবং রজ্জুর গ্রহণ ও ধারণে, মন্থনে, বাণাকর্ষণে, [৪]স্রগ্‌দাম ধারণে, পুষ্পমালা ও বস্ত্রাঞ্চল ধারণে, পুষ্পচয়নে, কশাধারণে, অঙ্কুশধারণে, রজ্জু-আকর্ষণে ও স্ত্রী-দর্শনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

সূচীমুখ—খটকামুখের তর্জনী সম্প্রসারিত হইলে 'সূচীমুখ' হয়। তর্জনী অধোমুখ, পার্শ্বান্তর কম্পিত, কুঞ্চিত, প্রসারিত ও ঊর্ধ্বমুখী প্রভৃতি বিভিন্ন গতিতে সঞ্চালিত হইয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। বিদ্যুৎ, চক্র, লতা, কর্ণফুল, কুটিলগতি (মীনাদির গতি), সাধুবাদের অভিনয় করিতে, ক্ষুদ্র সর্প, দীপ, অলাবু প্রভৃতির অভিনয় করিতে প্রয়োজনমত অধোমুখে, বক্রভাবে ও ঊর্ধ্বে মণ্ডলাকারে হস্তটিকে ঘুরাইতে হইবে। সংযোগ বুঝাইতে অধস্তলদ্বয়ের পার্শ্বদেশ সংযুক্ত এবং বিয়োগ বুঝাইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। হস্তদ্বয়কে বিযুক্ত অবস্থায় ভূমিতে অভিমুখী ও পরাঙ্মুখী গতিদ্বারা বামপার্শ্বে ভ্রমণ করাইলে দিনাবসান এবং অনুরূপভাবে দক্ষিণপার্শ্বে ভ্রমণ করাইলে নিশাবসান সূচিত হয়। অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করিয়া আকুঞ্চিত করিলে পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল প্রদর্শিত হয়। উত্তান অবস্থায় পরিমণ্ডলাকারে তির্যগ্‌ভাবে রাখিয়া, একহস্ত ললাটে সংযুক্ত করিলে শক্রের অভিনয় হয়। একহস্ত ললাটে স্থিত হইলে হরের তৃতীয় নয়ন হয়। পুনরায় অগ্রভাগ ভ্রমিত হইলে রূপ, শিলাবর্ত, যন্ত্র, শৈল অভিনীত হয়। ললাটে অধোমুখে স্থিত হইলে শম্ভুর অভিনয় হয়।

পদ্মকোশ—অঙ্গুলিগুলি [৫]বিরল অঙ্গুষ্ঠের সহিত কুঞ্চিত ও ঊর্ধ্বমুখী হইলে 'পদ্মকোশ' হয়। বিল্ব, কপিত্থ প্রভৃতি ফল গ্রহণে, কুচ প্রদর্শনে, গ্রহণে, নানাজাতীয় ডালিম প্রদর্শনে, শ্রাদ্ধাদিতে পিণ্ডদানে, আমিষখণ্ডে ইহা প্রদর্শন করা হয়। [৬]ক্রব্যাদগণের আমিষ গ্রহণে অগ্রভাগ বেশী

(১) যজ্ঞে; (২) ঘৃতাহুতি দানে; (৩) কুঙ্কুম, চন্দনাদির পেষণে; (৪) মাল্যসূত্র; (৫) সংশ্লিষ্ট নহে; (৬) কাঁচামাংসভোজী।

কুঞ্চিত হইবে। দেবপূজায়, ভোজ্যদানে, পিণ্ডদানে পদ্মহস্তের ক্রিয়া হয়। মণিবন্ধ দুইটি বিশ্লিষ্ট হইলে ও অঙ্গুলিগুলি বিরলভাবে কম্পিত এবং বিবর্তিত হইলে বিকশিত কমলের অভিনয় হয়।

সর্পশির—অঙ্গুলির অগ্রভাগগুলি অঙ্গুষ্ঠ সহ সংহত হইয়া কুঞ্চিত হইলে এবং করতলাভিমুখী হইলে 'সর্পশির' হয়। দেবতাদিগকে জলদানে, সর্পগতিতে, তোয় (কুমকুম, চন্দনাদি) সেচনে, মল্লযুদ্ধের সময় উরুস্ফোটনে, করিকুম্ভ (হস্তি মস্তক) আস্ফালনে অঙ্গুলিগুলি অধোমুখী হইয়া ব্যবহৃত হয়।

মৃগশীর্ষ—সর্পশিরে কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠ ঊর্ধ্বে উত্থিত হইলে মৃগশীর্ষ হয়। প্রত্যক্ষ বস্তু নির্দেশে, বর্তমানকাল নির্দেশে, 'আছে' এই ভাব বুঝাইতে, ভবিষৎ সম্ভাবনা বুঝাইতে, 'অদ্য' বুঝাইতে মৃগশীর্ষ অধোমুখী-ভাবে ব্যবহৃত হয়। শক্তির উল্লাসে ও অক্ষপাতে (পাশা খেলায়) ইহা ঊর্ধ্বমুখীভাবে ব্যবহৃত হয়। গণ্ডাদির স্বেদমার্জনে করতল গণ্ডাভিমুখী হইবে এবং অঙ্গুলিগুলি ঊর্ধ্বমুখী হইবে। স্ত্রীলোকদিগের কুট্টমিতভাব প্রদর্শনেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

কাঙ্গুল—মধ্যমা, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠা ত্রেতাগ্নিবৎ স্থাপিত হইলে এবং অনামিকা বক্রা এবং কনিষ্ঠা ঊর্ধ্বে থাকিলে 'কাঙ্গুল' হস্ত হয়। নানাবিধ কাঁচাফল, মুক্তা, বদর (কুলজাতীয় ফল), মৃৎপিণ্ডগ্রাস প্রভৃতি বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকদিগের রোষজনিত কার্যে ও বচনে অঙ্গুলিগুলি বাহিরের দিকে ক্ষেপণ করিতে হইবে। মরকত, বৈদূর্য প্রভৃতি মণি ও পুষ্পের প্রদর্শনে ইহা ব্যবহৃত হয়।

অলপল্লব (অলপদ্ম)—করতলে অঙ্গুলিগুলি আবর্তিত অবস্থায় থাকিয়া পার্শ্বগত ও বিকীর্ণ হইলে 'অলপল্লব' হয়। 'তুমি কাহার', 'নাই' এই ভাবটি প্রকাশ করিতে, মিথ্যা বলিতে, 'ইহা মূল্যহীন' এইরূপ বচন প্রয়োগে, পুনরায় ও 'আমি' বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোকদিগের বিস্ময় বুঝাইতে ইহা পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইয়া থাকে।

চতুর—কনিষ্ঠ ঊর্ধ্ব ও অবশিষ্ট তিনটি প্রসারিত এবং প্রসারিত তিনটির মধ্যদেশে অর্থাৎ মধ্যম অঙ্গুলির মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠটি স্পর্শ করিয়া থাকিলে 'চতুর' হয়। গ্রহণ, বিনয়প্রকাশ, নিয়ম, সুনিপুণ, বালক পীড়িত জীব, মিথ্যাচারী প্রভৃতি অর্থ বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। উপযুক্ত, হিতকর, সত্যবাক্য ও প্রশমে ইহার প্রয়োগ হয়। প্রয়োজনমত এক অথবা দুই হস্ত মণ্ডলাকারে ঘুরাইলে বিবরণ, বিচার, আচরণ বিতর্কিত ভাব ও লজ্জিতভাব প্রকাশিত হয়। উপমান-উপমেয় ভাবে পদ্মদলের সহিত নয়নের তুলনা করিতে, হরিণের কর্ণনির্দেশে দুই হস্তের দ্বারা 'চতুর' করিতে হইবে। লীলা, রতি, রুচি, স্থিতি, বুদ্ধি, প্রণয়, চাতুর্য, মাধুর্য, দাক্ষিণ্য, কোমলতা, সুখ, শীল, প্রশ্ন, সম্পদ, দারিদ্র্য, সুরত, যৌবন, গৃহ, ভার্যা ইত্যাদি 'চতুর' হস্তের দ্বারা প্রদর্শিত হইবে।

ভ্রমর—মধ্যম ও অঙ্গুষ্ঠ যদি সাঁড়াষীর আকারে যুক্ত হয় এবং প্রদর্শনী বক্র হয় এবং অপর অঙ্গুলিগুলি ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হয়, তাহা হইলে 'ভ্রমর' হস্ত হয়। ইহার দ্বারা স্থলপদ্ম, জলপদ্ম, কুমুদ, দীর্ঘবৃন্ত পুষ্পের গ্রহণ এবং কর্ণভূষণ প্রদর্শিত হয়। ভৎসনাতে, বালকের সহিত আলাপে, শীঘ্রতায়, তাল দিতে, বিশ্বাস উৎপাদনে সশব্দে মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তুড়ি দিতে হইবে।

হংসমুখ—তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত হইলে এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত হইলে 'হংসমুখ' হয়। কোমল, অল্পশিথিল, লঘুতা, অপসারণ ও মৃদুত্বের অভিনয়ে ইহার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হইবে।

হংসপক্ষ—তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই অঙ্গুলিত্রয় সমানভাবে প্রসারিত হইলে, কনিষ্ঠা উত্থিত হইলে এবং অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত ও ঊর্ধ্বে থাকিলে 'হংসপক্ষ' হয়। পিতৃতর্পণে, চিন্তার অভিনয়ে, (অঙ্গুলিগুলি পরাঙ্মুখ করিয়া গণ্ডে স্থাপন করিতে হইবে), ব্রাহ্মণদিগের আচমনে, ভোজনে, প্রতিগ্রহে একহস্তের প্রয়োগ এবং তরুস্তম্ভ দর্শনে, রোমহর্ষণে, প্রিয়জন স্পর্শে দুইহস্তের প্রয়োগ এবং অনুলেপনে, গাত্র সংবাহনে, দুঃখে এবং হনুধারণে স্বস্তিক হস্তের প্রয়োগ হয়।

সন্দংশ—অরালহস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সংযুক্ত হইলে এবং করতলের মধ্যভাগ ঈষৎ বক্র হইলে 'সন্দংশ' হয়। ইহা তিন প্রকার—অগ্রজ, মুখজ ও পার্শ্বগত। সূত্র ও সূক্ষ্মপুষ্পের অপচয়ে ও গ্রন্থনে, তৃণ, পর্ণ ও কেশ গ্রহণে, কণ্টকাদির গ্রহণে ও আকর্ষণে 'অগ্রজ' ব্যবহৃত হয়। বৃন্ত হইতে পুষ্পচয়ন, শলাকার দ্বারা নয়নে অঞ্জনলেপন, ক্রোধভরে ধিক্কার বচন প্রয়োগ প্রভৃতিতে 'মুখজ' ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞোপবীত ধারণে, মুক্তাদির ছিদ্রকরণে, লক্ষ্যস্থল ভেদের জন্য ধনুকের গুণ আকর্ষণে সন্দংশের সহিত অপর হস্তের প্রয়োগ হয়। কোমল বচন, কুৎসিত বচন, অসূয়া বচন ও পূষ্য বচনে বামহস্তের অগ্রভাগ পার্শ্বে কিঞ্চিৎ বিবর্তিতা হইলে 'পার্শ্বগত' হয়।

মুকুল—হংসমুখকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ একত্র করিলে 'মুকুল' হয়। মুকুলের আকৃতি প্রাপ্ত হয় বলিয়াই ইহাকে 'মুকুল' বলে। ইহা দেবতার অর্চনায়, নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ কার্যে, পদ্ম ও মুকুলের রূপায়ণে ব্যবহৃত হয় এবং বিটদিগের (ধূর্ত বা লম্পট) চুম্বনে ইহা বিস্ফারিত হয়। ভোজনে, মোহর গণনায়, অঙ্গুরীয়কাদির মোচনে, মুখ সঙ্কোচন প্রদর্শনে এবং মুকুলিত কুসুমের রূপায়ণেও ইহা প্রযুক্ত হয়।

ঊর্ণনাভ—পদ্মকোশ হস্তের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত করিলেই 'ঊর্ণনাভ' হয়। ইহা কেশগ্রহণে, চৌর্যক্রিয়ায়, ধীর অথবা শঙ্কিতভাবে কোন বস্তুর গ্রহণে, মস্তক কণ্ডূয়নে (চুলকানি), কুষ্ঠ ব্যাধির রূপায়ণে, সিংহ ও ব্যাঘ্রের অভিনয়ে এবং প্রস্তরগ্রহণে ব্যবহৃত হয়।

তাম্রচূড়—(১ম মত) মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত হইলে, তর্জনী বক্র হইলে এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বয়ের অগ্রভাগ করতলে ন্যস্ত হইলে 'তাম্রচূড়' হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সশব্দ অবস্থায় বিচ্যুত করিয়া তুড়ি দিলে নির্ভৎসনে, তালে, বিশ্বাস উৎপাদনে, শীঘ্রতা বুঝাইতে ও সঙ্কেত করণে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ও সময়ের পরিমাণ, নিমেষ, ক্ষণ, বালকদিগের আলাপন ও নিমন্ত্রণেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

তাম্রচূড় (২য় মত)—অঙ্গুলিগুলি যদি সংযুক্ত অবস্থায় বক্র হয় এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পীড়িত হয় ও কনিষ্ঠা প্রসারিত থাকে তবে তাহাকেও 'তাম্রচূড়' বলে। এই প্রকার তাম্রচূড়ের দ্বারা শত, সহস্র অথবা লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দেখাইতে হয়।

একই প্রকার মুদ্রা দুই হস্তে অথবা দুই প্রকারের মুদ্রা দুই হস্তে প্রদর্শন করিয়া অর্থ প্রকাশ করিলে সংযুত হস্তভেদ বলা হয়। নাট্য-শাস্ত্রে ত্রয়োদশ প্রকার সংযুক্ত হস্তভেদের উল্লেখ আছে :—

"অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্কটঃ স্বস্তিকস্তথা।
খটকাবর্ধমানশ্চ হ্যুৎসঙ্গো নিষধস্তথা।
দোলঃ পুষ্পপুটশ্চৈব তথা মকর এব চ।
গজদন্তোঽবহিত্থশ্চ বর্ধমানস্তথৈব চ॥
এতে তু সংযুতা হস্তা ময়া প্রোক্তাস্ত্রয়োদশ।

অভিনয় দর্পণে ২৩ প্রকার সংযুত হস্তের কথা বলা হইয়াছে—

"অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্কটঃ স্বস্তিকস্তথা॥
ডোলাহস্তঃ পুষ্পপুট উৎসঙ্গঃ শিবলিঙ্গকঃ।
কটকাবর্দ্ধনশ্চৈব কর্ত্তরীস্বস্তিকস্তথা॥
শকটঃ শঙ্খচক্রে চ সম্পুটঃ পাশকীলকৌ।
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ গরুড়ো নাগবন্ধকঃ॥
খট্বা ভেরুণ্ড ইত্যেতে সঙ্খ্যাতাঃ সংযুতাঃ করাঃ।
ত্রয়োবিংশতিরিত্যুক্তাঃ পূর্ব্বৈর্গৈর্ভরতাদিভিঃ॥

Mirror of Gestureএ গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত সপ্তবিংশতি প্রকার সংযুত হস্তের নাম পাওয়া যায়। যথা—অবহিত্থ, গজদন্ত, চতুরস্র, তলমুখ, স্বস্তিক, গরুড়পক্ষ, নিষেধ, মকর, বর্দ্ধমান, উদ্‌বৃত্ত, পক্ষপ্রদ্যোত, আবিদ্ধচক্র, রেচিত, নিতম্ব, লতা, পক্ষবঞ্চিত, বিপ্রকীর্ণ, অরাল, কটকমুখ, সূচ্যাস্য, অর্দ্ধরেচিত, কেশবন্ধ, মুষ্টিস্বস্তিক, নলিনী-পদ্মকোষ, উদ্বেষ্টিতালপদ্ম, উল্বণ ও লোলিত।

নাট্যশাস্ত্রমতে—

অঞ্জলি—পতাক হস্তদ্বয় সংযুক্ত করিলে ‘অঞ্জলি’ হয়। দেবতা, গুরুজন ও বন্ধুজনের অভিবাদনে ইহা ব্যবহৃত হয়। ‘অঞ্জলি’ হস্ত শিরোস্থিত করিয়া দেবতাদিগকে, আস্যস্থিত করিয়া গুরুজনকে এবং বক্ষঃস্থিত করিয়া বন্ধুজনকে অভিবাদন করিতে হয়। স্ত্রীলোকদিগকে অভিবাদন করিতে কোন নিয়ম নাই।

কপোত—অঞ্জলি হস্তদ্বয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইলে ‘কপোত’ হস্ত হয়। বিনয় প্রদর্শনে, গুরু প্রণামে, গুরু সম্ভাষণে ইহা বক্ষঃস্থলে রাখিতে হয়। স্ত্রীলোক অথবা অধমদিগের পক্ষে, শীতার্তে ও আর্তভাব রূপায়ণে ইহা কম্পিত অবস্থায় বক্ষঃস্থ করিতে হয়।

কর্কট—এক হস্তের অঙ্গুলিগুলির ফাঁকে ফাঁকে অন্য হস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইলে ‘কর্কট’ হস্ত হয়। ইহা অঙ্গমোটনে, জৃম্ভণে (হাই তোলায়), স্থূল দেহ বুঝাইতে (উদরের সম্মুখভাগে হাত রাখিতে হইবে), হনুধারণে (অঙ্গুলিপৃষ্ঠের উপর থুতনী রাখিতে হইবে) ও শঙ্খধারণে ব্যবহৃত হয়।

স্বস্তিক—অরালহস্তদ্বয় যদি বামপার্শ্বে উত্তানভাবে (চিৎ করিয়া) মণিবন্ধে বিন্যস্ত হয়, তবে তাহাকে ‘স্বস্তিক’ বলে। ইহা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে প্রযোজ্য। স্বস্তিক বিচ্যুত করিয়া দিক্‌সমূহ, আকাশ, মেঘ, বন সমুদ্র, ষড় ঋতু ও পৃথিবী প্রভৃতির অভিনয় করিতে হয়।

খটকাবর্ধমানক :—একটি খটকামুখ যদি অপর একটি খটকামুখের উপর ন্যস্ত হয়, তাহাকে ‘খটকাবর্ধমানক’ বলে। ইহা শৃঙ্গার ভাবপ্রকাশে (তাম্বুলাদির গ্রহণে) এবং প্রণামে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, কুমুদ ও উৎপলের বৃন্তধারণে এবং ছত্রধারণেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

উৎসঙ্গ—অরালহস্তদ্বয় বিপর্যস্তভাবে (স্বস্তিকাকারে) স্বাভিমুখে ও বর্ধমানক অবস্থায় অর্থাৎ দক্ষিণহস্তটি বামস্কন্ধে এবং বাম হস্তটি দক্ষিণস্কন্ধে থাকিলে ‘উৎসঙ্গ’ হয়। কাহাকেও উৎসঙ্গে (ক্রোড়ে)

ধারণ করিবার যোগ্যতা আছে বলিয়াই ইহার নাম উৎসঙ্গ। পরোক্ষভাবে স্পর্শগ্রহণে, নিষ্পেষণে, রোষপ্রকাশে ও স্ত্রীলোকদিগের ঈর্ষাভাব প্রকাশে ইহা প্রযুক্ত হয়।

নিষধ—মুকুল হস্ত যদি কপিত্থ হস্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তাহা হইলে 'নিষধ' হস্ত হয়। সংগ্রহে, গ্রহণে, ধারণে, নিয়মে, সত্যবচন প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। অথবা শিখরহস্ত যদি মৃগশীর্ষের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহা হইলে 'নিষধ' হয়। ভয়ার্তভাব প্রকাশে ইহা ব্যবহৃত হয়। অথবা বামহস্তের দ্বারা দক্ষিণহস্তটি কূর্পরাভ্যন্তরে ধৃত হইলে এবং দক্ষিণহস্তটি বামহস্তের কূর্পরাভ্যন্তরে সম্যক মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ন্যস্ত হইলে 'নিষধ' হস্ত হয়। ইহার দ্বারা ধৈর্য, মদ, গর্ব, সৌষ্ঠব, ঔৎসুক্য, বিক্রম, অভিমান, স্থৈর্য প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়। অথবা যদি হংসপক্ষদ্বয় পরস্পর বিপরীতমুখী হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'নিষধ' বলা হয়। ইহা বাতায়ন ও বাতায়নাদির (যবনিকাদির) উন্মোচনে ব্যবহৃত হয়।

দোলহস্ত—স্কন্ধ দুইটি শিথিল করিয়া পতাক হস্তদ্বয় প্রলম্বিত ও মুক্ত অবস্থায় রাখিলে 'দোল' হস্ত হয়। সম্ভ্রমে, বিষাদে, মূর্চ্ছায়, মত্ততায়, আবেগে, ব্যাধিপ্লুত অবস্থায় ও শস্ত্রক্ষতে ইহা প্রযুক্ত হয়।

পুষ্পপুট—দুইটি সর্পশির যদি পার্শ্বসংশ্লিষ্ট হইয়া উত্তানভাবে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণের ভঙ্গীতে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে পুষ্পপুট বলে। ধান্য, ফল, পুষ্প সদৃশ নানাবিধ বস্তুগ্রহণে এবং জল আনয়ন ও অপনয়নে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মকরহস্ত—একটি পতাক হস্তের উপর আর একটি পতাক হস্ত উপর্যুপরি বিন্যস্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঊর্ধ্বমুখী এবং অঙ্গুলিগুলি অধোমুখী করিলে 'মকর' হস্ত হয়। সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, কুম্ভীর, মকর, মৎস্য ও রাক্ষস প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণী প্রদর্শনে 'মকর' হস্ত ব্যবহৃত হয়।

গজদন্ত—যখন সর্পশির হস্তদ্বয় একে অন্যের বাহুকে কনুয়ের ঠিক উপরিভাগে বেষ্টন করে, তখন তাহাকে 'গজদন্ত' হস্ত বলা হয়। বধূ

বা বরকে বিবাহস্থানে আনিতে, শিলা প্রভৃতি গুরুভার দ্রব্য উৎপাটন করিতে ও স্তম্ভগ্রহণে ইহার প্রয়োগ হয়।

অবহিত্থ—'শুকতুণ্ড' হস্তদ্বয় বক্ষাভিমুখী করিয়া ধীরে ধীরে অধোমুখী করিলে 'অবহিত্থ' হস্ত হয়। দৌর্বল্যে, নিঃশ্বাসে, গাত্রদর্শনে ও উৎকণ্ঠা প্রকাশে ইহার প্রয়োগ হয়।

বর্ধমান হস্ত—হংসপক্ষকে পরাঙ্মুখ করিলে 'বর্ধমান' হস্ত হয়। জাল (পর্দা), বাতায়ন প্রভৃতি উন্মোচনে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভরত উপসংহারে বলিয়াছেন যে, বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞ নট চিন্তাপূর্বক নিজ নিজ আকৃতি, প্রচেষ্টা, চিহ্ন ও জাতি বিষয়ে হস্তাভিনয় প্রদর্শন করিবেন।

'কথাকলি' নৃত্যে মূল ২৪ প্রকার হস্তভেদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অনুশীলনের দ্বারা এই ২৪ প্রকার হস্তভেদ হইতে আরও অনেক মুদ্রার অথবা হস্তভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রায় পাঁচশত মুদ্রার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া কথাকলি নৃত্যশিল্পীগণ দাবী করেন। এক একটি বড় বড় কাহিনীকে মুদ্রার সাহায্যে পরিস্ফুট করা হয় বলিয়া ইহাকে, 'নৃত্যের ভাষা' (Language of gesture) বলা হইয়া থাকে।

ভরত বিংশতি প্রকার করকর্মের উল্লেখ করিয়াছেন—উৎকর্ষণ বিকর্ষণ, ব্যাকর্ষণ, পরিগ্রহ, নিগ্রহ, আহ্বান, তোদন, সংশ্লেষ, বিয়োগ, রক্ষণ, মোক্ষণ, বিক্ষেপ, ধূনন, বিসর্গ, তর্জন, ছেদন, ভেদন, স্ফোটন, মোটন ও তাড়ন। নাট্যতত্ত্বাশ্রিত হস্তপ্রচার ত্রিবিধ—উত্তান, পার্শ্বগ ও অধোমুখ।

সকল প্রকার হস্তপ্রচারই প্রয়োগকালে নেত্র, ভ্রূ ও মুখরাগাদির দ্বারা যথাবিধি ব্যঞ্জনাযুক্ত করিতে হইবে। উত্তম নটগণ (রাজা, অমাত্য বিদূষক প্রভৃতি) উত্তমবস্তুর (দেবতা, গুরু, নৃপ প্রভৃতির) নির্দেশে অঞ্জলি হস্ত প্রভৃতি ললাটদেশে স্থাপন করিবেন। মধ্যম নটগণ অধমবস্তুর নির্দেশে বক্ষঃস্থলে চতুরাদি হস্ত স্থাপন করিবেন এবং অধম নটগণ অধমবস্তুর নির্দেশে শুকতুণ্ডাদি হস্ত অধোগত করিয়া স্থাপন করিবেন।

তবে চন্দ্রতারাদি দর্শনে অধমেরও ললাটদেশে হস্ত স্থাপন করা বিধিবিরুদ্ধ নহে। উত্তম নট অল্প হস্ত প্রচার করিবেন, মধ্যম নট অপেক্ষাকৃত বেশী এবং অধম নট সর্বাপেক্ষা বেশী করিবেন। বিষয়ে, মূর্চ্ছায়, লজ্জায়, জুগুপ্সায়, শোকে, পীড়ায়, গ্লানিতে, নিদ্রায় হস্তের বিকল অবস্থায়, নিশ্চেষ্ট অবস্থায়, তন্দ্রায়, জড়তায়, ব্যাধিগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, ভয়ার্ত, শীতার্ত, মত্ত, প্রমত্ত ও উন্মত্ত অবস্থায়, চিন্তায়, তপস্যায়, তুষার-পাতে, আচ্ছন্ন অবস্থায়, বদ্ধ অবস্থায়, জলপ্লাবনে, নিদ্রার ভানে হস্তাভিনয় হইবে না। অর্থাৎ উক্ত ক্ষেত্রসমূহে বাহ্য দ্রব্যগুণাদির (কমল, ভ্রমর প্রভৃতির) হস্তাভিনয় নিষিদ্ধ। কিন্তু যে হস্তপ্রচারগুলি অন্তরের স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির সূচনা করে, তাহা নিষিদ্ধ নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কপোতের ন্যায় ভয়, কর্কটের ন্যায় মদন বিজৃম্ভণ, শুকতুণ্ডের ন্যায় ঈর্ষ্যাদির প্রকাশক হস্তপ্রচার বিধিসম্মত।

ভরতের মতে নাট্যতত্ত্বসমাশ্রিত হস্তপ্রচার তিনপ্রকার—উত্তান, পার্শ্বগ ও অধোমুখ। অন্যমতে (ভট্টোদ্ভট্ট) পাঁচ প্রকার—উত্তান, বর্তুল, ত্র্যস্র, স্থিত ও অধোমুখ।

ভরত নৃত্তসমাশ্রিত হস্তের প্রয়োগকে 'নৃত্তহস্ত' বলিয়াছেন। ত্রিংশ প্রকার নৃত্তহস্তের নাম পাওয়া যায়।

চতুরস্র—বক্ষ হইতে অষ্ট অঙ্গুলি দূরত্বে দুই হস্তের খটকামুখ যদি অধোমুখী হয় এবং অংস (স্কন্ধ) ও কূর্পর (কনুই) সমরেখায় থাকে, তাহা হইলে 'চতুরস্র' হস্ত হয়।

উদ্বৃত্ত—হংসপক্ষ হস্তদ্বয় যদি তালবৃন্তের ন্যায় ব্যাবৃত হয়, তাহা হইলে 'উদ্বৃত্ত' হয়।

তলমুখ—চতুরস্র হস্তকে হংসপক্ষ করিয়া তির্যগ্‌ভাবে অভিমুখী করিয়া রাখিলে 'তলমুখ' হয়। অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন মর্দল, এবং মধুর বাদ্যপ্রভৃতিতে ইহা প্রযোজ্য।

স্বস্তিক—তলমুখকে মণিবন্ধে স্বস্তিকাকারে রাখিলে 'স্বস্তিক' হয়।

বিপ্রকীর্ণ—স্বস্তিক বিচ্যুত করিলে 'বিপ্রকীর্ণ' হয়।

অরালখটকামুখ—স্বস্তিকের ন্যায় পতাক হস্ত করিয়া অলপল্লবের দ্বারা ব্যবর্তন করিতে হইবে। পরে সেই হস্তদ্বয়কে উর্ধ্বমুখে পদ্মকোশ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গেই 'অরালে' আবর্তন করিয়া একটি 'অরাল' অপরটি চতুরস্রের দ্বারা 'খটকামুখ' করিলে 'অরালখটকামুখ' হয়। কেহ কেহ বলেন, চতুরস্রের পরিবর্তে স্বস্তিকও ব্যবহার করা যায়। অপরমতে, পূর্বে দুইটি 'অরাল' করিতে হইবে এবং পরে অরাল দুইটিকে 'খটকামুখ' করিতে হইবে। ভরত বলিয়াছেন, মতান্তরে মণিবন্ধে অরাল হস্তদ্বয়কে বিচ্যুত করিলে 'অরালখটকা' হয়।

আবিদ্ধবক্ত্র—বাহু, স্কন্ধ ও কনুইর অগ্রভাগ (পতাক হস্তে) বক্র করিয়া আবর্তন করিলে এবং অধোমুখতল যুক্ত করিলে আবিদ্ধবক্ত্র হয়।

সূচীমুখ—সর্পশীর্ষ হস্তদ্বয়ের মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠকে যুক্ত করিয়া হস্তদ্বয়কে তির্যগ্‌ভাবে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত করিলে 'সূচীমুখ' হয়।

রেচিত—হংসপক্ষদ্বয়কে দ্রুত ভ্রমণ করাইয়া উত্তান করিয়া তলদেশ প্রসারিত করিলে 'রেচিত' হয়।

অর্ধরেচিত—বামহস্ত চতুরস্রে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত 'রেচিত' হইলে 'অর্ধরেচিত' হয়।

উত্তানবঞ্চিত—কূর্পর ও অংস কিঞ্চিৎ সঞ্চালনপূর্বক দুই হস্তে ত্রিপতাক করিয়া তির্যগ্‌ভাবে রাখিলে 'উত্তানবঞ্চিত' হয়।

পল্লব—পতাক হস্তদ্বয় মণিবন্ধ হইতে বিচ্যুত করিলে 'পল্লব' হয়।

নিতম্ব—পতাক হস্তদ্বয়কে স্কন্ধদেশ হইতে পর্যায়ক্রমে উত্তান ও অধোমুখভাবে নিষ্ক্রান্ত করিয়া নিতম্বদেশে পর্য্যায়ক্রমে স্থাপন করিলে 'নিতম্ব' হয়।

কেশবন্ধ—কেশদেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া এবং পার্শ্বদেশ হইতে উত্থিত করিয়া (পতাক, ত্রিপতাক, অলপল্লব) হস্তদ্বয় পর্যায়ক্রমে উপরে ও নীচে চালনা করিলে 'কেশবন্ধ' হয়।

লতা—পতাক হস্তদ্বয় তির্যগ্‌ভাবে প্রসারিত হইলে 'লতা' হয়।

করিহস্ত—যদি সমুন্নত লতাহস্ত একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে বিলোলিতভাবে (দোলায়িত) লওয়া হয় এবং অপর হস্ত কর্ণোপরি ত্রিপতাক করা হয়, তাহা হইলে 'করিহস্ত' হয়।

পক্ষবাঞ্চত—করিহস্তদ্বয়কে ত্রিপতাক করিলে 'পক্ষবঞ্চিত' হয়।

গরুড়পক্ষ—ত্রিপতাক হস্তদ্বয়কে নিতম্বক্ষেত্রে রাখিয়া করতলযুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ বেগে ঊর্ধ্বগমন করাইলে 'গরুড়পক্ষ' হয়।

দণ্ডপক্ষ—হস্তদ্বয় হংসপক্ষ করিয়া ব্যাবৃত, পরিবর্তিত এবং প্রসারিত করিলে 'দণ্ডপক্ষ' হয়।

ঊর্ধ্বমণ্ডল—পতাক হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বদেশে (ললাটদেশে) বিবর্তন করাইলে 'ঊর্ধ্বমণ্ডল' হয়।

পক্ষপ্রদ্যোতক—পক্ষবঞ্চিত হস্তদ্বয়কে পরাবৃত্ত (পশ্চাদ্‌বর্তী) করিলে 'পক্ষপ্রদ্যোতক' হয়।

পার্শ্বমণ্ডল—পতাক হস্তদ্বয় ঊর্ধ্বদেশ হইতে পার্শ্বদেশে ভ্রমণ করাইলে 'পার্শ্বমণ্ডল' হয়।

উরোমণ্ডল—একটি উদ্বেষ্টিত ও অপরটি পার্শ্বে আবেষ্টিত হইয়া বক্ষোদেশে স্থাপিত হইলে 'উরোমণ্ডল' হয়।

পার্শ্বার্ধমণ্ডল—অলপল্লব ও অরাল হস্তকে বক্ষোদেশ হইতে উত্থিত করিয়া অর্ধভ্রামণ পূর্বক পার্শ্বে অবস্থান করাইলে 'পার্শ্বার্ধমণ্ডল' হয়।

মুষ্টিস্বস্তিক—হস্ত দুইটি মণিবন্ধের অন্তে রাখিয়া একটি হাত কুঞ্চিত অরাল-বর্তন এবং অপরটি অঞ্চিত অলপল্লববর্তন করিতে হইবে।

অলপদ্মক—অলপল্লবকে যদি বক্ষোদেশ হইতে উদ্বেষ্টিত করিয়া স্কন্ধদেশ পর্যন্ত উত্থিত করা হয়, তাহা হইলে 'অলপদ্মক' হয়।

নলিনীপদ্মকোশ—পদ্মকোশ হস্ত যদি ব্যাবৃত ও পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে 'নলিনীপদ্মকোশ' হয়।

১৫

উল্বণ—বক্ষোদেশ হইতে উদ্বেষ্টিত, প্রধানভাবে উর্ধ্বস্কন্ধদেশে প্রসারিত ও আবিদ্ধ 'অলপল্লব' হস্তদ্বয় স্কন্ধাভিমুখে চঞ্চল অঙ্গুলিযুক্ত হইলে 'উল্বণ' হয়।

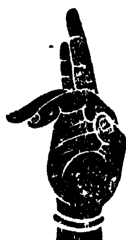
ললিত—পল্লবকে শিরোদেশে স্থাপিত করিলে 'ললিত' হয়।

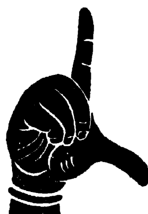
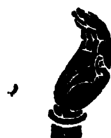
বলিত—লতাহস্তকে কূর্পরস্থানে স্বস্তিক করিলে 'বলিত' হয়।

অসংযুত হস্ত

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণ দীপিকা
পতাক···		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	
ত্রিপতাক···		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	
কর্তরীমুখ···			

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণ দীপিকা
অর্ধপতাক…	×		×
ময়ূর			×
'অর্ধচন্দ্র'	অঃ দপর্ণের সর্পশীর্ষের ন্যায়		
অরাল		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণ দীপিকা
শুকতুণ্ড…		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	
মুষ্টি…		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	একই প্রকার (নাঃ শাঃ)
শিখর·		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	
কপিত্থ·		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণ দীপিকা
কটকামুখ···			
সূচী···			
চন্দ্রকলা···	×		×
সর্পশীর্ষ···			একই প্রকার (অঃ দঃ)
পদ্মকোশ···		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	×

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণ দীপিকা
মৃগশীর্ষ…!		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	
সিংহমুখ…	×	হস্তলক্ষণ দীপিকার মৃগশীর্ষের ন্যায়	×
কাঙ্গুল…		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	×
অলপল্লব…			×
পল্লব	×	×	অঃ দঃ চতুরের ন্যায়
চতুর…			×

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণ দীপিকা
ভ্রমর···		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	
হংসাস্য···			একই প্রকার (নাঃ শাঃ)
হংসপক্ষ···		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	
সন্দংশ···			×
মুদ্রাক···	×	×	

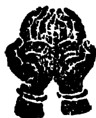
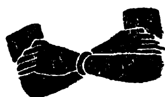
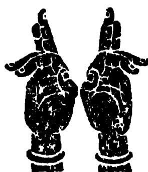
নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণ দীপিকা
মুকুল ··	সন্দংশের ন্যায় (অঃ দঃ)	একই প্রকার (নাঃ শাঃ)	একই প্রকার
ঊর্ণনাভ···		×	(একই প্রকার নাঃ শাঃ)
তাম্রচূড়···	 (১ম মত)  (২য় মত)		×
ত্রিশূল···	×		×
অঞ্জলি···	×	×	
মুকুর···	×	×	

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণ দীপিকা
বর্ধমানক···	×	×	
কটকা ··	×	×	নাঃ শাস্ত্রের কটকামুখের ন্যায়

সংযুত হস্ত

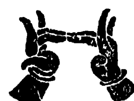
নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ
অঞ্জলি···		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)
কপোত···		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)
কর্কট···		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ
স্বস্তিক...		
খটকাবর্ধমানক		×
উৎসঙ্গ ..		×
নিষধ...	 ১ম মত  ২য় মত (নাঃ শাঃ)	
দোল হস্ত ..		নাট্যশাস্ত্রের ন্যায় পতাক হস্তদ্বয় উরুদেশে স্থাপন করিতে হইবে।

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ
পুষ্পপুট ··		একই প্রকার (নাঃ শাঃ)
মকর···		×
গজদন্ত···		×
অবহিত্থ···		×
বর্ধমান···		×

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ
শিবলিঙ্গ···	×	
কর্তরীস্বস্তিক···	×	
কটকাবর্ধন	×	
শকট ··	×	
শঙ্খ···	×	

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ
চক্র···	×	
সম্পুট ··	×	
পাশ ··	×	
কীলক···	×	
মৎস্য···	×	
কূর্ম···	×	

নাম	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ
বরাহ ··	×	
গরুড় ··	×	
নাগবন্ধ···	×	
খট্বা···	×	
ভেরুণ্ড	×	
উৎসঙ্গ	×	গজদন্তের ন্যায় (সর্পশীর্ষের পরিবর্তে মৃগশীর্ষ)

নৃত্যের প্রকার ভেদ

"ব্যরীরচৎ ত্রয়মিদং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্।
কীর্তি-প্রাগল্‌ভ্য-সৌভাগ্য-বৈদগ্‌ধ্যানাং প্রবর্ধনম্।
ঔদার্য-স্থৈর্য-ধৈর্যাণাং বিলাসস্থ চ কারণম্॥"

নৃত্যের প্রকার ভেদ

সাধারণতঃ নৃত্যের জগতে আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। প্রাচীনকালে নৃত্যগুরুগণ ভরতের নাট্যশাস্ত্রকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করিতেন এবং ভারতীয় নৃত্য নাট্যশাস্ত্রের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছিল।

ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"নাট্যস্থ নটবৃত্তস্থ শাস্ত্রং শাসনোপায়ং গ্রন্থং প্রবক্ষ্যামীতি।" "নাট্যবেদঃ নাট্যশাস্ত্রম্"। সুতরাং নাট্যের অর্থাৎ নটবৃত্তির অনুশাসন যাহাতে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই নাট্যশাস্ত্র। পক্ষান্তরে তিনি নাট্যবেদকেই নাট্যশাস্ত্র বলিয়াছেন। নাট্যাচার্য ভরত গন্ধর্ববেদ ও নাট্যবেদের বিশ্লেষণে বলিয়াছেন, যাহা গীতপ্রধান তাহা গন্ধর্ববেদ এবং যাহা অভিনয়প্রধান তাহা নাট্যবেদ।

এই নাট্যবেদ বা নাট্যশাস্ত্র ব্রহ্মা কর্তৃক উক্ত ও ভরত কর্তৃক যথাযথ পরিপাটির সহিত নিরূপিত। নন্দীকেশ্বরের অভিনয় দর্পণও একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যশাস্ত্র। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতগুণীরূপে দ্রুহিণ, সদাশিব, ব্রহ্মভরত, তণ্ডু প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। সঙ্গীতমেরুতে কোহলও নিম্নলিখিত সঙ্গীতাচার্যদিগের নাম করিয়াছেন—ভট্ট তণ্ডু, শম্ভু, সুমন্ত, পুরারি, ক্ষেমরাজ, লোহিত ভট্ট ইত্যাদি। শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরেও এই সকল গুণীদিগের নাম পাওয়া যায়—ভরত, কাশ্যপ, মতঙ্গ, যাষ্টিক, শার্দুল, কোহল, বিশাখিল, দত্তিল, কম্বল, অশ্বতর, বায়ু, বিশ্ববসু, অর্জুন, নারদ, তম্বরু, অঞ্জনেয়, মাতৃগুপ্ত, স্বাতী, গুণ, বিন্দুরাজ, ক্ষেত্ররাজ, রাহুল, রুদ্রত, নান্যভূপাল, ভোজরাজ, সোমেশ, মহীপতি ইত্যাদি। সঙ্গীত মকরন্দেও এই সকল গুণীর নাম পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ তেলাঙ্ নাট্যশাস্ত্রকার হিসাবে পাঁচজন ভরতের অনুমান করিয়াছেন—আদি ভরত, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, দত্তিল ভরত, কোহল ভরত ও যাষ্টিক ভরত। রামকৃষ্ণ তেলাঙ্ ইঁহাদেরই 'পঞ্চ



কথাকলির
রূপসজ্জা

তামিলনাদের থেরুকুথু নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য। সাধারণত পথের উপর এই নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হ





ইন্দোনেশীয় নৃত্যের একটি মনোরম ভঙ্গি

সিংহলের মুখোস নৃত্যে রাজা ও রাণীর ভূমিকায় দুইজন নৃত্যশিল্পী



ভরত' আখ্যা দিয়াছেন। শারদাতনয় ছয়জন ভরতের নামোল্লেখ করিয়াছেন—নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, নন্দী ভরত, মতঙ্গ ভরত, কশ্যপ ভরত, কোহল ভরত ও তণ্ডু ভরত। ডাঃ রাঘবন 'পঞ্চভারতীয়ম্' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একশত পুত্রের ভিতর কোহল, দত্তিল ও তণ্ডুর নাম পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রে আছে যে, ভরতের এই একশত পুত্রের দ্বারাই মর্তে নাট্য প্রচলিত হয়। এই প্রসঙ্গে মুনিগণ ভরতকে প্রশ্ন করেন—'মানবগণ অসম সাহসিক কার্যাবলী দ্বারা নাট্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব এই বিষয়ে যে বস্তু মানবসমাজ হইতে গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করুন। পূর্বরঙ্গে যে সকল দেবতাগণকে আবাহণ করিয়া পূজা করা হয়, তাঁহাদের বিষয়েও আমরা অবগত হইতে চাহি। পূর্বরঙ্গে কুতপবাদ্যের অবতারণা কেন করা হয় এবং ইহাতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়? ইহাতে কোন্ দেবতা তুষ্ট হন এবং তুষ্ট হইলে কা উপকার করেন? নাট্যাচার্য শুদ্ধভাবে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া রঙ্গপূজার উদ্দেশ্যে বারিসিঞ্চন করেন কেন? নাট্য স্বর্গ হইতে মর্তে কিরূপে আসিল? আপনার বংশধরগণ শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইলেন কেন? মুনিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভরত একে একে এইসকল প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন—'আমি পূর্বে পূর্বরঙ্গতে যাহা বলিয়াছি তাহাতে বিঘ্ননাশের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ম যেরূপ ক্ষেপণাস্ত্র হইতে দেহকে রক্ষা করে, হোমও সেইরূপ পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে। এইরূপে জপ, হোম স্তুতি, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা দেবতাগণের কার্যাবলী ও গুণাবলীর প্রশংসা করিলে তাঁহারা তুষ্ট হইয়া বলেন—আমরা তোমার অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে প্রীত হইয়াছি। ইহা দেবতা ও অসুরগণকে আনন্দদানের পর জনচিত্তে আনন্দ দান করে বলিয়া ইহাকে 'নান্দী' বলা হউক। যখন গীত ও বাদ্যের মাধ্যমে এই সকল শুভসূচক বাক্য উচ্চারিত হইয়া সেই স্থানকে প্রতিধ্বনিত করে, তখন সকল অমঙ্গল দূরীভূত হইয়া সৌভাগ্য সূচিত

হয়। ইহা (নান্দী) বেদমন্ত্রের মতই কার্যকরী। দেবরাজ ও শঙ্করের নিকট শুনিয়াছি সঙ্গীত, জপ ও পূতবারিতে স্নান অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। মঞ্চে প্রণাম করিতে করিতে নাট্যাচার্যের ক্লান্তি আসে বলিয়া পবিত্র বারি সিঞ্চনের বিধি আছে। বারিসিঞ্চনের পর নাট্যাচার্য মন্ত্র দ্বারা জর্জর পূজা করিবেন।

নাট্য স্বর্গ হইতে মর্তে কিরূপে প্রচার হইল সেই সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত বলিব। আমার পুত্রগণ নাট্যবেদে বিশেষভাবে পারদর্শী হইয়া জ্ঞানমদে মত্ত হয় এবং হাস্য রসাত্মক প্রহসন দ্বারা জনসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করে। একদা তাহারা একটি জনসভাতে মুনিগণকে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে অনুকরণ করিয়া দুষ্ট কার্যাবলী অভিনয় করে। ইহাতে গ্রাম্য আচার ব্যবহার অনুকরণ করা হয় এবং ইহার বিষয়বস্তু যেমন নিষ্ঠুর তেমন অসাধু ছিল। এইজন্য কেহই ইহাকে সমর্থন করে নাই। এইরূপ নাট্যে ঋষিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাদের এইরূপ উপহসিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মুনিগণ বলেন, যে বিদ্যার (নাট্যের) গর্বে গর্বিত হইয়া তোমরা স্বেচ্ছাচারিতা আরম্ভ করিয়াছ, সেই কুবিদ্যা ধ্বংস হইবে। মুনি ও ব্রাহ্মণগণের নিকট তোমরা বেদের অনুগামী বলিয়া স্বীকৃতি পাইবে না এবং তোমরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের কার্যাবলী অনুসরণ করিবে। তোমাদের বংশধরগণ অশুদ্ধ এবং নর্তক হইবে। তাহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণসহ তাহারা অন্যের দাসত্ব করিবে।

দেবতাগণ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মুনিগণকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন। দেবতাগণ ইন্দ্রকে মুখপাত্র করিয়া মুনিগণকে বলিলেন, দুঃখকষ্টে জর্জরিত হইয়া নাট্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ঋষিগণ বলিলেন, ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু অভিশাপের অবশিষ্ট অংশ কার্যকরী হইবে।

এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ভরতপুত্রগণ জীবন ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন এবং ভরতকে বলিলেন, আমরা তোমার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত

হইয়া নাট্যদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলাম। ভরত সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, ঋষিবাক্য অসত্য হয় না। সুতরাং তোমরা আত্মহত্যা করিও না। তবে তোমরা ইহাকে প্রচার করিবার জন্য তোমাদের শিষ্য ও বংশধরগণকে শিক্ষা দাও। স্মরণ রাখিও, এই নাট্যকলা ব্রহ্মা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে এবং অত্যন্ত কষ্টে ইহার উদ্ভাবন হইয়াছে ও বেদে ইহার মূল নিহিত রহিয়াছে। আমি অপ্সরাদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, তোমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

রাজা নহুষ পরবর্তীকালে নিজের ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা ও যাগযজ্ঞাদির বলে স্বর্গের অধিপতি হন। গন্ধর্বগণের গান্ধর্ববিদ্যা ও দেবতাগণের নাট্যকলা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি ইহা অপ্সরাগণ দ্বারা নিজ প্রাসাদে অভিনয় করাইবার জন্য করজোড়ে দেবতাগণের নিকট নিবেদন করেন। উত্তরে দেবতাগণ বৃহস্পতিকে মুখপাত্র করিয়া বলিলেন যে, মনুষ্যের সহিত স্বর্গের কন্যাগণের সাক্ষাতের নিয়ম নাই। স্বর্গের অধিপতি হিসাবে আমরা আপনাকে এই উপদেশ দিতেছি যে, আপনি নাট্যাচার্যকে আপনার সন্তুষ্টির জন্য প্রাসাদে লইয়া যান। তদানুসারে এই নাট্যকলা মর্তে প্রচার করিবার জন্য নহুষ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভরতকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—আমার পিতামহের প্রাসাদের অন্তঃপুরে পুরনারীগণকে উর্ব্বশী এই কলার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু উর্ব্বশীর অন্তর্ধানে আমার পিতামহ যখন বিরহে অস্থির হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন তখন এই নাট্যকলা লুপ্ত হইয়া গেল। যাহাতে বিশেষ বিশেষ তিথিতে যজ্ঞের সময় মর্তে এই নাট্যকলা অনুষ্ঠিত হইয়া সুখ ও শুভ সূচনা করে তাহাই আমার ইচ্ছা। ইহাতে আপনার খ্যাতি বিস্তার লাভ করিবে। ইহা শুনিয়া ভরত তাঁহার শতপুত্রকে শাপমুক্ত করিবার জন্য এবং নাট্যকলা প্রচারের জন্য মর্তে প্রেরণ করেন।

খৃঃ পূঃ ছয় শত বৎসর পূর্ব হইতে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে সঙ্গীত গ্রন্থগুলির রচনাকাল সাধারণভাবে উল্লেখ করা যাইতে

পারে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের নাট্যশাস্ত্রের ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থে নারদ কৃত 'নারদীয় শিক্ষা'কে সঙ্গীত বিষয়ে প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা হইয়াছে এবং ইহার রচনাকাল খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী নিরূপিত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে পাণিনি রচিত পাণিনীয় শিক্ষায় কৃশাশ্ব ও শিলালি রচিত নটসূত্রের উল্লেখ পাই। এই নটসূত্রের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তিনজন সঙ্গীতগুণীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা হইতেছেন ভরত, নন্দীকেশ্বর ও কোহল। ইঁহাদের রচিত সঙ্গীতগ্রন্থগুলি হইতেছে যথাক্রমে নাট্যশাস্ত্র, অভিনয় দর্পণ, সঙ্গীতমেরু ও তাললক্ষণ। এই প্রসঙ্গে দত্তিলের 'দত্তিলম্' গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত 'বায়ু পুরাণে' সঙ্গীতের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দীর ভিতর মতঙ্গ 'বৃহদ্দেশী' রচনা করেন। খৃষ্টীয় দশম শতকে অভিনব গুপ্ত কর্তৃক 'অভিনব ভারতী'তে নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা হয়। একাদশ শতাব্দীতে নারদ (২য়) 'সঙ্গীত মকরন্দ' রচনা করেন। এই শতাব্দীতেই শারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশন' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব কর্তৃক 'সঙ্গীতরত্নাকর' ও পার্শ্বদেব কর্তৃক 'সঙ্গীতসময়সার' রচিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কল্লিনাথ সঙ্গীতরত্নাকরের টীকা লেখেন এবং শুভঙ্কর কর্তৃক 'সঙ্গীতদামোদর'ও রচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দামোদর মিশ্রের 'সঙ্গীত দর্পণ' ও অহোবলের 'সঙ্গীত পারিজাত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[১]পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্য নাট্যশাস্ত্র উপযোগী, কিন্তু কিরূপে ইহার প্রাপ্তি হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সাধু ও নৃপতিগণের চরিত্র রূপায়ণ নিরীক্ষণ করিয়া ধর্মভাবের উদয় হয়। এইরূপে ধর্মপ্রাপ্তি হয়। তাঁহাদের চরিত্র অভিনয় করিয়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম সাফল্য লাভ করা যায়। জীবনের এই সাফল্যই হইতেছে অর্থ

১। পুরুষের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চারিটিকে এক কথায় চতুর্বর্গ বলে।

অর্থাৎ প্রয়োজন। সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রমণীগণ আত্মসমর্পণ করেন। ইহাই হইতেছে কাম। শিব অর্থাৎ সুন্দরকে পূজা করিয়া চরম জ্ঞানলাভ করা যায় এবং এই জ্ঞান হইতেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এইরূপে নাট্যের দ্বারাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করা যায়। ইহার মাধ্যমে সর্বপ্রকার জ্ঞান, শিল্পকলাদি ও কর্ম রূপায়িত হয়। ভরত নাট্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, দুঃখার্ত, শ্রমার্ত, শোকার্ত ও তপস্বীজনের চিত্ত বিনোদনের জন্য ইহার সৃষ্টি। ইহা ধর্ম, যশ, আয়ু ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং জনসাধারণকে নানাভাবে উপদেশ দান করে। ভরত ও নন্দীকেশ্বর উভয়েই বলিয়াছেন যে, নাট্য এবং নৃত্য সর্বদা যদি সম্ভব না হয়, তবে পর্বকালে অবশ্য দর্শনীয়। রাজ্যাভিষেকে, বিবাহে, প্রিয়সঙ্গমে, নগর প্রবেশে, পুত্রজন্ম প্রভৃতি মঙ্গলকার্যে ইহা অবশ্য করণীয়।

নাট্য ও নৃত্যকে দৃশ্যকাব্য বলে। দৃশ্য কাব্য দুই প্রকার—বাক্যার্থাভিনয় ও পদার্থাভিনয়। নাট্যকে বাক্যার্থাভিনয় বলা হইয়াছে। কারণ ইহা রসপ্রধান। নৃত্যকে পদার্থাভিনয় বলা হইয়াছে। কারণ ইহা ভাবপ্রধান। নাট্যকে অবস্থানুকৃতিও বলা হইয়াছে। ইহা রসাধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। ভরতের মতে অভিনয়ের লক্ষণ দুই প্রকার—লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী। শার্ঙ্গদেবের মতে লোক ধর্মীর দুইটি ভেদ—'চিত্তবৃত্ত্যর্পিকা' ও 'বাহ্যবস্ত্বনুকারিণী'। চিত্তবৃত্ত্যর্পিকা চিত্তবৃত্তিকে প্রকাশ করে; যথা গর্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি বুঝাইতে নট শিরে পতাক হস্তের প্রয়োগ করেন। বাহ্যবস্তু অনুকরণ করিলে তাহা বাহ্যবস্ত্বনুকারিণী হয়। যথা—পদ্মকোশ হস্তের দ্বারা কমল প্রভৃতির অনুকরণ; নাট্যধর্মী হইতেছে সৌকুমার্যাত্মিকা, কৈশিকী-বৃত্তি আশ্রিতা। ইহাতে দুইপ্রকার ভেদ রহিয়াছে—একটিতে বিশুদ্ধ কৈশিকীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে, অপরটিতে আংশিক লোকবৃত্তির আশ্রয় লইতে হইবে। ভরত নাট্যধর্মী ও লোকধর্মী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—নাট্যধর্মীতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অতিক্রম করিয়া প্রয়োজনানুরূপ ঘটনার কল্পনা করা হয় এবং

ইহাতে স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির বিপরীত রূপায়ণেরও অবকাশ আছে। ইহাতে বিভিন্নপ্রকার অঙ্গহারাভিনয়ের প্রাধান্য বিদ্যমান। স্ত্রী ও পুরুষ একে অন্যের ভূমিকায় চরিত্রোচিত কণ্ঠে অভিনয় করিতে পারেন। লোকধর্মী সম্বন্ধে ভরত বলিয়াছেন—এই নাট্যে স্থায়ী, ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাবগুলি যথাস্থানে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে স্বকল্প ও বিকল্প রূপগুলিও শুদ্ধভাবে প্রযোজ্য। ইহা বর্তনাদি অঙ্গহার বিবর্জিত এবং ইহাতে [1]লোকপ্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত বিশুদ্ধভাবে রূপায়িত হয়। ইহাতে স্ত্রী ও পুরুষ নিজ নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং ইহাতে সঙ্গীতের প্রাচুর্য থাকে। আঙ্গিকাভিনয়ে ধর্মীর দুটি ভেদই প্রদর্শিত হয়। বাচিকাভিনয় হইতেছে লোকধর্মী। কিন্তু ইহা যখন রাগবদ্ধ হইয়া আঙ্গিকাভিনয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা নাট্যধর্মী। আহার্যাভিনয়ে হার, কেয়ুরাদিভূষণ লোকধর্মী। কিন্তু ফুৎকৃত ধ্বজযানাদিভূষণ হইতেছে নাট্যধর্মী। সাত্ত্বিকাভিনয়েও নটের দ্বারা প্রদর্শিত স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিকভাব লোকধর্মী। কিন্তু এই সাত্ত্বিক-ভাবগুলি হস্তাভিনয়ের দ্বারা প্রদর্শিত হইলে নাট্যধর্মী হয়।

নাট্যের প্রয়োগে সন্তুষ্ট হইয়া নাট্যকে সম্যক সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য দেবতাগণ নানা উপকরণ দ্বারা ভরতের পুত্রগণকে সাহায্য করেন। শক্র দিলেন 'ধ্বজ', ব্রহ্মা দিলেন 'কুটিলক' (বিদূষকের ব্যবহারের উপযোগী জলপাত্র), সূর্য দিলেন 'ছত্র', শিব দিলেন 'সিদ্ধি', পবন দিলেন 'ব্যজন', বিষ্ণু দিলেন 'সিংহাসন', কুবের দিলেন 'মুকুট', সরস্বতী দিলেন অভিনয়ের 'বাণী', অবশিষ্ট দেবগণ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব ও পন্নগগণ দিলেন ভাব, রস, রূপ, বল প্রভৃতি।

পূর্বরঙ্গবিধি শ্রবণ করিবার পর মুনিগণ ভরতকে পাঁচটি প্রশ্ন করেন নাট্যসম্বন্ধে। প্রথম প্রশ্ন হইতেছে নাট্যবিচক্ষণগণ নাট্যে রসের ব্যাখ্যা কিরূপে করিয়াছেন? ভাব কাহাকে বলে এবং তাহাতে কি ভাবায়? সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্ত কাহাকে বলে? তাঁহাদের প্রশ্ন শুনিয়া

---

(১) ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও লোকাচার প্রসিদ্ধ।

ভরত তাহার উত্তর দিয়াছিলেন নিম্নরূপ—সূত্র ও ভাষ্যের বিস্তারিত বর্ণনার সংক্ষেপকে 'কারিকা' বলা হয়। রস ও ভাব সম্বন্ধে রসাধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে। রস, ভাব, অভিনয়, ধর্ম, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, আতোদ্য, গান ও রঙ্গ হইল নাট্যের 'সংগ্রহ'। পূর্ব সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন করিতে যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহাকে 'নিরুক্ত' বলা হয়।

ভোজের মতে বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও রীতি নিত্য-সম্বন্ধী। নাট্যশাস্ত্রানুসারে চারি প্রকার বৃত্তির উল্লেখ আছে—ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী। 'বৃত্তি' বলিতে চেষ্টা অথবা ক্রিয়াকে বুঝায়। এই চারিটি বৃত্তির উপর নাট্য প্রতিষ্ঠিত—"চতস্রো বৃত্তয়ো হেতা যাসু নাট্যং প্রতিষ্ঠিতম্।" ইহার মধ্যে ভারতী, সাত্ত্বতী ও আরভটী পুরুষের উপযোগী। নীলকণ্ঠ যখন কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ করেন, তখন ভরত তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেই সম্ভব, পুরুষের পক্ষে নহে। ভরত ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা মন হইতে অপ্সরাদিগকে সৃষ্টি করেন এবং এই অপ্সরাগণই কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ করেন। সাহিত্য দর্পণে এই চারিটি বৃত্তির প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"চতস্রো বৃত্তয়ো হেতা সর্বনাট্যস্য মাতৃকাঃ।" সঙ্গীত রত্নাকরে বৃত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ঋগ্বেদ হইতে ভারতী, যজুর্বেদ হইতে সাত্ত্বতী, অথর্ব বেদ হইতে আরভটী ও সামবেদ হইতে কৈশিকীর জন্ম হইয়াছে। ভোজ বলিয়াছেন—বৃত্তি হইতেছে অনুভব। বুদ্ধি হইতে ইহার জন্ম—"চেষ্টা-বিশেষঃ বিন্যাসক্রমঃ।" অভিনব গুপ্ত ইহাকে বলিয়াছেন—'ব্যাপার' এবং আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন—'ব্যবহার"। ভোজ বলিয়াছেন, কাজের ধরণ বা প্রবৃত্তি (mode) হইতেছে 'বৃত্তি'। ডাঃ রাঘবন ইংরাজীতে ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—"Temper and atmosphere of the situation." দেশভেদে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির প্রয়োগ ছিল। দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গার রসযুক্ত কৈশিকী বৃত্তির প্রচলন ছিল। পশ্চিমদেশে ধর্মের প্রাধান্য বলিয়া সাত্ত্বতী বৃত্তির

প্রয়োগ ছিল। উত্তর ভারতে ভারতী, আরভটী ও সামান্য কৈশিকীরও প্রয়োগ ছিল। পূর্ব ভারতে ভারতীর প্রয়োগ ছিল।

ভারতী—ইহা সংস্কৃত বাক্য প্রধান। ইহাকে বাগ্‌বৃত্তিও বলা চলিতে পারে। ইহা সাধারণতঃ পুরুষদিগের করণীয়। বাচিক অভিনয়ের দ্বারা ইহার ভাব প্রকাশিত হয়।

সাত্বতী—ইহা হইতেছে মনের সত্বভাব প্রকাশক। সুতরাং ইহা মনোব্যাপার-প্রধান। ইহা দ্বারা শৌর্য, ত্যাগ, দয়া প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

আরভটী—যাহা কায়সম্ভবা তাহাকে 'আরভটী' বলে। এক কথায় বলা যাইতে পারে, যাহা শরীরের সহিত যুক্ত তাহা আরভটী। মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ প্রভৃতি ব্যক্ত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কৈশিকী—ইহা উল্লাসদীপ্তা এবং শৃঙ্গারনির্ভরা। যাহা সৌকুমার্য দ্বারা মণ্ডিত তাহাকে 'কৈশিকী' বলে। শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, বৃত্তিহীন কাব্য, গীত ও নৃত্য শোভা পায় না।

নাট্যশাস্ত্রে চারিপ্রকার প্রবৃত্তির উল্লেখ আছে, যথা—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ঔড্রমাগধী। কিন্তু প্রবৃত্তি কি? ভরত ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

"পৃথিব্যাং নানাদেশবেষভাষাচারা বার্তাঃ খ্যাপয়তীতি বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিশ্চ নিবেদনে।" অর্থাৎ পৃথিবীর নানাদেশের বেষভূষা, ভাষা ও আচার ব্যবহারের বার্তা প্রচার করে বলিয়াই ভারতী প্রভৃতিকে 'বৃত্তি' বলা হইয়াছে এবং যে যে দেশে যে যে বৃত্তির প্রয়োগের প্রাধান্য ছিল, প্রবৃত্তিগুলির নামকরণ তদনুসারেই হইয়াছে। এখানে প্রবৃত্তি শব্দের দ্বারা জ্ঞানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন—"নিবেদনে নিঃশেষণে বেদনে জ্ঞানে প্রবৃত্তিশব্দঃ।" ভোজ প্রবৃত্তি ও রীতি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—প্রবৃত্তি "বেশ-বিন্যাস-ক্রমঃ" এবং রীতি হইতেছে—"বচন-বিন্যাস-ক্রমঃ।" সিংহভূপাল প্রবৃত্তি বলিতে প্রাদেশিক-ভাষা, ক্রিয়া ও বেশ বলিয়াছেন।

সিদ্ধি বলিতে ভরত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য প্রসঙ্গের কোন স্পৃহণীয় বস্তুর উপলব্ধি হইলে অভিপ্রেত প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যদি তাহার উল্লেখ করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে ‘সিদ্ধি’ বলা হয়। সিদ্ধি দুইপ্রকার ‘দৈবী’ ও ‘মানুষী’। সাহিত্যদর্পণে সিদ্ধি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত একটি উপমেয়ে একাধিক উপমানের গুণ-কথনকে সিদ্ধি বলা হয়। ইহা দেবতা সম্বন্ধে হইলে ‘দৈবী’ এবং মনুষ্য সম্বন্ধে হইলে ‘মানুষী’ হয়।

নাট্য ও নৃত্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধী। উভয়ই অভিনয়কে আশ্রয় করে। অভিনয়কে চারিটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক।

আঙ্গিক—অঙ্গসমূহের দ্বারা নির্দেশিত অভিনয়কে ‘আঙ্গিক’ অভিনয় বলা হয়।

বাচিক—বাক্যের দ্বারা বিরচিত অভিনয়কে ‘বাচিক’ অভিনয় বলা হয়।

আহার্য—শরীরের অলঙ্করণকে ‘আহার্যাভিনয়’ বলা হয়।

সাত্ত্বিক—সাত্ত্বিকভাব দ্বারা নট বিভাবিত হইলে তাহা ‘সাত্ত্বিক’ অভিনয় হয়।

ভরত নৃত্ত ও নৃত্যের ভিতর কোন ভেদ রাখেন নাই। কিন্তু পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রকারগণ নৃত্ত ও নৃত্যের ভিতর প্রভেদ করিয়াছেন। তাঁহারা নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্যকে একত্রে ‘সঙ্গীত’ বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ‘নৃত্ত’ হইতেছে রসাশ্রিত ও ‘নৃত্য’ হইতেছে ভাবাশ্রিত। নাট্যকলা অভিনয়যুক্ত ও অঙ্গহার সমন্বিত হইলে ‘নৃত্য’ বলা হয়। অভিনয়বর্জিত কতকগুলি বাহুল্য অঙ্গহারের সমাবেশ থাকিলে তাহা ‘নৃত্ত’ হয়। তাঁহাদের মতে “গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।”

‘মার্গ’ ও ‘দেশী’ভেদে নৃত্য দুইপ্রকার। ‘মার্গ’ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—“নৃত্যবেদিনাং মার্গশব্দেন প্রসিদ্ধমিতি। দ্রুহিণেন

যদুদ্দিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ। মহাদেবস্য পুরতঃ তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্॥" যাহা দ্রুহিণের (ব্রহ্মার) দ্বারা কথিত, ভরত যাহা মহাদেবের পুরোভাগে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা মার্গ আখ্যা লাভ করিয়াছে। ইহা মুক্তি দান করে। নাট্য, নৃত্য, নৃত্ত, গীত, বাদ্য প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক এবং আহার্য এই চারিপ্রকার অভিনয়যুক্ত ভাবের অভিব্যঞ্জক নৃত্যই 'মার্গ' নামে অভিহিত হয়। আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক, আহার্য এই চতুর্বিধ অভিনয়বর্জিত নৃত্ত 'দেশী' নৃত্য নামে অভিহিত। ভরত 'দেশী' সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।" যাহা দেশে দেশে প্রচলিত তাহাই দেশী সঙ্গীত।

অভিনয় দর্পণে নৃত্যবিধির এইরূপ পরিচয় আছে—

"আস্যেন লম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ।"
"যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥"
"নৃত্তং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবর্তি চ।"

মুখে গান, হস্তের দ্বারা অর্থ প্রদর্শন, নয়নের দ্বারা ভাব এবং পদদ্বয়ের দ্বারা তাল দেখাইতে হয়। যেইখানে হস্ত, সেইখানে দৃষ্টি, যেইখানে দৃষ্টি সেইখানেই মন, যেইখানে মন সেইখানেই ভাব এবং যেইখানে ভাব সেইখানেই রস। নৃত্ত বাদ্যকে অনুসরণ করে ও বাদ্য গীতের অনুসারী হয়।

নাট্যকে দশটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ইহমৃগ, ভাণ, বীথি, প্রহসন। এতদ্ভিন্ন ১৮টি উপরূপক আছে—নাটিকা, প্রেক্ষণ, ভোটক, শটক, গোষ্ঠী, সংলাপক, শিল্পক, ভাণি, হল্লীসক, রাসক, উল্লপক, শ্রীগদিতা, প্রস্থান, নাট্যরাসক,

প্রেষণ, দুরমল্লিকা, শাসিকা ও কাব্য। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশতেই নৃত্যগীতের প্রাধান্য আছে।

কিঞ্চিৎ ধর্মপ্রধান রূপক হইলে 'নাটক' হয়। 'প্রকরণ' হইতেছে ক্রীড়াপ্রধান। 'সমবকার' সৌন্দর্যাত্মক ও ইহাতে কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ হয়। নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, একটিমাত্র পাত্র যখন অঙ্গভঙ্গীর সহিত নৃসিংহ শূকরাদির বর্ণনা করেন, তখন তাহাকে 'ভাণ' বলা হয়। ইহাতে তাললয় সমন্বিত দেশীয় ভাষায় গীতের ব্যবহারও আছে। সঙ্গীতমকরন্দ অনুসারে 'ভাণ' একাঙ্ক নাটিকা। ইহাতে একজন পাত্র থাকে। ইহাতে কৈশিকীবৃত্তি অবলম্বন করা হয় এবং বীর, শৃঙ্গার, শৌর্য, সৌভাগ্য প্রভৃতি সূচিত হয়। শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উপরূপকের ভিতর নাটিকা, রাসক প্রভৃতিতে নৃত্য থাকে। ১৮টি রূপক ব্যতীত ডোম্বিকা, যিদগাক, ভাণিকা, রাসক্রীড়া প্রভৃতি নৃত্যপ্রধান নাট্যেরও উল্লেখ দেখা যায়। ভোজ ১৮টি উপরূপকের ভিতর গোষ্ঠী, নর্তনক ও কাব্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলি নৃত্যপ্রধান। নাটিকার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—"বহুনৃত্যগীত-পাঠ্যা রতিসম্ভোগাত্মিকা চৈব।" নাটিকাতে স্ত্রী চরিত্র বেশী থাকে। ইহা চার অঙ্কবিশিষ্ট এবং ইহাতে বহু নৃত্যগীতের সমাবেশ থাকে—"স্ত্রীপ্রায় চতুরঙ্কিকা।" নায়ক ধীরললিত ও নৃপ হইবেন। নায়িকা নৃপবংশজ, নবানুরাগা অথবা সংগীত-ব্যাপৃতা ও নৃত্যপারদর্শিনী হইবেন।

রাসক—ইহাতে অনেক নর্তকী অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন্নপ্রকার তাললয়ে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ঊর্ধ্বসংখ্যা চৌষট্টিটি যুগল অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। সঙ্গীতদামোদরের মতে ইহা একাঙ্ক, ইহাতে সূত্রধার নাই। তবে ইহা অনেকার্থবাচক নান্দীযুক্ত এবং ইহাতে কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তির যোগ থাকে। সাহিত্য দর্পণে এইরূপ বিবরণ আছে—রাসক পঞ্চপাত্রযুক্ত ও ভাষা[১]-বিভাষা[২] সংযুক্ত হইবে। ইহাতে

(১) মধ্যমপাত্রের ব্যবহার্য ভাষা—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী প্রভৃতি।
(২) হীনপাত্রের ব্যবহার্য ভাষা—চাণ্ডালী, শাবরী প্রভৃতি।

কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তি থাকিবে। ইহা একাঙ্ক, সূত্রধারহীন ও উৎকৃষ্ট নান্দীযুক্ত। ইহাতে খ্যাত নায়িকা ও মূর্খ নায়ক থাকিবে। ইহা উদাত্তভাব সমন্বিত এবং ইহাতে 'মুখ', 'প্রতিমুখ' ও 'সন্ধি' থাকিবে।

নাট্যরাসক—ইহা একাঙ্ক এবং বহু তাললয়সমন্বিত। ইহাতে উদাত্ত নায়ক এবং উপনায়ক থাকিবে ও শৃঙ্গাররসাপ্লুত 'বাসকসজ্জিকা' নায়িকা থাকিবে। ইহা দশপ্রকার লাস্যাঙ্গযুক্ত হইবে। ইহাতে শুধুমাত্র সন্ধি নহে, কখনও কখনও প্রতিমুখও থাকিবে। ভোজের মতে নাট্যরাসক বসন্তকালে শুধুমাত্র রমণীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে অঙ্গহারের সাহায্যে পিণ্ডী ও ভেদ্যক রূপায়িত হয়। সমবেতভাবে এই সকল বিভিন্ন অঙ্গহারের সমাবেশে নানাপ্রকার ভঙ্গী প্রদর্শিত হয়। ভোজ নাট্যরাসককে 'চর্চরী' বলিয়াছেন। হর্ষের 'রত্নাবলীতে' বসন্তকালের নৃত্যকে 'চর্চরী' বলা হইয়াছে। চর্চরীকে একপ্রকার তাল অথবা গীতও বলা হইয়াছে। ভোজের মতে ইহাতে বাদ্যকরগণ ছন্দোবদ্ধ অক্ষর ও সঙ্গীত ব্যবহার করেন। ইহার অন্তে মঙ্গলাচরণ থাকে। কথিত আছে, ক্ষীর সমুদ্রে অমৃত লাভের পর দেবতাগণ আনন্দে এইরূপ নৃত্য করিয়াছিলেন। 'হরবিজয়ে' রাজনক রত্নাকর 'রাসক' অথবা 'নাট্যরাসক'কে 'রাসকঙ্ক' বলিয়াছেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে হল্লীসক ও নাট্যরাসক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"হল্লীসকং ক্রোড়নকৈঃ গায়নৈর্নাট্যরাসকৈঃ।" অর্থাৎ হল্লীসক ক্রীড়াপ্রধান এবং নাট্যরাসক গীতপ্রধান।

বিলাসিকা—ইহা দশলাস্যাঙ্গযুক্ত ও শৃঙ্গারবহুল। ইহাতে বীট, বিদূষক ও পীঠমর্দনের সমাবেশ থাকিবে। ইহা সন্ধি ও নায়ক বর্জিত হইবে। বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ও নেপথ্য (বেশরচনা) অতি উত্তম হইবে। ইহা শৃঙ্গার-প্রধানহেতু দর্শকদিগের মনে শৃঙ্গাররসের সৃষ্টি করে বলিয়াই ইহার নাম 'বিলাসিকা'।

হল্লীসক—মণ্ডলাকারে নৃত্যকে 'হল্লীসক' বলা হয়। ইহাতে

একজন পুরুষনেতা থাকেন এবং অবশিষ্ট সকলেই স্ত্রীলোক। গোপাঙ্গনা দিগকে লইয়া শ্রীহরি এইরূপ নৃত্য করিয়াছিলেন। অলঙ্কার পরিচ্ছেদে ভোজ বলিয়াছেন, দুইটি বিশেষ তালে নাচিলে 'হল্লীসক' নৃত্য 'রাস' নৃত্যে পরিণত হয়,—"তদিদং হল্লীসকমেব তালবন্ধবিশেষযুক্তং রাসম্ এবেত্যুচ্যতে।" সাহিত্যদর্পণে বলা হইয়াছে যে, সপ্তাষ্টাদশ স্ত্রী ও একজন পুরুষ থাকিবেন। ইহা কৈশিকীবৃত্তি সঙ্কুল ও বহুতাললয়-সমন্বিত হইবে। মুখান্তে সন্ধি থাকিবে। 'শৃঙ্গার প্রকাশ' ও নাট্যদর্পণে' একই প্রকার ব্যাখ্যা আছে। ইহাতে সংস্কৃত অথবা শৌরসেনী ভাষা ব্যবহৃত হইবে।

আসারিত—হরিবংশে ও নাট্যশাস্ত্রে 'আসারিত' নৃত্য সম্বন্ধে সামান্য পার্থক্য আছে। হরিবংশে বলা হইয়াছে যে, প্রথম নর্তকী প্রবেশ, অভিনয় প্রদর্শন, তাল ও ছন্দের অনুযায়ী অঙ্গহার প্রয়োগ এবং পরিশেষে দেবতার স্থানে নৃত্য প্রদর্শন। ভরত নাট্যশাস্ত্রের পূর্বরঙ্গ অধ্যায়ে আসারিত নৃত্যের বর্ণনা দিয়াছেন—কুতপবিন্যাসের পর নর্তকী 'আসারিত' নৃত্য করিবে। কুতপবিন্যাসের পর উপোহণ শেষ হইলে নর্তকী ভাণ্ডবাদ্যের তালে তালে বিশুদ্ধ করণ সহযোগে নৃত্য করিবে। ইহার সহিত যে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ হইবে তাহাতে জাতিরাগের বিকাশ থাকিবে। নর্তকী সঙ্গীতের সহিত 'চারীর' প্রয়োগ করিয়া অঞ্জলিতে ফুল লইয়া বৈশাখভঙ্গীতে মঞ্চে প্রবেশ করিবে। হস্ত, পদ, কটিদেশ ও গ্রীবার রেচক প্রদর্শনান্তে, পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর দেবতাদিগকে প্রণাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিবে। এই সময় গীত বা বাদ্যের সমাবেশ থাকিবে না।

নৃত্যে অপরিহার্য কতকগুলি বিষয় আলোচনা করিব।

সৌষ্ঠব—যদি কটিদেশ ও কর্ণ সমরেখায় ও কনুই, স্কন্ধ ও মস্তক সমানভাবে থাকে এবং বক্ষ যদি সমুন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'সৌষ্ঠব' বলে। অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু সমাবেশের নামই 'সৌষ্ঠব'। নৃত্যে ও নাট্যে সৌষ্ঠবহীন অঙ্গ শোভা পায় না। উত্তম ও মধ্যম

পাত্রগণের এই সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ, নৃত্য ও নাট্য সম্পূর্ণভাবে এই সৌষ্ঠবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

রেখা—'রেখা' বলিতে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ভঙ্গী অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথাযথ সন্নিবেশ বুঝায়—"অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতঃ। সৈবোক্তা জনতাচিত্তনয়নানন্দদায়িনী ইতি রেখা।" সঙ্গীতদর্পণ ও সঙ্গীতরত্নাকরে বলা হইয়াছে, মস্তক, নেত্র, কর প্রভৃতি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সমূহের জনচিত্তহারী সন্নিবেশের নাম রেখা। Mirror of Gestureএ অঙ্গসৌষ্ঠব ও অবয়ব সঙ্গতিকে 'রেখা' বলা হইয়াছে।

সন্ন—শার্ঙ্গদেব বলেন, "সন্নং স্বস্থানবিশ্রান্তং নিষণ্ণং স্বচলস্থিতি।" অর্থাৎ স্বস্থানে বিশ্রামরত অবস্থার নাম 'সন্ন' এবং সম্পূর্ণভাবে নিশ্চল অবস্থানের নাম 'নিষণ্ণ'।

কলাস—নৃত্যকালীন সাময়িক বিরতিকে 'কলাস' বলা হয়। ইহাতে বাদকগণ একই সময় নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করিলে পাত্র চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল রহিবেন।

চতুরশ্র—নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, বৈষ্ণবস্থানে যদি হস্তদ্বয় যুগপৎ কটি ও নাভিদেশে সঞ্চালিত হয় এবং বক্ষদেশ সমুন্নত থাকে, তাহা হইলে উহা 'চতুরশ্র' হয়। "কটীনাভিচরৌ হস্তৌ বক্ষশ্চৈব সমুন্নতম্। বৈষ্ণবস্থানমিত্যঙ্গং চতুরশ্রমুদাহৃতম্॥" নৃত্তহস্তের ভিতর মুদ্রার উল্লেখ আছে। চতুরশ্রতালের ও উল্লেখ আছে।

ভ্রমরী—নাট্যশাস্ত্রে ষোড়শপ্রকার চারীর ভিতর একটির নাম 'ভ্রমরী'। সঙ্গীত রত্নাকরে ৩৬ প্রকার উৎপ্লবনের ভিতর ভ্রমরীর উল্লেখ আছে। মতান্তরে ভ্রমরী সমগ্র দেহের ভঙ্গীবিশেষ। পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে যে, সমুদ্রপুত্র জালন্ধর কর্তৃক দেবতাগণ বিতাড়িত হইয়া ব্রহ্মা সহ হরের সমীপে উপস্থিত হন। হর তখন প্রত্যেক দেবতাকে নিজ নিজ তেজ বিকিরণ করিয়া অস্ত্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন। এই-সকল তেজ একত্রীভূত হইলে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে

পারিলেন না। তখন ভগবান শম্ভু হাস্য করিয়া সেই তেজের উপর বাম পদের পার্ষ্ণি দ্বারা ভ্রমরী নৃত্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহেন্দ্রাদি দেবগণ তেজোরাশির উপর শঙ্করকে নৃত্য করিতে দেখিয়া বাদ্যধ্বনি করিলেন। তখন হইতে নৃত্যসমূহের ভিতর ভ্রমরী নৃত্য স্থান লাভ করিল।

চালক—ষোড়শপ্রকার বাহুভঙ্গী যদি শোভমান ভঙ্গীতে চালিত হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে 'চালক' বলা হয়।

শুষ্কবাদ্য—নৃত্যগীতহীন একক বাদ্যই প্রকৃতপক্ষে শুষ্কবাদ্য নামে পরিচিত। গীত বা নৃত্যের বিরামের সময় শুষ্ক বাদ্যের প্রয়োগ হয়।

ভাণ্ডবাদ্য—পুষ্করবাদ্যে প্রদেশিনী (তর্জনী) দ্বারা আঘাত করিলে ভাণ্ডবাদ্য বলিয়া কথিত হয়। অর্থাৎ মৃদঙ্গকে ভাণ্ডবাদ্য বলা হইয়াছে। তৌর্যত্রয়—গীত, বাদ্য ও নৃত্যের একত্র সমাবেশকে তৌর্যত্রয় বলে।

ত্রিবলীবাদ্য—আম্রকাষ্ঠ সমুদ্ভূত বাদ্য বিশেষ। মঙ্গলবিজয়ে অথবা দেবালয়ে বাজান হইয়া থাকে।

তিরিপ—ইহ একপ্রকার ভ্রমরী। তির্যগ্‌ভাবে ঘুরিয়া জঙ্ঘাকে স্বস্তিককরণ করিলে 'তিরিপ' হয়।

নর্তনকে তাণ্ডব ও লাস্য দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায় যে, মহেশ্বর স্বয়ং তাণ্ডব নৃত্য করিয়া বিশেষ সমাদরের সহিত তণ্ডুকে ইহা শিক্ষা দেন এবং গীত ও বাদ্যাদির সাহায্যে ইহা প্রবর্তন করিতে আদেশ করেন। মহেশ্বরের প্রিয় অনুচর তণ্ডুকে লক্ষ্য করিয়া এই নৃত্যের প্রবর্তন হয় বলিয়াই ইহার নাম 'তাণ্ডব'—তণ্ডু + ষ্ণ = তাণ্ডব। যদিও ভরত লাস্য ও তাণ্ডবের প্রয়োগ বিষয়ে নারী পুরুষের অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই, তথাপি দ্বাদশ অধ্যায়ের ২০১ নং শ্লোকে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

"উদ্ধতা যেহঙ্গহারাঃ স্যুর্যাশ্চার্যো মণ্ডলানি বা।
তানি নাট্যপ্রয়োগজ্ঞৈর্ন কর্তব্যানি যোষিতাম্॥"

ভরত বলিয়াছেন—তণ্ডু কর্তৃক প্রযুক্ত শৃঙ্গার-রস-সম্ভব সুকুমার অঙ্গবিক্ষেপের নাম 'তাণ্ডব'। তথাহি "সুকুমার-প্রয়োগশ্চ শৃঙ্গাররস সম্ভবঃ। তস্য তণ্ডুপ্রযুক্তস্য তাণ্ডবস্য বিধিক্রিয়াম্ (সংপ্রবক্ষ্যামীতিশেষঃ)॥" নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনব গুপ্ত তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—

"বর্ধমানক-গীত-তালাভিনয়সম্বন্ধতয়োদিতং তাণ্ডবং বক্ষ্যতীতি।" সুতরাং তাণ্ডব নৃত্যে বর্ধমানক গীত, তাল ও অভিনয় থাকিবে। পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রকারগণ তাণ্ডব ও লাস্যের সুস্পষ্ট ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। সংগীত রত্নাকরে বলা হইয়াছে,—নৃত্ত তাণ্ডব পর্যায়ভুক্ত এবং নৃত্য লাস্যপর্যায়ভুক্ত। বর্ধমানক, আসারিত প্রভৃতি গীত প্রাবেশিকী প্রভৃতি ধ্রুবা, তলপুষ্পপুট প্রভৃতি করণ ও স্থিরহস্ত প্রভৃতি অঙ্গহার সমাযুক্ত তণ্ডু কর্তৃক উদ্ধত প্রয়োগের নাম 'তাণ্ডব' এবং সুকুমার প্রয়োগের নাম 'লাস্য'। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে তাণ্ডবের তিনটি ভেদ—'বিষম,' 'বিকট' ও 'লঘু'। ঋজু ভ্রমণাদিকে তিনি 'বিষম' বলিয়াছেন। বিরূপ বেশ-অবয়ব ব্যাপারকে তিনি 'বিকট' বলিয়াছেন। অল্প করণ প্রয়োগকে তিনি 'লঘু' বলিয়াছেন। শারদাতনয় বলিয়াছেন, তাণ্ডবের অঙ্গহার ও করণ উদ্ধত, বৃত্তি হইতেছে আরভটী। লাস্যের অঙ্গহার কোমল ও সুকুমার। বৃত্তি হইতেছে কৈশিকী। শারদাতনয়ের মতে মধুর ও উদ্ধত ভেদে লাস্য ও তাণ্ডবের ভেদ নির্ণীত হইয়াছে। নট ও নর্তকগণ মিলিয়া রসভাবযুক্ত যে অঙ্গ চালনা করেন, যাহাতে মার্গ (নৃত্য) ও দেশী (নৃত্ত) এই দুইটির মিশ্রণ আছে, যাহাতে অঙ্গহার ও লয়গুলি সুকুমার ভাবযুক্ত, কৈশিকী বৃত্তি ও গীতির যাহাতে প্রাধান্য আছে, তাহাই লাস্য। তাঁহার মতে তাণ্ডব ত্রিবিধ ও লাস্য চারিপ্রকার। 'চণ্ড', 'প্রচণ্ড' ও 'উচ্চণ্ড' হইতেছে তাণ্ডব এবং 'লতা' 'পিণ্ডী', 'ভেত্তক' ও 'শৃঙ্খলক' হইতেছে লাস্য। সঙ্গীত দামোদরের মতে তাণ্ডব দ্বিবিধ—'পেবলি' ও 'বহুরূপ'। লাস্যও দ্বিবিধ—'ছুরিত' ও 'যৌবত'। 'পেবলি'

বলিতে অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপ বুঝায়। বহুরূপে 'উদ্ধত' ভাবের প্রকাশ থাকে। নায়িকার ভিতর ভাবরসের বিকাশকে 'ছুরিত' বলা হয়। নর্তক নর্তকীগণ কর্তৃক লীলাময় মধুর নৃত্য 'যৌবত' বলিয়া অভিহিত হয়। শার্ঙ্গদেবের মতে 'লাস্য' হইতেছে কামবর্ধক।

পরবর্তী শাস্ত্রকারগণের ভিতর অনেকে সাতপ্রকার তাণ্ডবের বর্ণনা করিয়াছেন—আনন্দ তাণ্ডব, ত্রিপুর তাণ্ডব, সন্ধ্যা তাণ্ডব, গৌরী-তাণ্ডব, কালিকা তাণ্ডব, ত্রিপুর তাণ্ডব, সংহার তাণ্ডব।

তামিল সঙ্গীতগ্রন্থ 'নটনাদী বাদ্যরঞ্জনম্' এ বারো প্রকার তাণ্ডবের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার মতে বারোটি তাণ্ডব হইতে বিভিন্ন জাতীয় নৃত্যের উদ্ভব হইয়াছে। যথা—

আনন্দ তাণ্ডব হইতে জেদা নাট্যম্
সন্ধ্যা তাণ্ডব হইতে গীত নাট্যম্
শৃঙ্গার তাণ্ডব হইতে ভরত নাট্যম্
ত্রিপুর তাণ্ডব হইতে পেরাণী নাট্যম্
উর্ধ্ব তাণ্ডব হইতে চিত্র নাট্যম্
মুনি তাণ্ডব হইতে লয় নাট্যম্
সংহার তাণ্ডব হইতে সিম্মালা নাট্যম্
উগ্র তাণ্ডব হইতে রাজ নাট্যম্
ভূত তাণ্ডব হইতে মার্কণ্ডেয় নাট্যম্
প্রলয় তাণ্ডব হইতে পাবৈ নাট্যম্
ভুজঙ্গ তাণ্ডব হইতে পিত্ত নাট্যম্
শুদ্ধ তাণ্ডব হইতে পাদসার নাট্যম্

ভরত দশপ্রকার লাস্যাঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—গেয়পদ, স্থিতপাঠ্য, আসীন, পুষ্পগন্ধিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিমূঢ়, সৈন্ধব, দ্বিমূঢ়ক, উত্তমোত্তম ও উক্তপ্রত্যুক্ত। উপবিষ্ট হইয়া গীত পরিবেশনকে 'গেয়পদ' বলা হইয়াছে। 'স্থিতপাঠ্যে' প্রাকৃত ভাষায় আবৃত্তি মূলক

গান করিতে হইবে। চারিটি পদে ত্র্যস্র তালে গীত হইলে 'আসান' হয়। পুষ্প গণ্ডিকাকে ভরত 'পুষ্পগন্ধিকা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহাতে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগিতা থাকিবে এবং সুন্দর অঙ্গহারে ইহা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। 'প্রচ্ছেদকে' নৃত্যই প্রধান থাকে। 'ত্রিমূঢ়কে'ও সুন্দর ললিত শব্দযুক্ত গীত থাকিবে। ইহাতে অঙ্গহার অথবা বিষ্কম্ভক থাকিবে না; 'সৈন্ধবে' কোন সুচারু অঙ্গহার অথবা রেচক থাকিবে না। ইহাতে বাদ্যযন্ত্র থাকিবে। চতুরস্র তালে দীর্ঘ আবৃত্তিযুক্ত গীতে মৃদু অঙ্গহার থাকিবে। 'দ্বিমূঢ়কে' চপপুট্ তালে মুখ-প্রতিমুখ থাকিবে। 'উত্তমোত্তমে' হেলার প্রয়োগ হইবে। 'উক্তপ্রত্যুক্তে' সুন্দর বাক্যালাপ থাকিবে এবং ক্রোধ ও ক্রোধের প্রশমিত রূপ থাকিবে।

ভরত নাট্যে ধ্রুবাগীতির উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষ বিশেষস্থানে ইহার প্রয়োগ হইত। নৃত্যকালে ক্রমভঙ্গ করিয়া যে নাট্য গীতির পরিবেশন করা হইত তাহাকে 'আক্ষেপিকী' বলা হইত। ভরত 'বর্ধমানক' বলিতে কলা ও অক্ষরের বৃদ্ধি বলিয়াছেন। ইহার অর্থ ই হইতেছে তালের পরিবর্তন করা। শুদ্ধপদ্ধতিতে কঠিন বাদ্যপদ্ধতি, দাপ্ত নর্তন, কবিতা প্রভৃতি বর্জনীয়। ইহাতে শুদ্ধমাত্র কোমল অঙ্গাভিনয় প্রযোজ্য।

ভরতের মতে সুষ্ঠু অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পান্না, চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যায় নিপুণা, চতুরা, প্রশ্নকুশলা, স্ত্রী-দোষবর্জিতা, প্রগল্‌ভা, আলস্যমুক্তা, জিতশ্রমা, নানাশিল্পপ্রয়োগকুশলা, নৃত্যগীতবিচক্ষণা, সমাগত নারীদিগের মধ্যে রূপ, যৌবন ও কান্তিতে অতুলনীয়া যিনি, তিনিই নর্তকী। নৃত্যে পাত্র বলিতে নর্তক ও নর্তকীকে বুঝায়। সঙ্গীত রত্নাকরে বলা হইয়াছে—সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্তা, চারুবক্ত্রা, বিশালনেত্রা, বিম্বাধরা, কান্তদন্তা, সুকণ্ঠী, কম্বুকণ্ঠী, ক্ষীণকটিসম্পন্না, স্থূলনিতম্বিনী, লাবণ্যবতী এবং যাঁহার সরস বাহুলতা, যিনি মাধুর্য, ধৈর্য ও ঔদার্যের

অধিকারিণী, সুতাল রক্ষণে অভিজ্ঞা, গীত-বাদ্য-বিশারদা এবং রসোচিত গাত্রবিক্ষেপে নিপুণা তিনিই শ্রেষ্ঠা পাত্রী।

অভিনয় দর্পণে পাত্রের দশটি প্রাণের উল্লেখ করা হইয়াছে,—জবত্ব (Quickness), স্থিরতা (Firmness), রেখা (Attractive pose), ভ্রমরী (Easy rotation), দৃষ্টি (Looking), শ্রম (Endurance), প্রীতি (Affability), মেধা (Intelligence), বচঃ (Clear enunciation), গীতি (Music)।

সঙ্গীতরত্নাকরে নট ও নর্তকের পার্থক্য নির্ণয় করা হইয়াছে। তাহাতে নটের এইরূপ বর্ণনা আছে "চতুর্ধাঽভিনয়াভিজ্ঞো, নটো ভাণাদি-ভেদবিদ্।" চারপ্রকার অভিনয়ে যিনি অভিজ্ঞ এবং ভাণাদিভেদের জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনিই নট। নর্তক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"নর্তকঃ সূরিভিঃ প্রোক্তো মার্গনৃত্যে কৃতশ্রমঃ।" যিনি মার্গ নৃত্যে অভ্যস্ত, তিনি প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ কর্তৃক 'নর্তক' বলিয়া অভিহিত হন। নাট্যশাস্ত্রানুসারে কবি, নির্দেশক, রঙ্গমঞ্চ-প্রবন্ধকর্তা, সঙ্গীতকার, দৃশ্যপ্রস্তুতকারক এবং চিত্রকর নাট্যাচার্য-শ্রেণীভুক্ত।

সূত্রধার—নাট্যশাস্ত্রানুসারে সূত্রধারের কলা, বিজ্ঞান, দেশ এবং আঞ্চলিক প্রচলিত বেশভূষার জ্ঞান, ভাষা, নাট্যশাস্ত্র এবং কাব্যশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং জ্যোতিষ, ইতিহাস, কানুন ও শরীর বিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান থাকা চাই। সূত্রধার হইবেন মেধাবী, কুশাগ্রবুদ্ধি, গম্ভীর, স্বাস্থ্যবান, মৃদুস্বভাব, আত্মসংযমী, ক্ষমাশীল, সত্যবাদী ও পক্ষপাতিত্বশূন্য। ইনি নাট্যদলের মুখপাত্র। সঙ্গীত দামোদরে আছে—

"নর্তকীয়-কথাসূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে।
রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম নর্তকীয় কথাসূত্রকে সূচিত করেন, তিনি 'সূত্রধার'।

পারিপার্শ্বিক—নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, একমাত্র সূত্রধারই 'পারিপার্শ্বিক' হইতে অধিক গুণসম্পন্ন। পারিপার্শ্বিক মধ্যমশ্রেণীর এবং

সুন্দর হইবেন, চতুর এবং নিজকার্যসম্পন্ন করিতে কুশল হইবেন। ইনি সূত্রধারের অবর্তমানে কখনও সঙ্গীত নির্দেশ করেন এবং কখনও বা অভিনেতাদিগকে আদেশ প্রদান করেন।

কুশীলব—বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী এবং বাদ্যযন্ত্র সজ্জিত করাতে কুশলী হন। ইঁহাদিগকে সঙ্গীতজ্ঞ হইতে হইবে।

প্রাশ্নিক—নাট্যশাস্ত্রানুসারে নাটকের সফলতা নির্ভর করে 'প্রাশ্নিকের' উপর। প্রাশ্নিককে যজ্ঞবিদ্, নর্তক, ছন্দোবিদ্, শব্দবিদ্, চিত্রবিদ্, এবং পণ্যানারী, গন্ধর্ব ও রাজার সেবক হইতে হইবে। যখন কোন মতবিরোধ উপস্থিত হইবে তখন প্রাশ্নিকের সিদ্ধান্তই মান্য হইবে।

উপাধ্যায়—যিনি অভিনয়ে উপদেশ দিতে পারেন, শাস্ত্রজ্ঞ, জনচিত্তাকর্ষক এবং যিনি নৃত্যের দোষবিধান জানেন, তিনি 'উপাধ্যায়'।

সঙ্গীতরত্নাকরে নৃত্যশালার এইরূপ বিবরণ আছে—বিচিত্র নৃত্যশালায় পুষ্পশোভিত, নানাবিতানসম্পন্ন, রত্নস্তম্ভবিভূষিত সিংহাসনে সভাপতি অধিষ্ঠান করিবেন। তাঁহার বামদিকে অন্তঃপুরিকা ও দক্ষিণে প্রধানগণ থাকিবেন। তাঁহাদের সন্নিধানে থাকিবেন লোক বিশারদ ও বেদজ্ঞগণ, রসিকগণ ও কবিগণ। জ্যোতির্বিদ ও বৈদ্যগণকেও ইহার ভিতর সন্নিবেশিত করিতে হইবে। দক্ষিণভাগে মন্ত্রিগণ থাকিবেন। রাজার পৃষ্ঠদেশে বিলাসিগণ ও অন্তঃপুরিকাগণের স্থান হইবে। চারুদেহা, চামরধারিণী ও রূপযৌবনসম্পন্না রমণীগণ রাজার পশ্চাতে থাকিয়া কঙ্কনের দ্বারা জনগণের মন হরণ করিবে। ইহা ব্যতীত অগ্রে গায়ক, কথক, বন্দিগণ, প্রশংসাকুশলী ও চতুর ব্যক্তিগণ থাকিবেন। ইহার পর চতুর্দিকে রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণ উপবেশন করিবেন।

সঙ্গীতমকরন্দে সভাপতির লক্ষণ নিম্নরূপ—সাবধানী, বাগ্মী, ন্যায়বিদ, দোষগুণবিচারে অভিজ্ঞ, বিনয়নম্র, নিরহঙ্কার, রসভাবজ্ঞ, তৌর্যত্রয়বিদ্, প্রতিভাবান ব্যক্তি সভাপতি হইতে পারেন। সঙ্গীত রত্নাকরে বলা

হইয়াছে যে, সভাপতির নিম্নোক্ত গুণগুলি থাকা আবশ্যক। তিনি শৃঙ্গারী, দানশীল, মান্য, শ্রেষ্ঠ পাত্রবিবেচক, শ্রীমান, গুণগ্রাহী, কৌতুক-প্রিয়, পরিহাসপ্রিয়, সুধী, গম্ভীর ভাবযুক্ত, সকলপ্রকার কলায় নিপুণ, সমস্ত শাস্ত্রবিজ্ঞানসম্পন্ন, কীর্তিলোলুপ, প্রিয়ভাষী, পরচিত্তজ্ঞ, মেধাবী, ধারণান্বিত, তৌর্যত্রয় বিশেষজ্ঞ, পারিতোষিক, দানবীর, দেশী ও মার্গসঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, মধ্যস্থতা নিপুণ, ধীরবুদ্ধি, স্বাধীনচেতা, রসজ্ঞ, ভাবুক, সত্যবাদী, কুলীন, প্রসন্নবদন, স্থিরপ্রেমা, কৃতজ্ঞ, করুণাসাগর, ধর্মিষ্ঠ, পাপভীরু ও বিদ্বানগণের বন্ধু অর্থাৎ তিনি সর্বগুণসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইবেন।

গৌণ্ডলী—ইহা একপ্রকার নৃত্য। ইহাতে কঠিন বাদ্যপ্রবন্ধ থাকিবে। এলাদি বর্জিত সালগসূড়ে অবস্থিত গীতে, ধ্রুব প্রবন্ধে ও চালি প্রভৃতিযুক্ত কোমল লাস্যাঙ্গে এই নৃত্য করিতে হইবে। পাত্র স্বয়ং ত্রিবলী ধারণ করিয়া বাদ্য করিতে করিতে গীত ও নৃত্য করিবেন। এইরূপ নৃত্যরত পাত্রকে 'গৌণ্ডলী' বলা হয়। ইহা যদি নৃত্য ও গীত বর্জিত হয়, তাহা হইলে 'মূক গৌণ্ডলী' হয়। কর্ণাটদেশে ইহার জন্ম। সঙ্গীত রত্নাকরে এইরূপ ব্যাখ্যা আছে—অন্তে একতালীযুক্ত সালগসূড় ও রূপক তালে ধ্রুবাদি সপ্তপ্রকার লয়যুক্ত গীতের সহিত নৃত্য সমাপন করিলে 'গৌণ্ডলী' হয়।

পেরণী—সঙ্গীতরত্নাকরে বলা হইয়াছে—ভস্মপ্রভৃতি শ্বেতচূর্ণ অঙ্গে লেপন করিয়া মুণ্ডিত মস্তকে শিখা ধারণ করিয়া এবং ঘর্ঘরিকা জাল জঙ্ঘায় বাঁধিয়া পদদ্বয়ের দ্বারা 'পাট' বাদ্য করিতে করিতে যিনি এই নৃত্য করেন, তাঁহাকে 'পেরণী' বলে। শিল্পীকে [১]পাঁচ অঙ্গে, তালে, এবং কলা ও লয়ের বিষয়ে বিচক্ষণ হইতে হয়।

চতুর দামোদর রচিত সঙ্গীত দর্পণে মধ্যযুগীয় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় দেশী ও মার্গ নৃত্যের কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। এইগুলি বর্তমান নৃত্যপদ্ধতির উৎপত্তির বিষয়ে আলোচনা করিতে বিশেষ

১। পঞ্চাঙ্গ—ঘর্ঘর, বিষম, ভাবাশ্রয়, কবিবিচার ও গীত

সহায়ক। শুধু তাহাই নহে, কালের গতিতে এবং যুগের দাবীতে এইগুলি কিরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহারও একটি ধারণা করা যায়।

মুখচালি—নৃত্যপ্রভৃতির আদিতে যে নৃত্য হয়, তাহাকে 'মুখচালি' বলা হয়। ইহাতে অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ দুই প্রকার গীতের প্রয়োজন হয় এবং মঙ্গলার্থ 'গণেশ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। পর্দার পশ্চাতে নর্তকী পুষ্পথালি লইয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। পর্দা অপসারিত হইলে বাদ্যবৃন্দের সহযোগে দর্শকদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া নর্তকী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া পুষ্প নিক্ষেপ করিবেন। কেহ পুষ্পের সংখ্যা একবিংশতি নির্দেশ করিয়াছেন, কাহারও মতে ইহার কোন নির্দেশ নাই। ইহাই নৃত্যের উপক্রমণিকা অথবা মুখচালি।

যতি নৃত্য—বাদ্য জাতীয় শব্দের অক্ষরের উপর ভিত্তি করিয়া সঙ্গীতের সহিত যে নৃত্য করা হয় তাহাকে 'যতি' নৃত্য বলে। ইহা অত্যন্ত কোমল এবং ইহাতে 'চচ্চতপুট' তাল ব্যবহৃত হয়। যতিবাদ্যের অক্ষর নিম্নরূপ হয়—তত্তং তত্তথা দাধি ক্কিট ক্কথো তকিট তকিট ধকিট তথোংগা থোংগা থৈতাতি থৈতাতি থেই থেই থেই তি থেই থেই থা।

শব্দচালি—বাদ্যযন্ত্রের অক্ষরের সহিত সমতা রাখিয়া ইহা পর্যায়ক্রমে বারবার করা হয়। অর্থাৎ বাদ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাদ্যযন্ত্র পুনঃ পুনঃ বিরাম দিয়া বার বার বাজাইতে হইবে। বার্তিকাদি পাঁচটি মার্গে ইহা করা হয়।

উড়ুপ নৃত্য—বিভিন্ন ভঙ্গীসহকারে ভ্রমরী ও চালকের সহিত দ্রুত নৃত্যকে 'উড়ুপ' নৃত্য বলা হয়। উড়ুপ নৃত্যকে ১২টি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

মেড়ি নৃত্য—রেখা, মুদ্রা ও প্রমাণ সহকারে নানাকরবিভূষিত হইয়া দিকচক্রাভিমুখে নৃত্যকে 'মেড়ি' নৃত্য বলে। ইহা আদি তালে ও বিলম্বিত লয়ে করিতে হয়।

করণ মেড়ি—করণ সংযুক্ত নৃত্যকে 'করণ মেড়ি' বলে।

নড় নেড়ি—করণ নেড়ি দ্রুতভাবে করা হইলে 'নড় নেড়ি' হয়।

ভাব নেড়ি—রসভাবাদিপুষ্ট হইলে 'ভাব নেড়ি' বলা হয়।

শুদ্ধ নেড়ি—শুদ্ধ পদ্ধতি এবং পতাকাদিযুক্ত নৃত্য হইলে 'শুদ্ধ নেড়ি' হয়।

শালঙ্গ নেড়ি—সংযুত ও অসংযুত নৃত্যহস্তের মিলনে যে নৃত্য করা হয় তাহাকে 'শালঙ্গ নেড়ি' বলে। সঙ্কীর্ণ নেড়ির উল্লেখও আছে।

ভিন্ন—রূপক তালের দ্বারা বারংবার 'চালকা' করিলে 'ভিন্ন' বলিয়া অভিহিত হয়।

চিত্র—বিচিত্র 'চালকা', 'রেখা' ও 'সৌষ্ঠব'-এ শোভিত হইয়া একতালী তালে ও চিত্রতর মার্গে কৃত হইলে তাহাকে 'চিত্র' বলা হয়।

নত্র—ইহা ক্রীড়ার তাল অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। বালকগণ খেলিবার সময় যেমন চক্রবৎ ঘোরে, ইহা সেইরূপ। ইহাতে যতি সমূহের সঙ্কোচন ও প্রসারণ হইয়া থাকে।

খুল্ল—'সম' ও 'বিষম' তালে নৃত্য অনুষ্ঠিত হইলে 'খুল্ল' হয়।

জারমান—আদিতালে অনুষ্ঠিত নৃত্যকে 'জারমান' বলা হয়।

মুরু—উৎকট স্থানকে অবস্থান করিয়া তির্যগ্‌ভাবে পুনঃ পুনঃ ঘুরিতে হইবে। দুই হস্তে ত্রিপতাক মুদ্রা ধারণ করিয়া ক্রীড়াতালের অনুসরণে দুইজনে ইহা করিতে হইবে।

উৎকট—ভূতলে চরণযুগল সম্যগ্‌ভাবে স্পর্শ না করিয়া সরলভাবে রাখিতে হইবে। যোগ, ধ্যান, সন্ধ্যা, জপ ইত্যাদিতে 'উৎকট' ব্যবহৃত হয়।

হুল্ল—একপদ উৎক্ষিপ্ত করিয়া বপুকে বারবার দোলাইতে হইবে। ইহাকে 'হুল্ল' বলে। লঘুশেখর তালে অথবা আদি তালে ইহা করিতে হয়।

লাবনী—উদ্ঘট্টতালে কটির উর্ধ্বভাগ ঘুরাইলে 'লাবনী' হয়। সমপাদে ও আদিতালে ইহা করা হয়। দ্রুতভাবে বাম হইতে দক্ষিণে ইহা করিতে হইবে।

কর্তরী—জঙ্ঘা দুইটিকে স্বস্তিক করিয়া ভ্রমণ করিলে তাহা ‘কর্তরা’ হয়।

তুল্ল—সৌষ্ঠবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ‘গজলীল’ তালে সকলদিক ঘুরিয়া নৃত্য করিলে তাহাকে ‘তুল্ল’ বলে।

প্রসর—বাহু দুইটি বাংবার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে হইবে এবং তদনুসরণে চরণ দুইটিও তদ্রূপ করিয়া চালনা করিতে হইবে। ইহা আদিতালে ও মধ্যমলয়ে অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে ‘প্রসর’ বলে। সুতরাং উড়ুপ নৃত্যে যে বারোটি ভাগ আছে তাহাকে এইরূপে ভাগ করা যাইতে পারে—নেড়ি, ভিন্ন, চিত্র, নত্র, খুল্ল, জারমান, মুরু, হুল্ল, লাবনী, কর্তরী, তুল্ল ও প্রসর। এই নৃত্যগুলির ব্যাখ্যা হইতে নৃত্যের রূপ সম্যগ্‌রূপে বুঝা না যাইলেও একটি ধারণা করা যাইতে পারে।

ধ্রুবাড—করণ ও তাল সহযোগে [1]উৎপ্লুতাদি নৃত্য কিংবা দুইটি অথবা তিনটি ‘আকাশচারী’, মধ্যে [2]‘তিরিপ’ এবং অন্তে ‘মুরু’ নৃত্য হইলে তাহাকে ‘ধ্রুবাড’ নৃত্য বলা হয়। অথবা দুইটি লাগ একটি একপাদ ও পশ্চাতে তিরিপ হইলে ধ্রুবাড নৃত্য বলা হয়।

লাগ নৃত্য—কর্ণাটক ভাষায় লাগের অর্থ হইতেছে উৎপ্লুতি। সুলূবদ্ধ একপদে উল্লম্ফন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুপতন হইলে তাহাকে কর্ণাটক ভাষায় ‘লাগ নৃত্য’ বলা হয়। ‘লগ্‌’ কথাটি সঙ্গীত রত্নাকরে ‘উৎপ্লবনের’ ভিতর পাওয়া যায়। যথা—অলগ্‌, কূর্মালগ্‌, অন্তরালগ্‌ ইত্যাদি।

রায়রঙ্গাল—যদি দুইপাদে উল্লম্ফন করিয়া অনুপতন হয়, তাহা হইলে ‘রায় রঙ্গাল’ নৃত্য হয়।

অড়াল—সুলূবদ্ধ হইয়া উল্লম্ফন করিয়া চরণদ্বয় পাখীর পাখার মত বিস্তৃত করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ভূমিতে পতন হইলে তাহাকে ‘অড়াল’ নৃত্য বলে।

নিঃশঙ্ক—সুলূবদ্ধ হইয়া উল্লম্ফন পূর্বক মিলিত চরণে দূরে ভূমিতে পতিত হইলে তাহাকে ‘নিঃশঙ্ক’ বলে।

(১) উল্লম্ফন, (২) তির্যগ্‌ভাবে ঘুরিয়া জঙ্ঘাকে স্বস্তিককরণ।

হুরুময়ী—অলাত অঙ্গহার পরিত্যাগ পূর্বক একটি পদকে পৃষ্ঠের দিকে করিয়া শীঘ্রগতিতে অপর পদের দ্বারা অনুরূপভাবে লঙ্ঘন করিলে তাহাকে 'হুরুময়ী' বলে।

লঙ্ঘিক-জঙ্ঘিকা—প্রথমে একটি চরণ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া অপর চরণ দ্বারা লঙ্ঘন করিতে হইবে। অতঃপর সুলূর ভঙ্গীতে অবস্থান করিলে তাহাকে 'লঙ্ঘিকজঙ্ঘিকা' বলে।

অড়ন্তর—লঙ্ঘিকজঙ্ঘিকা নৃত্য করিবার পর পদদ্বয় সম্মুখভাগে মিলিত হইলে 'অড়ন্তর' হয়।

ঢেঙ্কী—পদদ্বয় সমভাবে রাখিয়া পদের পার্শ্বদেশ দ্বারা একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে উল্লম্ফন করিলে তাহাকে 'ঢেঙ্কী' বলে।

দিগু—পদদ্বয় জড়াইয়া ঊর্ধ্বদিকে উল্লম্ফনপূর্বক ভূমিস্পর্শ করিলে তাহাকে 'দিগু' বলে।

বাস্—ভূমিতে একটি পদ স্থাপন করিয়া দ্বিতীয় পদটিও পূর্ববৎ পার্শ্বদেশ দ্বারা সুন্দরভাবে স্থাপন করিলে তাহাকে 'বীস্' বলে।

পক্ষিশার্দূল—যদি মণ্ডলীতে অবস্থিত হইয়া হস্ত দুইটি সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ভ্রমণ করান হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'পক্ষিশার্দূল' বলা হয়।

'ধ্রুবাড লাগ' নৃত্যের অনেকগুলি ভাগ। উপরিউক্ত রায়রঙ্গাল, নিঃশঙ্ক, হুরুময়ী, লঙ্ঘিকজঙ্ঘিকা, অড়ন্তর, দিগু, ঢেঙ্কী, বীস্, পক্ষিশার্দূল প্রভৃতি ধ্রুবাড লাগ নৃত্যের অন্তর্গত।

শব্দনৃত্য—অঙ্গহার দ্রুত এবং পদদ্বয়ের দ্বারা 'তৎকার' হইলে ও বাদ্যাক্ষর রসযুক্ত হইলে তাহা 'শব্দনৃত্য' হয়। নট যদি অঙ্গ ও লোচনভঙ্গীর দ্বারা ভাব, পদদ্বয়ের দ্বারা শব্দাক্ষরের তাল ও লয় এবং মুখের দ্বারা শব্দাক্ষর উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে তাহাকে 'শব্দনৃত্য' বলা হয়। 'চতরশ্র' করিয়া এক হস্তে শিখর মুদ্রা এবং অন্য হস্ত নাভির উপর রাখিতে হইবে। পুনরায় এক হস্ত বক্ষের উপর রাখিতে হইবে এবং অপর হস্তে পতাক মুদ্রা করিতে হইবে। ইহার পর

এক পদ পুরোভাগে রাখিয়া 'সূচী' মুদ্রা করিয়া, দ্বিতীয় পদকে 'অঞ্চিত' করিতে হইবে এবং আয়ত হস্তে তৎকারে 'সমে' আসিতে হইবে। হস্তের দ্বারা 'শিখর' মুদ্রা করিয়া নাভি ও বক্ষের দুই পার্শ্বে ও স্কন্ধে রাখিয়া ইহার সহিত ঘুরিয়া ভ্রমরী করিতে হইবে। ইহাকে 'শব্দনৃত্য' বলা হয়। শব্দ নৃত্যের কয়েকটি ভাগ আছে। যেমন সূড়শব্দ, বিবর্তনা নৃত্য, চমৎকার নৃত্য ইত্যাদি।

বিবর্তনা—অঙ্গ ও উপাঙ্গের সমন্বয় হইলে 'বিবর্তনা নৃত্য হয়। বাম অঙ্গে ও দক্ষিণ অঙ্গে স্বরগুলি বিভাজিত হইয়া ব্যবহৃত হয়; ধ্রুবতালে এই নৃত্য হইয়া থাকে।

চমৎকার—অক্ষরের সহিত সমতা রাখিয়া দুই হাত মিলিত করিয়া নৃত্য করিলে তাহাকে 'চমৎকার' বলে। ইহাতে অক্ষরের প্রাধান্য থাকে।

গীতনৃত্য—গীত ও তালকে অনুসরণ করিয়া এবং আদিবর্ণকে সংঘাতের (তাল) দ্বারা দেখাইয়া পাত্রকে সুন্দরভাবে নৃত্য করিতে হইবে। গীতের অর্থানুসারে নৃত্য করা উচিত। স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণকে অঙ্গের দ্বারা, ভাবকে উপাঙ্গের দ্বারা এবং অর্থকে হস্তের দ্বারা প্রকাশ করিয়া ও পদের দ্বারা তালের 'গ্রহ' ও 'সম' দেখাইতে হইবে। গীত নৃত্যকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়, যথা—স্বরমণ্ঠ, সালগসূড়, শুদ্ধসূড়, ধ্রুবগীত, মণ্ঠ, রূপক, ঝম্পাতাল, তৃতীয়ক, অড্ডতাল, একতালি ইত্যাদি।

স্বরমণ্ঠ নৃত্য—গীতের রাগের ভিতর তিনটি স্বর মুখ্য ; যথা, [১]গ্রহ [২]অংশ ও [৩]ন্যাস। এই তিনটি স্বরের সহিত অভিনীত হইলে সেই নৃত্যকে 'স্বরমণ্ঠ' নৃত্য বলা হয়।

সালগসূড়—সপ্ততালে (ধ্রুব, মণ্ঠ, রূপক, ঝম্পা, তৃতীয়ক, অষ্টতালী

১। গ্রহস্বর—যেখান হইতে গীতের স্বর আরম্ভ হয়।

২। অংশস্বর—যে স্বরটির বহুল প্রয়োগ হয়।

৩। ন্যাসস্বর—গীতের সমাপ্তিকে বলা হয়।

ও একতালী) ইহা হইয়া থাকে। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিসারুক, অড্ডতাল, রাস এবং একতালী, এই সাতটি তালে ইহা অনুষ্ঠিত হয়।

শুদ্ধ সূড—এলা, করণ, ঢেঙ্কী, বর্তনা, ঝোম্বড়া, লম্ভ, রাস ও একতালী এই ৮টি বিষয় থাকিলে তাহাকে 'শুদ্ধ সূড়' বলা হয়।

ধ্রুবগীতি—ইহা ধ্রুবতালে আরম্ভ করিয়া চচ্চতপুট তালে শেষ করিতে হইবে। বেষ্টিতাদি করণের দ্বারা অঙ্গহার পরিবর্তন করিতে হইবে। দক্ষিণাদিক্রমে সমভাবে উভয় দিকে গতি রাখিয়া সুন্দর হস্তভঙ্গী সহকারে ধ্রুবতালে নাচিতে হইবে। [১]উদ্‌গ্রাহ ও [২]আভোগের সহিত নৃত্যের শেষে উদ্‌গ্রাহের আদিতে সমাপন করিতে হইবে।

মণ্ঠ—ধ্রুব নৃত্য দুই, তিন অথবা চারিবার করিতে হইবে এবং আভোগ নৃত্য একবার করিতে হইবে। ধ্রুবের আদিতে বিচিত্র হস্তভঙ্গীর দ্বারা [৩]ন্যাস করিতে হইবে।

রূপক—রূপক তালে উদ্‌গ্রাহ ও আভোগ দ্রুত লয়ে গাহিলে নৃত্যের ধ্রুবগীতিতে দ্রুতলয় হইয়া থাকে। ইহাকে 'রূপক' নৃত্য বলা হয়।

ঝম্পাতাল—ঝম্পাতালের মধ্যমলয়ে গীত চলিতে থাকিলে যদি সমানভাবে দূরে পদক্ষেপ হয় ও তালের সপ্তম প্রাণ 'কলার' সহিত করভঙ্গী সহকারে লাস্যাঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'ঝম্পাতাল' নৃত্য বলা হয়। ইহার অন্তরা কলাযুক্ত হইবে।

তৃতীয়ক—তৃতীয় তালে দ্রুতমানে সুন্দর করভঙ্গীর দ্বারা কলাযুক্ত লাস্যাঙ্গে অভিনয় করিলে তাহাকে 'তৃতীয়ক' নৃত্য বলে।

অড্ডতাল—যে নৃত্যে অড্ডতাল তালে বিলম্বিত লয়ে উদ্‌গ্রাহাদি গীত হইতে থাকে, তাহাকে 'অড্ড়তাল' নৃত্য বলা হয়। ইহাতে সুন্দর করভঙ্গীর সহিত ধ্রুবগান হইবে।

---

(১) গীতের আদিকে বলা হয়। (২) গীতের অন্তকে বলা হয় (৩) সমাপক।

একতালী—যখন একতালী গীত দ্রুত গীত হয়, তখন মধ্যে মধ্যে 'ভ্রমরী' এবং 'চালকা' প্রযুক্ত হইবে এবং গীতকলা আলাপ ও লাস্যাঙ্গ-যুক্ত হইবে। নৃত্যবিদ্গণ ইহাকে 'একতালী' নৃত্য বলেন। নৃত্যের বিচিত্র রীতি ইহাতে অনুসরণ করা হয়।

স্বুলূ নৃত্যের বিবরণ নিম্নরূপ—

মন্দ মন্দ বায়ুচালিত কম্পমান দীপশিখার ন্যায় দেহ আন্দোলিত হইলে তাহাকে 'স্বুলূ' নৃত্য বলা হয়।

উপরোক্ত নৃত্যগুলি শুদ্ধপদ্ধাতর অন্তর্গত। দেশী নৃত্যবিধির অন্তর্গত হইতেছে চিন্দু, দেশী কট্টরী, বন্ধনৃত্য, কল্পনৃত্য, কট্টরী, বৈপোতাখ্যম্, জক্করী, পেরণী, গৌণ্ডলী ইত্যাদি। চিন্দুনৃত্য দুইভাগে বিভক্ত—বিড়চিন্দু ও কালচারী চিন্দু।

কালচারী—উচ্চ ঘর্ঘরী ধ্বনির সহিত তান, তাল, স্বুলূ প্রভৃতির সমন্বয় হইলে তাহাকে 'কালচারী' বলে। তুড়ী বাদ্যের সহিত যতিযুক্ত হইয়া সেই সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত নৃত্য নানা গতি-বিচিত্র হয়। ইহার সহিত সুন্দর পাটবাদ্য ও [১]কিঙ্কিনীধ্বনি থাকিবে। মধ্যে মধ্যে কলাযুক্ত লাস্যাঙ্গের প্রয়োগ থাকিবে। এই নৃত্য ত্রিশূল হস্তে করিতে হয়। ইহা দ্রাবিড় ভাষায় উদ্গ্রাহ ধ্রুবপদে গীত হইলে 'চিন্দু' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইহা সম্পূর্ণভাবে আভোগবিবর্জিত হয়।

কট্টরী নৃত্য—তেলেগু ভাষায় একটি যতি সমন্বিত একটি পদ তাল-হীনভাবে আলাপাদির সহিত বদ্ধ করা হইলে তাহাকে 'পট্টি' বলে। কিন্নরী তালে ও কিন্নরী নৃত্যে ইহা করা হয়। ইহা মৃদঙ্গাদি অথবা ততবাদ্যযুক্ত হইলে 'স্বুলূপ' হয়। উদ্গ্রাহাদিযুক্ত কর্ণাটভাষায় রচিত পদের সহিত যে কোন তালে এই নৃত্য করিলে 'কট্টরী' নৃত্য হয়।

বৈপোতাখ্যম্—চতুষ্টয় রেচক, বিধুত ও কম্পিত শিরোভেদ প্রভৃতির সহিত এই নৃত্য করিতে হইবে। লাস্য অঙ্গে মুরু (আদিতাল) নৃত্য

(১) বীণা অথবা ঘুঙুর।

হইবে। ইহা অন্ধ্র বা কর্ণাটভাষাযুক্ত হইবে এবং ইহাতে রস প্রাধান্য থাকিবে।

বন্ধ নৃত্য—ইহাতে দুইটি হইতে পাঁচটি সুন্দরী স্ত্রী অংশ গ্রহণ করে। হস্ত ও পদের সহিত করণের প্রয়োগ হইলে 'বন্ধ' নৃত্য হয়।

কল্প নৃত্য—যে কোন করণে এবং যে কোন স্থানকে আশ্রয় লইয়া ন্যাসবিধির প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাকে 'কল্প' নৃত্য বলা হয়। এই নৃত্যে ও গীতে নৃত্যবিদ্‌গণ প্রায়ই কল্পতালের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন। কল্পের অর্থ হইতেছে গীতের প্রথম এবং শেষ পদটিকে পুনঃ পুনঃ গাহিতে হইবে।

জক্করী নৃত্য—যবন ভাষাযুক্ত গীতের সহিত গজরা প্রভৃতি বাদ্যে অঞ্চল ধরিয়া এই নৃত্য করিতে হয়। ইহা তিনটি লয় সমন্বিত হয় এবং ইহাতে কোমল অঙ্গহার ও ভ্রমরী প্রভৃতির প্রাধান্য থাকে। ইহাতে ধ্রুব ও ঝম্পা প্রভৃতি তালও থাকে। ইহা সশব্দ ক্রিয়াযুক্ত এবং চেষ্টাবিবর্জিত নৃত্য। পারসিক পণ্ডিতগণ নিজভাষায় উদ্‌গ্রাহাদি সমন্বিত করিয়া ইহাকে 'জক্করী' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহা যবনদিগের অতি প্রিয়।

কথক



"ফুলের মত সুন্দরী এই
নর্তকীরা ভাগ্যহীনা—
নিঠুর হ'য়ে তোমরা ওগো
কোরো না কেউ এদের ঘৃণা!"

—ওমর খৈয়াম, ৭৪।

কথক

কথক নৃত্য সম্বন্ধে নৃত্যজগতে যথেষ্ট মতভেদ ও তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নৃত্যের বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য যাহা আছে, তাহা যথেষ্ট প্রামাণিক বলিয়া মনে করা যায় না। সুতরাং সামান্য ইতিহাস, অন্যান্য তথ্য ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নিরপেক্ষভাবে কথক নৃত্যের ইতিহাস রচনা করিতে সচেষ্ট হইতেছি। কথক নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে অহেতুক গুণারোপ অথবা দোষারোপ করা হইয়াছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে কেহই তাহার বিচার করিতে চাহেন নাই। কথক নৃত্যের সমর্থকগণ বলেন, ইহা প্রাচীন ভারতের একটি প্রাচীন হিন্দুমন্দির-নৃত্য। মধ্যযুগে ইহার উপর সামান্যমাত্র ঐস্‌লামিক প্রভাব পড়িয়া ইহাকে সামান্য বিকৃত করিয়াছে মাত্র। কিন্তু ইহার অবয়ব দেখিলে এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা মধ্যযুগীয় হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণে উদ্ভূত একটি মিশ্রিত নৃত্য। আমাদের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রগুলি এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাস এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

কথক নৃত্যের নামকরণ হইয়াছে 'কথক' সম্প্রদায় হইতে। যাঁহারা পঙ্কিলআবর্ত হইতে কথক নৃত্যকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন কথক সম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহাদের উপজীবিকা ছিল পুরাণের কথা জনসমক্ষে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ করা। ইহাকেই 'কথকতা' বলা হয় এবং যাঁহারা এই কথকতা করেন তাঁহাদিগকে 'কথক' ঠাকুর বলে। ইঁহারা গ্রন্থিক নামেও অভিহিত হইতেন। এই প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগে ইঁহারা 'ভাট' 'চারণ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন। ভাট বা চারণগণ গীতধর্মী কবিতার সাহায্যে রাজা ও ধনী সম্প্রদায়ের কীর্তিগাথা প্রচার করিতেন। পৌরাণিক যুগেও ইঁহাদের (ভাট, চারণ) অস্তিত্ব যে ছিল

তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে আছে যে, একবার মুনিগণ মহাযশা পৃথুর গুণাবলী বর্ণনা করিয়া সূত ও মাগধকে তাঁহার স্তবকার্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে পৃথু প্রসন্ন হইয়া সূত, মাগধ, বন্দী ও চারণদিগকে তৈলঙ্গ এবং হৈহয় দেশ প্রদান করেন। তবে কথকগণ শুধুই ভগবানের স্তুতি করিতেন। প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। আলঙ্কারিকগণ 'কথা' সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 'কথকতা' ও 'কথক' নৃত্য সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে ইহার আলোচনা প্রয়োজন। ভোজ ব্যতীত ভামহ, দণ্ডী, বামন, রুদ্রত প্রভৃতি লেখকগণ কথাকে শ্রাব্য কাব্যের ভিতর গণনা করিয়াছেন। ভামহ কাব্যকে চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন। চতুর্থভাগে তিনি স্বর্গবন্ধ (মহাকাব্য), অভিনেয়ার্থ (নাটক), আখ্যায়িকা ও কথা সম্বন্ধে বলিয়াছেন। দণ্ডী গদ্য আলোচনায় আখ্যায়িকা ও কথার আলোচনা করিয়াছেন। বামন বলিয়াছেন, নাটকের আরও কতকগুলি সাহিত্যিক রূপ আছে, যথা—কথা, আখ্যায়িকা এবং মহাকাব্য। রুদ্রত মহাকথা ও খণ্ডকথার ভিতর বৈষম্য দেখাইয়াছেন। মহাকথায় মহাকাব্যের কাহিনী গদ্যাকারে বলা হয় এবং ইহার মুখবন্ধে ভগবান ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রাকৃত ভাষায় পদ্যাকারেও বলা যাইতে পারে। খণ্ডকথায় অপ্রধান কাহিনী থাকে। রসের ভিতর প্রবাস-শৃঙ্গার, করুণ অথবা প্রথম অনুরাগকে অবলম্বন করিয়া ইহার কাহিনী অগ্রসর হয়। আনন্দবর্ধন পর্যবন্ধ, পরিকথা, খণ্ডকথা, সকলকথা প্রভৃতির উল্লেখ করেন। পরিকথা সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষায় কাহিনী আকারে পরিবেশন করা হয় এবং খণ্ডকথা ও সকলকথা প্রাকৃত ভাষায় পদ্যাকারে বর্ণনা করা হয়। ভোজ আখ্যানের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে তাহাকে দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ে গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—

"আখ্যানকসংজ্ঞাং তত্ লভ্যতে যত্তভিনয়ন্ পঠন্ গায়ন্।
গ্রন্থিক একঃ কথয়তি গোবিন্দবদবহিতে সদসি॥"

আখ্যানে পাঠ, গীত, অভিনয়, এই তিন প্রকারই থাকিবে। গ্রন্থিক এই তিনের সাহায্যে গোবিন্দের কথা বর্ণনা করিবেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, প্রাচীনকালে 'কথকতা'র একটি বিশেষ স্থান ছিল। এই কথকতা সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণও বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে এখনও পর্যন্ত ইহা চলিয়া আসিতেছে। কালের রথচক্রে ইহা পিষ্ট হয় নাই। গ্রন্থিকগণের উপজীবিকা ছিল 'কথকতা'। এই কথকঠাকুরগণের অভিনয় সম্বন্ধে একটি জন্মগত অধিকার ছিল। এই সম্প্রদায় হইতে কথক নৃত্যের প্রসার হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম 'কথক' হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, কথকতার পরবর্তী রূপ হইতেছে কথক নৃত্য এবং কথকতার সহিত ইহার বহু সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য ইহাকে হিন্দু-মন্দির-নৃত্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই অভিমতও দ্বিধাহীনভাবে মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ 'কথা' সম্বন্ধে আমরা যে বিবরণ পাইলাম, তাহার সহিত কথকনৃত্যের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এখনও পর্যন্ত 'কথকতা' বলিতে আমরা যাহা শুনি, তাহাকে শ্রাব্য কাব্যের অন্তর্গত বলা যায়। মধ্যযুগেও এই কথকতার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং বৈষ্ণব আচার্যগণ ইহা প্রসারের জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বৃন্দাবনের ছয়জন গোস্বামীর ভিতর রঘুনাথ ভট্ট সেখানকার প্রধান ভাগবত ছিলেন এবং তাঁহার ভাগবতী কথা শ্রবণ একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল। সুতরাং আমরা দেখিতেছি 'কথকতার' ভাষাগত পরিবর্তন ব্যতীত বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। সুতরাং কথকতা হইতে কথকের উদ্ভব হইয়াছে কি না, অথবা দুইটি সমগোত্রীয় কি না, ইহার বিচার করিতে হইলে দুইটিরই আবয়বিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করিতে হয়।

কথকতার ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইহাই স্পষ্ট হইয়াছে যে, ইহা প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির একটি বিশেষ শাখা। কিন্তু তাহা বলিয়া 'কথক' ঠাকুর ও 'কথক নৃত্য' এক নহে। প্রথমতঃ, কথকতা

বাচিক অভিনয় প্রধান। অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গীর সহিত নৃত্যের সামান্য স্থান থাকিলেও তাল প্রধান নৃত্তের কোন স্থানই নাই। অপরপক্ষে কথক নৃত্যে অভিনয় গৌণ, নৃত্ত প্রধান, বাচিকাভিনয় নাই। তবে মুখে বোল বলিবার নিয়ম আছে। ঠুংরী গান অথবা গজল গানের সহিত 'ভাও বাৎলান' হইয়া থাকে। ভাও বাৎলানর সময় শিল্পী বসিয়া স্বয়ং গাহিয়া অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাঈজী শ্রেণীর ভিতর ইহা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। অনেক সময় 'বোলের' সাহায্যে দেবতার স্তব বা স্তুতি করা হয়। সাধারণতঃ কথকতা পক্ষকাল, কথনও কথনও মাসাধিককাল ধরিয়াও চলে। অর্থাৎ একটি কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে সমাপ্ত করিতে এইরূপ সময় লাগিয়া যায়। কথক নৃত্য কোন একটি বিশেষ কাহিনীকে অবলম্বন করে না। অথবা ইহার বিষয়বস্তু যে পৌরাণিকই হইতে হইবে এইরূপ কোন বাধ্যতা নাই। অভিনয় প্রদর্শনের সময় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কোন একটি বিশেষ ভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইখানেই কথক নৃত্যের সহিত কথকতার একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কথক নৃত্যের সহিত কথকতার পার্থক্য নিম্নরূপভাবে নির্ণয় করা যাইতে পারে—

কথক	কথকতা
বাচিকাভিনয়ের সম্পূর্ণ অভাব	বাচিকাভিনয় প্রধান
নৃত্তপ্রধান	নৃত্তের সম্পূর্ণ অভাব
বিচ্ছিন্ন ঘটনার আংশিক রূপায়ণ মাত্র	একটি ধারাবাহিক পরিপূর্ণ কাহিনীর বর্ণনা

রাসনৃত্যকে কথক নৃত্যের 'জনক' বলা হয়। এইকারণে কেহ কেহ ইহার নিষ্কলঙ্ক উৎপত্তির কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুইটির তুলনামূলক বিচারের দ্বারা তাহাও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আপাতদৃষ্টিতে একটি সাদৃশ্য দেখা যায়। উত্তর ভারতে

ষোড়শতাব্দীতে ও তার পরবর্তীকালে রাসের ব্যাপক প্রচলন হয়। শুধু উত্তর ভারতে নহে, সমগ্র ভারতখণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের ভিত্তিতে 'রাসের' প্রবর্তন হয়। কিন্তু রাসের মার্গ সঙ্গীতের রূপটি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। উত্তর ভারতে রাসের ভিতর কথক নৃত্যের কতকগুলি অতি পরিচিত ভঙ্গীর সমাবেশ দেখা যায়, যথা—বাঁশুরিয়া গৎ, দাঁড়াইবার ভঙ্গী, হস্তক ইত্যাদি। এখন কথা হইতেছে যে, রাসের ভিতর কথক নৃত্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে, না রাস হইতে কথকের সৃষ্টি হইয়াছে? ইহা অতি জটিল বিতর্কমূলক বিষয়, তবু এই বিষয়ে বিচার বিবেচনার দ্বারা সঠিকভাবে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমতঃ, রাসের প্রকৃত রূপটি আমাদের জানিতে হইবে। রসের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকে লইয়াই রাসনৃত্যোৎসব হইয়াছিল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে রাস সম্বন্ধে নিম্নরূপ বর্ণনা আছে—

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥

শ্রীমদ্ভা—১০।৩৩।৩

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অলৌকিক যোগবলে একই সময় বহু কোটি কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া প্রতি দুই দুই গোপীর মধ্যে আবির্ভূত হন এবং কোটি যুগলে বিভক্ত হইয়া মণ্ডলাকারে অলৌকিক রাস নৃত্য করেন। পরবর্তীকালে নাট্যশাস্ত্রে ইহারই রূপায়ণ হয়। দ্বিতীয় শতকে রচিত নাট্যশাস্ত্রে রাসকের এবং নাট্যরাসকের উল্লেখ আছে। তাহাতে রাসক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে যে, রাসকে কোন সূত্রধার থাকিবে না, কিন্তু ইহা উৎকৃষ্ট নান্দীযুক্ত হইবে। খ্যাত নায়িকা ও মূর্খ নায়ক থাকিবে। ইহাতে চৌষট্টিটি যুগল থাকিবে। নাট্যরাসকও বহু তাললয় সমন্বিত এবং ইহাতে শৃঙ্গাররসের আধিক্য থাকিবে। দশপ্রকার লাস্যাঙ্গও থাকিবে। পরবর্তী শাস্ত্রকার শারদাতনয় তিনটি

রাসকের উল্লেখ করিয়াছেন—দণ্ডরাসক, মণ্ডলরাসক ও নাট্যরাসক। দণ্ডরাসক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

পরিভ্রমন্ত্যঃ বিচিত্রবন্ধৈঃ ইমা দ্বিষোড়শনর্তক্যঃ।
খেলন্তি তালানুগতপাদাঃ তবাঙ্গনে দৃশ্যতে দণ্ডরাসঃ॥

ইহাতে বত্রিশজন নর্তকী তালানুসারে পদক্ষেপে 'ভ্রমরী' করিয়া বিভিন্ন ভঙ্গী রচনা করিবে। সংস্কৃত তামিলগ্রন্থে বলা হইয়াছে—

"কৃষ্ণেন নির্মিতং নৃত্তং দণ্ডরাসকসংজ্ঞিতম্।"

এই নৃত্যেও নর্তকীগণ পরস্পরকে দণ্ডের দ্বারা আঘাত করিবে। পার্শ্বদেবও দণ্ডরাসকে বলিয়াছেন, যুগলে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর দণ্ডের দ্বারা অথবা হস্ততালুদ্বারা আঘাত করিবে। মণ্ডলরাসক সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যায়, বহু প্রাচীনকাল হইতে রাসের প্রচলন হইয়া আসিতেছে। তবে আমরা সাধারণতঃ যে 'রাস' দেখিয়া থাকি, তাহার সহিত ইহার যথেষ্ট প্রভেদ আছে। কারণ, কালভেদে এবং দেশের বৃত্তি ও প্রবৃত্তিভেদে ইহা ভিন্নরূপ লইয়াছে। তবুও সকল দেশের রাস নৃত্যের ভিতর একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র লক্ষ্য করি। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা সমবেত নৃত্য। পূর্বেই বলিয়াছি যে, অবস্থাভেদে, কালভেদে, দেশভেদে ইহার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন, উত্তর ভারতে রাসের পরিবর্তন কিরূপে হইল তাহাও একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

উত্তর ভারতে ঐস্লামিক রাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু-সাংস্কৃতিক প্রভাব কমিয়া যায়। কিন্তু ষোড়শশতাব্দীতে মহাপ্রভুর প্রেমের বন্যায় উত্তর ভারত প্লাবিত হইলে রাসের ব্যাপক প্রচলন হয়। দীর্ঘদিন মন্দিরের সঙ্গীত বন্ধ থাকিবার পর পুনরায় তাহা ধ্বনিত হইতে থাকে। মন্দিরে মন্দিরে, নাটমণ্ডপেও রাস অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ইহার প্রমাণও পাওয়া যায়। ফার্গুসনের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, চন্দস হইতে দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত 'ধমনর' নামক স্থানে একটি

ক্ষুদ্র গ্রামে পাহাড়ের উপর দুইটি স্তম্ভ আছে। এই দুইটি স্তম্ভকে 'রাসমন্দির' বলা হয়। এই স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ আছে—"রামজীনা রাস করায়া"। ফাগুন মাসে নাগানন্দ রামজী এই রাসের প্রবর্তন করিয়াছিলেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুদূর রাজস্থানেও রাসের প্রবর্তন হইয়াছিল এবং ইহাও সত্য যে, এইখানে ঐস্লামিক রাজ্য স্থাপনের পর কথক নৃত্যেরও ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল। কালক্রমে রাসের পরিবর্তনও আরম্ভ হয়। উত্তর ভারতে কিজন্য ইহার পরিবর্তন হইয়াছিল তাহারও যথেষ্ট কারণ আছে। ইহার অনেক কারণের ভিতর একটি কারণ হইতেছে মুসলমানগণের হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি প্রীতি। ১৩০০ শতাব্দীতে একজন উদার মুসলমান দ্বারা অপভ্রংশ মিশ্রিত পশ্চিমী রাজস্থানী ভাষায় 'রাস' নাটক লিখিত হইয়াছিল। উত্তরকালে ইহাতে অপভ্রংশ লুপ্ত হইয়া জনসাধারণের রাজস্থানী ভাষা প্রবেশ করে। অনেকে আবার সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, আভীর জাতির সামূহিক নৃত্যকে ভ্রমবশত 'লাস্যরাস' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। রাজস্থানের আভীর এবং গোপজাতির প্রচলিত প্রেমোপাখ্যানের সাদৃশ্য থাকিতে পারে এবং সেইজন্য হয়ত এইরূপ ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং রাসের বিশুদ্ধ রূপ থাকা সম্ভবপর নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ইহার ভিতর কথক নৃত্যের অনুপ্রবেশও বিচিত্র নহে। উত্তরভারতে এখনও রাসধারী সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা রাসলীলা কীর্তন করিয়া থাকেন। রাসধারীগণ নৃত্যগীত বিশারদও হইয়া থাকেন। সুতরাং ইঁহাদের দ্বারা কথকনৃত্যের বহু উপাদান রাসের ভিতর সন্নিবেশিত হওয়া অসম্ভব নহে।

কথকনৃত্যের উদ্ভব যে রাস হইতে নহে, ইহা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাই শ্রেয়। কথক নৃত্যের উদ্ভব আলোচনা করিলে এই জটিল তথ্য সরল হইতে পারে।

ভারতে যখন বিভিন্ন ধর্মের পরস্পর সংঘাতের ফলে ধর্ম বিপ্লব দেখা দিল, সেই সময় ৭১২ খৃষ্টাব্দে আরবগণ সিন্ধু আক্রমণ করিয়া

প্রথম ঐস্লামিক অভিযানের সূচনা করেন। এই সময় ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি উন্নতির সর্বোচ্চশিখরে উঠিয়াছিল। মুসলমানগণের এই অভিযান হিন্দু সংস্কৃতির উপর কোন আঘাত হানিতে পারে নাই; বরং তাঁহারাই হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহারা বাগ্দাদে হিন্দু পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য, জ্যোতিষ, দর্শন, রসায়ন প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্র আরবীভাষায় অনুবাদ করাইয়া লইয়াছিলেন। হ্যাভেল বলিয়াছেন, ইস্লামের শৈশব অবস্থায় ভারতই মুসলমানদিগকে দর্শন, ধর্মের আদর্শ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্থাপত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এই অভিযানকে ষ্ট্যান্লি লেনপোল বলিয়াছেন—"A triumph without results."

আরবগণের পর উত্তরাপথে তুর্কীগণের ভারত আক্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, মামুদ মথুরা, বৃন্দাবন ও গোয়ালিয়র জয় করিয়া হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন এবং হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার সুরু করেন। অলকোয়ামিনের বিবরণীতে আছে যে, এই সময় সোমনাথের মন্দিরে পাঁচশত দেবদাসী নৃত্য করিত। মামুদ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন এবং অনেক দেবদাসীকে ক্রীতদাসী করিয়া লইয়া যান। উত্তর ভারতে হিন্দু সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটিবার ইহাই প্রথম সূচনা। ইহার পর উত্তরভারতে ১২০৬ হইতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কী জাতীয় দাসগণ রাজত্ব করেন।

তুর্কীগণ শিল্পকলায় ভারতীয় শিল্পীগণ কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া স্থাপত্য শিল্পে ইঁহাদের হিন্দু শিল্পীদিগের শরণাপন্ন হইতে হইত। এই সকল হিন্দু শিল্পীগণ নিজেদের কল্পনানুযায়ী বাড়ীঘর নির্মাণ করিতেন। সেইজন্য তুর্কীরাজত্বের সময় স্থাপত্যে হিন্দু প্রভাব দেখা যায়। সেই সময় পর্যন্ত হিন্দু শিল্প এবং ললিতকলা স্বমহিমায় চলিবার চেষ্টা করিতেছিল। তুর্কীজয়ের পর কয়েক শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুর বহুমুখী

প্রতিভা ও সভ্যতার গতি ভীষণভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়। উত্তর ভারতে দেবদাসী প্রথা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল। তাহার পরিবর্তে বিভিন্ন দেশ হইতে আগত রূপসী নর্তকীগণ রাজ-অন্তঃপুরে স্থান পাইতেছিলেন এবং তাঁহারাই সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য গীতের চর্চা করিতেছিলেন। এইরূপে মুসলমান আক্রমণে পর্যুদস্ত উত্তর ভারতে আচার ব্যবহার, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে ধীরে ধীরে একটি বিরাট পরিবর্তন আসিতেছিল।

ইহার পর মোগলগণের ভারত আক্রমণে ইহা পূর্ণতা লাভ করে। হিন্দুদিগকে পীড়ন করিয়া এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগকে দমন করিয়া মোগলগণ তাঁহাদের প্রভাব সাহিত্যে, শিল্পে, অর্থনীতিতে ও সামাজিকতায় এইরূপভাবে রাখিয়া গিয়াছেন যে, সমগ্র উত্তরভারতে তাহার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আকবরের সময় শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। শিল্পকলার ভিতর চিত্রকলা ও সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হয়। কারণ এই দুইটি কলা নিত্যসম্বন্ধী এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। নবাবের দরবারে এই দুইটি শিল্পকলার বিশেষ সমাদর ছিল এবং ইহা বহিরাগত সংস্কৃতিকে অস্বীকার না করিয়া বরং তাহার সহিত মিশিয়া একটি নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা ভারতের শিল্পজগতে একটি নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল, একটি নূতন জাগরণ আনিয়াছিল—"The origine, nature and development of Mughal painting is similar to Mughal architecture. It is a combination of many elements. The Chinese art which was influenced by the Buddhist Indian art, Iranian and Hellenic art and Mongolian art, was introduced into Iran in the 13th century and it continued to flourish up to the 16th century. This art was carried by the Mughals into India from

Persia. In the time of Akbar it was completely absorbed by the Indian art. যদিও বহিরাগত শিল্পের সহিত ভারতীয়শিল্পের মিশ্রণ হইয়াছিল, তথাপি একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত হইতেছে যে, সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এমন কি পারস্যও ভারতের স্পর্শ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। পারস্যের অন্তর্গত 'ইরাণ' নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বহু প্রাচীনকাল হইতেই ইরাণের সহিত ভারতের একটি গভীর যোগসূত্র রহিয়াছে। 'ইরাণ' দেশের অধিবাসিগণকে 'ঐরাণ' বলা হয়। 'ইরার' গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয় এবং তাঁহার উত্তরপুরুষগণ 'ঐর' নামে পরিচিত হন। তাঁহাদের বাসস্থানের নামকরণ হইল 'ঐরাণ' অথবা 'ইরাণ'। ইঁহারা ক্রিয়াহীনহেতু ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। মনুর দশম অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ আছে। সুতরাং পারস্য সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির একটি স্বভাবগত ঐক্য রহিয়াছে। সেইজন্য দুই দেশের মিলন আরও সুগম হইয়াছিল সংস্কৃতির বিনিময়ে। পারস্যদেশ হইতে চিত্রকর এবং সঙ্গীতজ্ঞগণ আসিয়া এই মিলনের পথ সুগম করিয়াছিলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ শাহ শিল্পকলাকে ভীষণভাবে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোষবহ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে আব্দাল সামাদ এবং মীর সায়দ নামক দুইজন চিত্রকর এবং অন্যান্য শিল্পীগণ ভারতে আসিয়া দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুনের আশ্রয় লাভ করেন। ইহা ব্যতীত চার শ্রেণীর নর্তকীরও আবির্ভাব হইয়াছিল—লোলোনীস্, ডোমনীস্, হর্কীনীস্ এবং হেনসিনীস্। সুতরাং দুই দেশের নৃত্যকলার মিশ্রণ হওয়া অতি স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী ছিল। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে, এই সময় পারস্যদেশীয় অথবা তৎপার্শ্ববর্তী নৃত্যকলার সহিত ভারতীয় নৃত্যকলার সংমিশ্রণ হইয়াছিল। ইহাই কথক নৃত্য সৃষ্টির আদিকথা। মোগল বাদশাহগণের অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয়তার জন্যও এই মিশ্রণ সম্ভব হইয়াছিল। পারস্য কবিতার উক্তি, সুন্দর গীত রচনা ও

সঙ্গীত শ্রবণ বাদশাহদিগের বিশেষ প্রিয় ছিল। কথক নৃত্যেও এইরূপ বহু ফার্সী ও উর্দু ভাষার প্রয়োগ আছে। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান বিশেষ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। বহু হিন্দু ও মুসলমান গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পী ইঁহাদের সভা অলঙ্কৃত করিয়া থাকিতেন। ইঁহাদের রঙমহলে নৃত্যপটীয়সীগণের বিশেষ সমাদর ছিল। বাদশাহের এই সকল নৃত্যপটীয়সীগণই পরবর্তী কালে কথক নৃত্যের ধারক ও বাহক হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশ হইতে ইঁহাদের সংগ্রহ করা হইত। এই মিশ্রণ শুধুমাত্র সঙ্গীতেই হয় নাই—"In our dress, speech, etiquette, thought, literature, music, painting and architecture, we find the Mughal influence. (Muslim rule in India.)

এইরূপে উত্তর ভারতে বিশুদ্ধ হিন্দু সভ্যতা রূপান্তরিত হইয়া একটি নব সভ্যতার সৃষ্টি করিল, যাহা কোন হিন্দু সভ্যতা বা ঐস্লামিক সভ্যতা নহে, তাহা জাতি-নিরপেক্ষ ভারতীয় সভ্যতা। মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্য, চিত্র ও সঙ্গীত কলা হিন্দু এবং মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে উদ্ভূত বলিয়া ইহাকে ঐস্লামিক সংস্কৃতি বলা চলে না। ঐস্লামিক সংস্কৃতি বলিতে তুর্কী, আরব প্রভৃতির সংস্কৃতি বুঝি। ইহা ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারত কোনদিনই কাহাকেও ফিরাইয়া দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।"

এইভাবে যে একটি নূতন নৃত্য পদ্ধতির উদ্ভব হইল তাহা একান্তই ভারতীয় নৃত্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, নৃত্যে এই মিশ্রণের বাহক ছিলেন বিশেষ করিয়া মোগল দরবারের নর্তকীগণ। ইঁহাদের মধ্যে নানাদেশীয় এবং নানা ধর্মাবলম্বীগণ ছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ প্রথায় নৃত্যকলাদি পরিবেশন করিতেন। 'বাদসাহী আমলে' বার্নিয়েরর উক্তিতে এই বিষয়ে

আলোকপাত করা হইয়াছে—"তিনি তাঁর হারেমের বাইরের যেনর্তকীদের নিয়ে আসতেন নাচ গানের জন্য, তাদের 'কাঞ্চন' বলত। কাঞ্চন বর্ণ রূপসী যুবতী মেয়ের দল। আমীর, ওমরাহ ও মনসবদারদের বিবাহোৎসবে এরা নাচ গান করার জন্য আমন্ত্রিত হত। নৃত্যগীতকলায় রীতিমত পারদর্শী। যেমন নাচিয়ে তেমনি গাইয়ে। তাল ও মাত্রাজ্ঞানও চমৎকার। কণ্ঠের মিষ্টতাও অতুলনীয়।" এই সকল কাঞ্চনবালাদিগের ভিতর অধিকাংশ হিন্দু নারী থাকিতেন। তাঁহারা কি জাতীয় নৃত্য প্রদর্শন করিতেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে, মোগল চিত্রগুলিতে 'নাচওয়ালী' বলিয়া অভিহিত নর্তকীর নৃত্যভঙ্গী পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত ও প্রাপ্ত কাঙ্‌ড়া ও মোগল মিনিয়েচারে এইরূপ বহু ভঙ্গী পাওয়া যায়। তাহাতে কথক নৃত্যের বেশভূষা ও ভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্রে তবলাবাদকগণকে কোমরে তবলা বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্যের সহিত তবলা বাজাইতে দেখা যায়। সারেঙ্গীও কোমরে বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া বাজান হইত। এখনও পর্যন্ত রাজস্থানে এক শ্রেণীর নর্তকীর (ভগতন ও পাতুর) সহিত এইরূপ প্রথায় তবলা ও সারেঙ্গী বাজাইতে দেখা যায়। এমন কি, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও এইরূপ দাঁড়াইয়া বাজাইবার প্রথা ছিল। রাজ-স্থানে এক শ্রেণীর নর্তকীকে 'ভগতন' ও 'পাতুর' বলা হয়। এইরূপ কথিত আছে যে,'পাতুর' গণের পূর্বপরুষগণ 'গহলোত' রাজপুত ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ চিতোর অধিকার করিলে ইঁহাদের মধ্যে একটি শাখা 'লুডবা'তে ও অপর শাখা জয়সলমীরে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। দারিদ্র্যের কশাঘাতে কন্যাগণ রূপোপজীবিনীর বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। 'ভগতন'গণও নর্তকী শ্রেণীভুক্ত। মাড়বারে ইঁহাদের বসবাস। যোধপুরের মহারাজা বিজয়সিংহের সময় ইঁহাদের উৎপত্তি হয়। এইরূপ কথিত আছে যে, 'রামাবত' সাধুদিগের কন্যাগণ চরিত্রহীন হইয়া সাধু-সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। পরে ইঁহারা রূপোপজীবিনী হইতে বাধ্য হন। ইঁহাদের 'ভগতন' বলা হয়। ইঁহাদের নৃত্য কথক নৃত্যের

ভিত্তিতে সৃষ্ট। বিশেষ করিয়া রাজস্থানের লোকনৃত্যের ভিতরও কথক নৃত্যের আভাষ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত গায়ক শ্রেণীও আছেন। তাঁহাদের 'মিরাশী' বলা হয়। যাহাই হউক, ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই সকল 'কাঞ্চন বালাগণ' পরবর্তী কালে 'বাঈজী' হইয়াছিলেন। এই বাঈজীগণই কথক নৃত্যের বাহক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ মুসলমান, কেহ বা হিন্দু ছিলেন।

এই কারণেই কথকনৃত্যের ভিতর বিরুদ্ধ ধর্মভাবের সমাবেশ দেখা যায়। রাধাকৃষ্ণের কাহিনীর সহিত 'আমাদ' 'গমজা' 'সেলামী' টুকরা প্রভৃতির সমাবেশও আছে। হিন্দুগণ তাঁহাদের শিল্পকলায় স্বভাবতঃই পুরাণ, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে এবং মুসলমানগণ বাস্তবজগৎ হইতে ভাবসম্পদ আহরণ করিতেন। ষোড়শশতাব্দীতে সমগ্র উত্তরভারতে বৈষ্ণবগণের প্রাধান্য ছিল এবং হিন্দু কথক নর্তকগণের অধিকাংশ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া পরবর্তী যুগে ইহা 'নটবরী' নৃত্যআখ্যা লাভ করিয়াছে। ইহার জন্য বৈষ্ণবাচার্যগণের দানও কম মূল্যবান নহে। অনেক সময় পদাবলীর অপভ্রংশ রূপ কথক নৃত্যের বোলে দেখা যায়। ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবাচার্যগণ বৃন্দাবনের লীলা লইয়া নাটক রচনা করিতে লাগিলেন এবং তাহা জনসমক্ষে অভিনীত হইতে লাগিল। ইঁহারা যে সকল পদ রচনা করিলেন তাহাতে বাংলা ও হিন্দীর সংমিশ্রণে ব্রজবুলির প্রয়োগ হইতে লাগিল।" কথক নৃত্যে শ্লোক, কবিতা প্রভৃতির ভিতর এই সকল ব্রজবুলির প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবকাব্যেও সুমিষ্ট ব্রজবুলির বহুল প্রয়োগ ছিল, যাহা কথক নৃত্যে আমরা পাই। পরবর্তীকালে যে সকল নাটক রচিত হইতে লাগিল, তাহাতে নৃত্য ও গীতের প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। তাৎকালিক উত্তর ভারতে প্রচলিত একমাত্র কথক-জাতীয় নৃত্যই এই দাবী মিটাইতে সক্ষম হইল। কথক-জাতীয় নৃত্য এইজন্য বলিতেছি যে, তখনও পর্যন্ত কথক নৃত্যের সঠিক নামকরণ হয় নাই। এই সময় উত্তর ভারতে বৈষ্ণবধর্মের পুনরাবির্ভাব

ইসলাম্ ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহস্বরূপ ছিল। ধর্মপ্রবণ হিন্দু নর্তক-নর্তকীগণ অনুরাগবশতঃই এই সকল বৈষ্ণবীয় গীত ও কবিতার দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গীতের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরবর্তীকালে পরিবর্তিত কথক নৃত্যে পরস্পর বিরোধী ভাবের সমাবেশ হইতে লাগিল এবং বৈষ্ণব সহিত্যের প্রভাব দেখা দিতে লাগিল। ইহা ব্যতীত বল্লভাচার্য, হরিবংশনারায়ণ ভট্ট, নন্দদাস প্রভৃতি রাস রচনা করিতে লাগিলেন। মার্গনৃত্যের অবলুপ্তিহেতু রাস প্রভৃতিতে দেশী নৃত্যের প্রয়োগ হইতে লাগিল। উত্তর ভারতের মন্দিরে মন্দিরে যে নূপুরের নিক্কণ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাহা আবার সরবে বাজিয়া উঠিল। সুতরাং ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে, 'রাস' প্রভৃতি নাটিকাতে নৃত্যের দাবী পূরণ করিবার জন্য যে সকল নৃত্যের আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল, তাহার আবয়বিক রূপই ছিল কথক নৃত্যের অনুরূপ। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রাসে কথক নৃত্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল। হিন্দুযুগের পরে যে হিন্দুদিগের সংস্কৃতি উত্তর ভারতে লোপ পাইয়াছিল, তাহা ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়—"চৈতন্যদেবের শিক্ষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হইল। বাঙ্গালী পুরীতে গেল, সুদূর বৃন্দাবনের তীর্থগুলি উদ্ধার করিল, বৃন্দাবনকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবচিন্তা ও দর্শনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র করিয়া তুলিল। হিন্দুযুগের পরে আবার বঙ্গের বাহিরে পণ্ডিতের, ভক্তের ও কর্মীর গমন ও অধিষ্ঠান হইল।"

এখন আমাদের বিচার্য বিষয় হইল যে, কোন্ জাতীয় ভারতীয় নৃত্যের সহিত বহিরাগত নৃত্যের মিশ্রণ সম্ভবপর হইয়াছিল। মনে হয়, মার্গ নৃত্যের সহিত এই মিশ্রণ সম্ভবপর হয় নাই। কারণ মার্গ নৃত্য হইতেছে অভিনয়-প্রধান এবং ইহাতে শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতির পূর্ণ বিকাশ থাকা চাই। রূপসজ্জা, অঙ্গহার, করণ, হস্তভেদ প্রভৃতির যে সকল বিধান শাস্ত্রে আছে, তাহা যথাযথভাবে মার্গ নৃত্যে অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। ইহার সহিত কথক নৃত্যের বিশেষ কোন

সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে মনে হয়, বহিরাগত নৃত্যের সহিত দেশী নৃত্যের সংমিশ্রণ হইয়াছিল। দেশী নৃত্য বলিতে অঙ্গহার বর্জিত তাল-লয়সমন্বিত 'নৃত্ত' বুঝায়। কথক নৃত্যেও অঙ্গহার অপেক্ষা তাল-লয়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। দেশী নৃত্যের ভিতরও বিভিন্ন ভাগ আছে। 'চতুর দামোদর' বিরচিত গ্রন্থে উল্লিখিত 'জক্করী' নৃত্যের সহিত শব্দনৃত্যের বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শব্দনৃত্যে তৎকার শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। কথক নৃত্যেও তৎকার শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দনৃত্যে মুখে শব্দাক্ষর উচ্চারণ করিয়া এক পদকে পুরোভাগে রাখিয়া অপর পদকে অঞ্চিত করিয়া আয়ত হস্তে তৎকারে সমে আসিবার পদ্ধতির সহিত কথক নৃত্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। শব্দনৃত্যে 'সূচী' হস্তের প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু কথক নৃত্যে সূচী হস্তের প্রয়োগ দেখা যায় না। শব্দনৃত্যে 'শিখর' হস্ত করিয়া নাভি ও বক্ষের পার্শ্বে রাখিয়া 'ভ্রমরী' করিবার পদ্ধতি আছে। কথক নৃত্যেও ভ্রমরীর বহুল প্রয়োগ আছে, যদিও ঠিক এই পদ্ধতিতে করা হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শব্দনৃত্যের কতকাংশের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 'জক্করী' নৃত্যের সহিতও ইহার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 'জক্করী' নৃত্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যবনভাষাযুক্ত গীত হইবে এবং ধৃতাঞ্চল হইয়া নৃত্য করিতে হইবে। ইহাতে তিনটি লয় থাকিবে। কথক নৃত্যেও যবন ভাষার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। গজল অথবা ঠুংরী গানের সহিত কথক নৃত্যের 'ভাও' বাৎলানো হইয়া থাকে। ইহাতে উর্দু ও ফার্সী কথার প্রয়োগ থাকে। ধৃতাঞ্চল হইয়া নৃত্য করিবার প্রথা নাই বটে, তবে তাহার ছায়াপাত আছে। যথা 'ঘুংগট' গৎটি কথক নৃত্যের একটি বিশেষ অঙ্গ। ইহাতে বিভিন্ন ভাবে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিবার পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। শুধু ইহাই নহে, 'জমনকা' ঠুংরী গানে ভাব প্রদর্শনের একটি বিশেষ ভঙ্গী। ঠুংরী গানে 'ভাও বাৎলানোর' সময় সূক্ষ্ম রেশমী ওড়নাতে

মুখ আবৃত করিয়া বসিতে হয়। ইহাকে 'জমনকা' বলা হয়। সুতরাং ধ্রুতাঞ্চলের সহিত কিছুটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যবন ভাষার বহুল প্রয়োগ, ঐস্‌লামিক বেশভূষা, সেলামী টুকরা, বাদশাহদিগের এই নৃত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ, গৎ প্রভৃতি ভাবের ভিতর যবনোচিত ভাবের প্রকাশ ইত্যাদিতে এই ধারণাই ঘনীভূত হয় যে, কথক নৃত্য যবন নৃত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। 'জক্করী' নৃত্যও যে যবন ও ভারতীয় নৃত্যের মিশ্রণ নহে, তাহাও সঠিক ভাবে বলা যায় না। এই জক্করী নৃত্যই যে কালক্রমে 'কথক' নৃত্যে রূপান্তরিত হয় নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? যাহাই হউক, ইহা নিঃসন্দেহ যে, মিশ্রণ সুরু হইয়াছিল। 'চতুর দামোদর' ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর গুণী। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'সঙ্গীত দর্পণ' নামক পুস্তকটি ভারতের মধ্যযুগীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। দুইটি হস্তলিখিত পুস্তক ও দুইটি মুদ্রিত পুস্তক হইতে ইহার তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইনি ভরতের নাট্যশাস্ত্র ও শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' হইতে চারিটি অধ্যায় লইয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি সেই সময়ে প্রচলিত নৃত্য পদ্ধতি এবং তাল সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়াছেন, যাহার বিবরণ আমরা পূর্ববর্তী সঙ্গীত শাস্ত্রগুলিতে পাই না। এই কারণে এই পুস্তকটি অত্যন্ত মূল্যবান। এই পুস্তকটিতে 'জক্করী' নৃত্যের উল্লেখ আছে, যাহার উল্লেখ অন্য কোন সঙ্গীতগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

দুইটি ধর্মের প্রভাবের ফলে কথক নৃত্যের আবয়বিক ভঙ্গীতেও দুইটি ধর্মীয় রীতি অনুসৃত হয়। কথক নৃত্যের প্রারম্ভে সেলামী টুকরা ও প্রণামী টুকরার প্রয়োগ দেখা যায়। বাদশাহ বা আমীর ওমরাহদিগের সম্মুখে নৃত্য আরম্ভ করিবার পূর্বে—আজানুনত হইয়া সম্রাটকে অভিবাদন জানাইতে হইত। নৃত্য-পটীয়সীগণ সেলামী টুকরার দ্বারা বাদশাহ অথবা ধনী ব্যক্তিদিগকে অভিবাদন জানাইতেন।

যাঁহারা ইস্‌লামধর্মী ছিলেন তাঁহারা ধর্মনির্বিশেষে সকলকেই সেলামী টুকরার দ্বারা অভিবাদন করিতেন। কিন্তু কালক্রমে হিন্দুগণ সেলামী টুকরার পরিবর্তে প্রণামী টুকরা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। হিন্দু নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী নাট্যারম্ভের পূর্বে দেবতাগণের স্তুতি, প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবার রীতি আছে। এই প্রথা অনুযায়ী প্রণামী টুকরার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে রঙ্গদেবতাকে প্রণাম জানানো হয় এবং সমাগত দর্শকমণ্ডলীকেও অভিবাদন করা হয়। ইহাতে যেমন পনঘট, ছেড়ছাড়, গোবর্ধন ধারণ, কালিয়মর্দন, হোরী, কিষণজীকা গৎ, রাধাজীকা গৎ প্রভৃতি আছে, সেইরূপ বহু উর্দূ বা ফার্সী কথার ব্যবহারও আছে। ওয়াজিদ আলি শাহর 'সৌত অল মুবারক' গ্রন্থে বহু প্রকার গতের উল্লেখ আছে—পরী, সালামী, ফরিয়াদ, মুকুট, অঞ্চল, মুস্কুরাতি, মউআদ্দব, হুস্ন, ঘুঙ্ঘট, মেহবুব, নাজ, গমজা, অদা, সাইকা, দো দোস্তি, মেহবুবা, যাদু। "মদন উল মুসিকিতে" ২১টি গতের উল্লেখ আছে। সুতরাং বিরুদ্ধ ধর্ম্মভাবের প্রভাব যে আছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

মোগল সাম্রাজ্যের অন্তে সঙ্গীতের বিশেষ অনাদর হইতে লাগিল। রক্ষণশীল ইসলাম্‌ধর্মী ঔরঙ্‌জেব সঙ্গীতের পরিপন্থী ছিলেন। ইংরাজদিগের আগমনের সহিত এই সকল শিল্পীগণও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। রাজ্য হইতে জীবিকা নির্বাহের জন্য নির্ধারিত অর্থও বন্ধ হইয়া গেল। বাধ্য হইয়া ইঁহারা ধনীব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জনে সঙ্গীত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই 'বাঈজী' শ্রেণীভুক্ত হইলেন। রাজস্থানে পূর্ব উল্লিখিত মিরাশী সম্প্রদায় মুসলমান ছিলেন। ইঁহাদের ব্যবসায় হইতেছে সঙ্গীত। ইঁহারা বাঈজী স্ত্রীলোকদিগকে নৃত্য গীত শিক্ষা দিতেন। কথিত আছে যে, ইঁহাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল চন্দন। কিন্তু বাদশাহের আদেশে কয়েকজন হিন্দুর প্রাণরক্ষার্থে তিনি মুসলমান হইয়াছিলেন। রাজস্থানে সঙ্গীত-উপজীবীদিগের ভিতর অধিকাংশই স্ত্রীলোক, এবং ইহাদের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা দশগুণ বেশী।



বিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী শম্ভু মহারাজ

মোগল দরবারে কথকনৃত্যের একটি দৃশ্য





ভারতীয় সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত
পরিচালনায়—শ্রীরবি রায়চৌধুরী

রাজস্থানী লোকনৃত্যের একটি দৃশ্য



ঔরঙ্‌জেবের সময় সঙ্গীতের গতি স্তিমিত হইলেও লক্ষ্ণৌএর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলির সময় ইহা পুনরায় নূতনরূপে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। নবাব ওয়াজিদ আলি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং ইহার পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁহার সময় হিন্দী নাট্য-সাহিত্যে এবং রঙ্গমঞ্চে 'ইন্দর সভা' নাটিকাটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই নৃত্যগীত বহুল নাটকটি 'কেশরবাগ' নামক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। কথিত আছে যে, স্বয়ং বাদশাহ ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাদশাহর সভাকবি 'অমানত' ইহার রচয়িতা ছিলেন। বাদশাহেরই নির্দেশে তিনি নাকি ইহা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা হয়। অমানত জনসাধারণের জন্যই ইহা লিখিয়াছিলেন। ইন্দর সভাতে হিন্দু ও মুসলিম তথ্যের অপূর্ব মিশ্রণ হইয়াছে। একদিকে ইন্দ্র, ইন্দ্রসভা প্রভৃতি রহিয়াছে, অপর পক্ষে শাহাজাদা, পরী, হুর প্রভৃতির কথাও রহিয়াছে। গানের ভিতরও হিন্দু দেবতার কথা রহিয়াছে—"কাহ্না কো সমঝাত না কোই," ইহার ভিতরই মুসলমান শাহজাদার উল্লেখও আছে—"কাঁহা হ্যায় গুঁইয়া শাহজাদা জানী প্যারা।" ভাষার ভিতরও লক্ষ্ণৌর উর্দু, অবধী ও ব্রজভাষার প্রয়োগ আছে। ইহার বিষয়বস্তু কিছু ভারতীয় কিছু ফার্সী তথ্য হইতে লওয়া হইয়াছে। যাহাই হউক, ইন্দর সভায় বাদশাহ কোনদিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নাই। অমানত ইন্দরসভা রচনার প্রেরণা পান 'রাসলীলা' হইতে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি ইহাতে 'রহস' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রাসের অপভ্রংশ হইতেছে 'রহস'। ওয়াজিদ আলি শাহও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক নৃত্য-গীত বহুল কতকগুলি নাটিকা রচনা করেন। ইহাদিগকে 'রহস' বলা হইত। সুতরাং আমাদের নিকট স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কথক নৃত্যে দুইটি বিপরীত মুখী সংস্কৃতির মিলন হইয়াছিল।

কথক নৃত্যের 'কথক' নামকরণও বেশীদিন হয় নাই। তবে এই নামকরণ লইয়া বহু বিবাদ ও মারামারি হইয়াছিল। কেহ কেহ

বলেন, এলাহাবাদের অন্তর্গত হণ্ডিয়াতহশীল গ্রামের কথকঠাকুরগণ ইহা উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'কথক'। ইহাকে পূর্বে 'অরখা' নৃত্য বলা হইত। এই মতাবলম্বীগণ বলেন, 'অরখা'-নিবাসী বিষ্ণুপাল এই নৃত্যের আবিষ্কারক এবং তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম 'অরখা' নৃত্য। ঈশ্বরপ্রসাদজী ইহার নাম রাখেন 'নটবরী কথক নৃত্য'। নটবরী নামের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পাইতেছে যে, তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, নটবর শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন দিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এই নৃত্যের সংস্কার করেন এবং ইহার নাম 'নটবরী' রাখেন। নামকরণ লইয়া দুই দলের ভিতর প্রচণ্ড বিবাদ উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 'কথক' নামকরণই স্থির হয়। সুতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইহার পূর্বে এই নৃত্য বিশেষ কোন নামে অভিহিত হইত না। অথবা ইহার প্রকৃত নাম লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

'কথক' নৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন এলাহাবাদের অন্তর্গত হণ্ডিয়া তহশীল নিবাসী ঈশ্বরপ্রসাদজী। ইনি কথক শ্রেণীভুক্ত মিশ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র—অড়গুজী, খড়গুজীও তুলারামজী পিতৃ-প্রদত্ত শিক্ষায় বিশারদ হইয়া উঠেন। কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদজীর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়া খড়গুজী নৃত্য ছাড়িয়া দেন এবং তুলারামজী বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। কিন্তু অড়গুজী তাঁহার তিন পুত্রকে নৃত্যে সুদক্ষ করিয়া তোলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনপুত্র প্রকাশজী, দয়ালজীও হরিলালজী লক্ষ্ণৌ আসেন। প্রকাশজী নবাব আসিফুদ্দৌলার সভানর্তক নিযুক্ত হন। প্রকাশজীর তিন পুত্রের ভিতর ঠাকুর প্রসাদজী ওয়াজিদ আলি শাহের সভানর্তক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হন। ওয়াজিদ আলি শাহও কথক নৃত্যে বিশেষ অনুরাগী ও দক্ষ হইয়া উঠেন। তিনি বিশেষ করিয়া এই নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ইঁহাদের এই ঘরানা 'লক্ষ্ণৌ ঘরানা' বলিয়া পরিচিত। এই সময় লক্ষ্ণৌ ঘরানা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে অনুসরণ করিয়া বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠে। ঠাকুরদাসজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদজীর তিনপুত্র বৃন্দাদীন,

কালকাপ্রসাদ ও ভৈঁরোপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ ঘরানার শ্রী ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। বৃন্দাদীন ছিলেন ভাবজগতের শিল্পী। তাঁহার নৃত্যের ভিতর দিয়া রসের স্ফুরণ হইয়াছিল। বৃন্দাদীন ও কালকাপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ ঘরানার নৃত্য পদ্ধতির বিশেষ ভাবে উকর্ষ সাধন করেন। কালকাপ্রসাদজী ছিলেন বিখ্যাত তবলাবাদক। বৃন্দাদীন মহারাজ ভাব ও অভিনয়ের উপর প্রাধান্য দিয়াছিলেন এবং কালকাপ্রসাদ তাল ও ছন্দের উপর প্রাধান্য দিয়াছিলেন। সুতরাং ভাব ও ছন্দের অপূর্ব মিলন হইয়াছিল। এক কথায় বলা যাইতে পারে, লক্ষ্ণৌ ঘরানা ভাবপ্রধান অথবা নৃত্য প্রধান। ইহাতে হস্তক, অভিনয় প্রভৃতির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। নৃত্যের বোলগুলি শ্রুতিমধুর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। স্বর্গগত অচ্ছান মহারাজ ও ঝণ্ডে খাঁ—এই নৃত্যের প্রসারের জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইঁহারা দুইজনেই কালকা বৃন্দাদীন মহারাজের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। শম্ভু মহারাজও লক্ষ্ণৌ ঘরানার কথক নৃত্যকে জনসমক্ষে বিশেষ পরিচিত করিয়া তোলেন। ইহা ব্যতীত বিরজু মহারাজ, সিতারা, রামনারায়ণ মিশ্র, লচ্চু মহারাজ প্রভৃতি এই ঘরানার এক একটি দিক্‌পাল।)

(জয়পুর ঘরানার পৃষ্ঠপোষকতা করিত রাজস্থানের রাজ্যগুলি। এই ঘরানার প্রবর্তক ছিলেন ভানুজী। ইহার অনেকগুলি শাখা আছে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এক সময় জয়পুর ঘরানার বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। ভানুজী ছিলেন পরম বৈষ্ণব। কিংবদন্তী আছে যে, ইনি একজন সাধুর নিকট শিবতাণ্ডব শিক্ষা করেন ও তাঁহার পুত্র মালুজীকে ইহা শিক্ষা দেন। মালুজীর দুই পুত্র লালুজী ও কানুজী জন্মগত অধিকারে ইহা শিক্ষা করেন। কানুজী লাস্যভাব শিক্ষা করিবার জন্য বৃন্দাবনে যান এবং কৃষ্ণভক্ত হন। কানুজীর উত্তরপুরুষগণ পুরুষানুক্রমে এই নৃত্য শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন। কানুজীর দুই পুত্র 'গীধাজী' ও 'শোভাজী'ও এই শিক্ষা লাভ করেন। গীধাজীর পাঁচপুত্রের ভিতর দুলহাজী লাস্য ও তাণ্ডব উভয় পদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী হইয়া জয়পুরে বাস করিতে থাকেন। ইহিই

জয়পুর ঘরানার মেরুদণ্ড। দুলহাজী জয়পুরে যাইয়া গিরিধারীজী বলিয়া পরিচিত হন। গিরিধারীজীর দুই পুত্রের ভিতর হরিপ্রসাদ নিঃসন্তান ছিলেন। হনুমানপ্রসাদজীর তিন পুত্র ছিল। মোহনলাল, চিরঞ্জীলাল ও নারায়ণ প্রসাদ। হনুমানপ্রসাদজী নৃত্যবিশারদ হইয়া উঠেন। হরিপ্রসাদ ও হনুমানপ্রসাদের খুল্লতাত ভাইদিগের ভিতর চুনীলাল তাঁহার পুত্রগণকে নৃত্যে বিশেষ দক্ষ করিয়া তোলেন। জয়লাল ও সুন্দরপ্রসাদ জয়পুর ঘরানার দুই বিখ্যাত দিক্‌পাল। পূর্বোক্ত হরিপ্রসাদ ও হনুমানপ্রসাদ জয়পুরে 'গুণীজনখানাতে' সভানর্তক ছিলেন। হনুমানজীর নৃত্য লাস্যপ্রধান ছিল এবং হরিপ্রসাদের নৃত্য নৃত্তপ্রধান ছিল। শ্যামলাল, চুনীলাল, দুর্গাপ্রসাদ ও গোবর্ধনজী জয়পুর ঘরানার আর একটি শাখা বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহারা শঙ্করলাল নামক একজন বৃদ্ধ গুণীর নিকট শিক্ষালাভ করেন। চুনীলালের সুযোগ্য দুই পুত্র জয়লাল ও সুন্দরপ্রসাদ এই ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাচার্য।)

আরও একটি ঘরানার কথা ইদানীং শুনা যাইতেছে। ইহাকে 'বেনারস ঘরানা' বলা হয়। জয়পুর ঘরানা পূর্বে 'শ্যামলদাস ঘরানা' বলিয়া বিশেষ পরিচিত ছিল। এই ঘরানা পরবর্তীকালে দুইটি ঘরানায় বিভক্ত হয়। একটি জয়পুর এবং অপরটি বেনারসের জানকীপ্রসাদ ঘরানা। জয়পুর ঘরানা জয়পুরে বিকাশ লাভ করে এবং জানকীপ্রসাদ ঘরানার বেনারসে স্থিতি হয়। জানকীপ্রসাদের তিন শিষ্যের ভিতর চুনীলাল রাজস্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং দুলহারাম ও গণেশীপ্রসাদ বেনারসে চলিয়া যান। দুলহারামের তিন পুত্রের ভিতর বিহারীলাল ইন্দোরের সভানর্তক নিযুক্ত হন এবং বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বিহারীলালের তিনপুত্র কিষণলাল, মোহনলাল ও সোহনলাল দেরাদুনে থাকেন। বিহারীলালের ভ্রাতা হীরালাল বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। জানকী প্রসাদের ভাই গণেশীলালের তিন পুত্র হনুমান প্রসাদ, শিবলাল ও গোপালদাস খ্যাতনামা শিল্পী।

শিবলালের তিনপুত্র সুখদেব, দুর্গাপ্রসাদ এবং কুন্দনলাল কথক নৃত্যের ধারক ও বাহক। জয়পুর ঘরানার প্রথম মহিলা শিল্পী ছিলেন আশা ওঝা। ইহা ব্যতীত ৺জয়কুমারী, রোশনকুমারী, রামগোপাল প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্ণৌ ঘরানায় লাস্যের আধিক্য ছিল; কিন্তু জয়পুর ঘরানায় তাণ্ডবের প্রয়োগ হইয়াছিল। সেইজন্য জয়পুর ঘরানায় নৃত্য অপেক্ষা নৃত্তের অধিক প্রয়োগ। ইহাতে তাল-লয়ের সূক্ষ্ম বিচারের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়। নৃত্যের বোলগুলিও অপেক্ষাকৃত বড় বড় এবং ইহাতে নানাপ্রকার শব্দের সমাবেশ হইয়াছে। পদসঞ্চালনের বিভিন্ন ক্রিয়া ও চক্রাকারে ছেদহীন ভ্রমরী দর্শকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। বেনারস ঘরানায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন গোপীকিষেণ। যদিও পরবর্তীকালে তিনি অন্যান্য ঘরানায়ও দক্ষতা লাভ করেন।

কথক নৃত্যে বংশপরম্পরায় ঘরানার বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। কখনও কখনও ইহা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। বংশগত সম্পত্তির ন্যায় এই বিবাদের সূত্র সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, এই বিবাদের মূলে যে কারণগুলি পরোক্ষভাবে নিহিত রহিয়াছে তাহা শিল্পের বিশেষ পরিপন্থী। এই বিষয়ে একটু আলোকপাত করিবার চেষ্টা করিতেছি। সম্ভবতঃ বিবাদের প্রথম সূত্রপাত হয় ধর্ম লইয়া। লক্ষ্ণৌ ঘরানার প্রবর্তক ঈশ্বরপ্রাসদজী ছিলেন বৈষ্ণব এবং জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক ভানুজী ছিলেন শৈব। বৈষ্ণব ও শৈবদিগের ভিতর কোনকালেই সম্প্রীতি ছিল না। মনে হয় বিবাদের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। ইহার পর কথক নর্তকগণ এক একটি রাজ্যের সভানর্তক হইয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর রাজ্যের নাম করিতে হয়। লক্ষ্ণৌ ছিল মুসলমান শাসিত এবং জয়পুর ছিল হিন্দু শাসিত। শিল্পক্ষেত্রে দুইরাজ্যের গৌরব ও মান অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য প্রয়াস ছিল। সুতরাং দুইরাজ্যের বেতনভোগী শিল্পীদিগের ভিতর বিবাদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে ধর্ম এবং রাজ্যের

গৌরবলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেও বিবাদের শেষ হয় নাই। বংশগত সূত্রে তাহা প্রতিভার লড়াইতে পর্যবসিত হয়। বিংশ শতাব্দীতেও এই বিবাদের শেষ হয় নাই। নিতান্তই গুরুর নির্দেশ বলিয়া এই বিবাদ এখনও পর্যন্ত চলিতেছে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, এই বিবাদের এখন কোন প্রয়োজন নাই। কারণ যুগপরিবর্তন হইয়াছে। এই যুগ হইতেছে অগ্রগতির যুগ। নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নৃত্যের ব্যাপ্তি অব্যাহত রাখিতে হইবে, জনপ্রিয়তা বর্ধিত করিতে হইবে। কিন্তু এক একটি ঘরানার কঠোর রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য ইহার পরিধি সীমিত হইয়া আসিতেছে। এই অযৌক্তিক রক্ষণশীলতা ত্যাগ না করিলে জ্ঞানের ভাণ্ডার ক্রমশঃই শূন্য হইয়া পড়িবে। ইহা পথভ্রষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় অনেকে ইহার সংস্কার করিতেও চাহেন না। কিন্তু এই বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছিলেন বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মেনকা। তিনি অতি দৃঢ়তার সহিত নৃত্যাভিনয়ে কথকের প্রয়োগ করেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটককে কথকের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া ইহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। যাহাই হউক, দুইটি ঘরানাই আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। জয়পুর ঘরানা সূর্যের রশ্মির ন্যায় প্রখর, কিন্তু লক্ষ্ণৌ ঘরানায় এইরূপ তীব্র চমক না থাকিলেও ভাবের সৌন্দর্যে ইহা চন্দ্রকিরণের ন্যায়ই স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করে। তাই বলিয়া দুইটি ঘরানায় দিন-রাত্রির ন্যায় প্রভেদ নাই। ইহার ভিতর যে সূক্ষ্মভেদ রহিয়াছে তাহা সাধারণের নিকট বিশেষ বোধগম্য হয় না। ঘরানার বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া ইহা একমাত্র 'কথক' নৃত্য বলিয়া পরিচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কথক নৃত্যে শাস্ত্র বর্ণিত হস্তভেদের বিধিবদ্ধ প্রয়োগ নাই। হস্তভেদের বিভিন্ন নাম ও তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে যেরূপ বর্ণনা আছে, কথক নৃত্যে সেই নিয়মানুযায়ী হস্ত ভেদের প্রয়োগ করা হয় না। কথক নৃত্যে 'হস্তক' কথাটির প্রয়োগ হয়। হস্তক বলিতে

এক কথায় বলা যাইতে পারে, সমগ্র হস্তের প্রয়োগ রীতি। যে ভাবটি প্রকাশ করা হয় তাহারই নামানুসারে হস্তকের নামকরণ করা হয়। যেমন 'বীণাবাদিনী' অর্থাৎ বীণা বাজাইবার ভঙ্গীটির মতন হাত করিতে হইবে। কিন্তু বীণাবাদিনী বুঝাইতে যে সূচী এবং অলপদ্মের মিশ্র হস্তের প্রয়োগ করিতে হয়, সেই কথাটি বলা হয় না বলিয়াই অজানা রহিয়া গিয়াছে। হস্তের দ্বারা লৌকিকবস্তুর অনুকরণ করা হয়। সেইজন্য ইহাকে আংশিকভাবে লোকধর্মী বলা যাইতে পারে।

কথক নৃত্যের কয়েকটি অংশ আছে—ঠাট, আমদ, তোড়াটুকরা, পঢ়ন্ত, গৎভাব ও লয়কারী।

ঠাট—কথক নৃত্যের প্রারম্ভে ঠাটের প্রয়োগ হয়। তবলার ঠেকার সহিত চক্ষু, ভ্রূ, মণিবন্ধ প্রভৃতির মৃদুচালনাকে 'ঠাট' বলা হয়। যেমন ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে ঠাটের দ্বারা রাগের পরিচয় দেওয়া হয়, সেইরূপ ঠাট হইতেছে নৃত্যের পূর্ব পরিচিতি। ইহা দ্বারা লয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

কসক-মসক—এই শব্দটি কথক নৃত্যে প্রায় শুনা যায়। কিন্তু ইহার সঠিক ব্যাখ্যা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা খুবই শক্ত। ইহা হইতেছে লাস্যপর্যায়ভুক্ত। ঠাট করিবার সময় ইহার প্রয়োগ হয়। লয়কে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় কোন একটি বিশেষ বোলের শব্দের বিস্তৃতি, কম্পন অথবা রেশটিকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় শুধুমাত্র দেহের উপরার্ধের ভঙ্গী ও গতির দ্বারা প্রকাশ করিলে তাহাকে 'কসক-মসক' বলা হয়। অনেকের মতে, ঠাটের সময় লয়ের সহিত যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োগ হয় তাহাকে 'কসক-মসক' বলা হয়।

আমদ—'আমদ' শব্দটির অর্থ হইতেছে 'প্রবেশ'। প্রণামের পর যে টুকরাটি নৃত্যে প্রদর্শিত হয়, তাহাকে 'আমদ' বলা হয়। ইহা লইয়া বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও মতে কথক নৃত্যের প্রথম করণীয়কে 'আমদ' বলা হয়। প্রথম করণীয়ের ভিতর দাঁড়াইবার নিয়ম, ঠাট প্রভৃতিকে গণ্য করা হইয়াছে। আবার কাহারও

মতে প্রথম টুকরাটি হইতেছে 'আমদ'। এই শব্দটি উর্দু শব্দ হইতে আসিয়াছে এবং নৃত্যে ইহার প্রয়োগের অর্থ খুব সুস্পষ্ট নহে।

'প্রণামী' টুকরা ও 'সেলামী' টুকরা সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এক অথবা দুই আবর্তের ভিতর ছোট ছোট বোলকে 'টুকরা' বলা হয়।

তোড়া—কতকগুলি শব্দাক্ষরকে তবলার ঠেকার তিন বা ততোধিক আবর্তনের ভিতর প্রয়োগ করিলে 'তোড়া' হয়। ইহাতে বিভিন্ন লয় ও তেহাই প্রভৃতি থাকে।

পরণ—সাধারণতঃ পাখোয়াজের বোলকে 'পরণ' বলা হয়। অনেক সময় বড় বড় বোলকেও 'পরণ' বলে।

পরমেলু—ইহা তবলা জাতীয় বিভিন্ন বাদ্যের বোলের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে।

নটবরী বোল—যে সকল বোলের ভিতর তা, থেই ইত্যাদি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাকে 'নটবরী' বোল বলা হয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনার নীল জলে কালীয় নাগকে দমন করিয়া যখন তাহার ফণার উপর নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন এইরূপ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল।

কবিতা—কোন কবিতাকে যখন তাল-লয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন তাহাকে 'কবিতা' বলা হয়।

শ্লোক—ইহাতে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ থাকে। ইহার দ্বারা দেবতার প্রশস্তি অথবা স্তুতি করা হয়।

তৎকার—কথক নৃত্যের প্রারম্ভিক পদবিক্ষেপকে 'তৎকার' বলা হয়। লয়কারী করিবার সময় ইহার প্রয়োগ হয়। ইহা সম্যগ্‌ভাবে করায়ত্ত করিতে না পারিলে ইহার সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব হয় না।

গৎ ও গৎভাব—'গৎ' শব্দটি গতির অপভ্রংশ। 'গৎ'-এ কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক একটি বিশেষ ভঙ্গীকে তাল-লয় সহকারে গতির ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন বাস্তবভাবের অনুকরণ

করিয়া অভিনয় করিলে তাহাকে 'গৎকারী' বলা হয়। এইরূপ অভিনয় যখন কোন আখ্যায়িকার অংশবিশেষকে অবলম্বন করিয়া করা হয়, তখন তাহাকে 'গৎভাব' বলা হয়। ঠুংরী গানের সহিত যে অভিনয় করা হয়, তাহাকে 'ভাও বাৎলানো' বলা হইয়া থাকে। কথক নৃত্যে এই ভাবকে পুনরায় বিভিন্নভাবে ভাগ করা হইয়াছে ; যথা—নয়নভাব, বোলভাব, অর্থভাব, সভাভাব, নৃত্যভাব, গৎ-অর্থ ভাব ও অঙ্গভাব।

নয়নভাব—ইহাতে গীতের ভাবকে ভ্রূ ও নেত্রের দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বোলভাব—'ঠুংরী' গানের যতগুলি শব্দ আছে, ততটুকু ভাবের প্রকাশকে 'বোলভাব' বলা হয়।

অর্থভাব—গীতের বিষয় অনুসারে যখন ভাব প্রকাশ করা হয় এবং নর্তক যখন স্বয়ং বিষয়বস্তুর স্বরূপ হন, তখন তাহাকে 'অর্থভাব' বলা হয়।

সভাভাব—নর্তক দর্শকের সম্মুখে ভাব প্রকাশ করিলে দর্শকগণ যদি তদ্গতভাবে বিভাবিত হন, তাহা হইলে 'সভাভাব' হয়।

নৃত্যভাব—নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাব প্রকাশকে 'নৃত্যভাব' বলা হয়।

'গৎ-অর্থভাব'—নৃত্য, গীত ও অভিনয় একই সঙ্গে করা হইলে তাহাকে 'গৎ-অর্থভাব' বলা হয়।

অঙ্গভাব—গীতের অর্থকে অঙ্গ-চেষ্টার দ্বারা প্রকাশ করিলে তাহাকে 'অঙ্গভাব' বলা হয়।

ঘুমরিয়া—যে কোনদিকে চক্রাকারে ঘূর্ণনকে 'ঘুমরিয়া', 'চক্কর', অথবা 'ফিরকনী' বলা হয়।

পাল্টা—সাধারণতঃ বোলের ক্রম-পরিবর্তনকে 'পাল্টা' বলা হয়। কিন্তু কথক নৃত্যে বোল অথবা গৎ লইবার সময় যে বিরতিটুকু থাকে, সেই সময়টুকু পর্যায়ক্রমে দুইদিকে ঘুরিতে হয়। তাহাকেও 'পাল্টা' বলা যাইতে পারে।

'নিকাস'—ভাব প্রকাশ অথবা গৎ লইবার পূর্বের প্রস্তুতিকে 'নিকাস' বলা হয়।

অদা—অদার অর্থ হইতেছে নৃত্যের কোন বিষয়বস্তুকে দর্শকের সম্মুখে প্রকাশ করা অথবা পেশ করা। কথক-নৃত্যে শৃঙ্গার-প্রধান গীত অথবা ঠুংরীর ভাবকে বিভিন্ন 'হস্তকের' দ্বারা প্রকাশ করাকেও 'অদা' বলা হয়।

ইহা ব্যতীত কথক নৃত্যের সাতটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা—লক্ষণনৃত্য অথবা ঠাট, নৃত্যাঙ্গ, জাতিশূন্য, ভাবরঙ্গ, ইষ্টপদ, গতিভাব ও তরানা।

লক্ষণ-নৃত্য—ঠাটের অংশকে 'লক্ষণ-নৃত্য' বলা হয়। ইহার দ্বারা কথক-নৃত্যের লক্ষণটি পরিস্ফুট করা হয়।

নৃত্যাঙ্গ—ইহাতে নৃত্যের বিবিধ রূপ প্রদর্শন করা হয় এবং লয়কারী, জাতি ও তৎকার প্রভৃতির সমাবেশ থাকে।

ভাবরঙ্গ—ইহাতে নায়ক-নায়িকার ভেদকে সাহিত্যপরণ, ভাবপরণ ও স্বরজাতির দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ইষ্টপদ—ইহাতে কবিতার দ্বারা ইষ্টদেবকে স্তুতি করা হয়।

গতিভাব—ইহাতে সাধারণত ঠুংরীর অর্থ প্রকাশ হয়।

তরানা—ইহাতে স্বরসংযোগের সহিত সঙ্গীত-পরণ ও সাহিত্য-পরণের প্রয়োগ হয়।

মণিপুরী



"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়॥"

—বিদ্যাপতি

মণিপুরী নৃত্য

"দেই তুলসী তিল
দেহ সমর্পিলুঁ।"—বিদ্যাপতি

গোবিন্দজীর মন্দিরে রাসের সময় অগণিত ভক্তবৃন্দের মাঝে নৃত্য করিতে করিতে মৈতৈগণ সত্যসত্যই দেহ ও হিয়া সেই রসময় কিশোর ঠাকুরটির পদতলেই অর্পণ করেন। তাঁহারা মনে করেন, সকলই সেই রসময়ের। নৃত্য করিতে করিতে এবং দেখিতে দেখিতে সকলেই তদ্‌গতভাবে বিভাবিত হন।

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।"

ভক্তপ্রাণ পরম বৈষ্ণব মৈতৈগণও চিরদিনের জন্য হৃদয় মন্দিরে মাধবকে বন্দী করিয়া আনন্দের শেষ কণিকাটুকুও আহরণ করিয়া লইতে চান। তাঁহাদের আনন্দের মেলায় গোবিন্দজীকে উৎসর্গীকৃত নৃত্য করিবার জন্য মণিপুরী নর্তকীগণ যখন সূক্ষ্ম ওড়নাতে মুখখানি ঢাকিয়া, অলকাতিলকাশোভিত হইয়া, চরণে নূপুরের ঝঙ্কার তুলিয়া মণ্ডলীতে নৃত্য করেন, তখন মনে হয়, সত্যই মৈতৈগণের আনন্দের আর অবধি নাই।

পূর্বে মণিপুরী নৃত্যকে লোকনৃত্যের ভিতর গণ্য করা হইত। কিন্তু রাস নৃত্য প্রবর্তনের পর ইহাকে আরও উচ্চ পর্যায়ে উঠাইবার জন্য ইহাতে গুরুত্ব আরোপ করিয়া 'মার্গ নৃত্য' বলা হইয়াছে। মৈতৈগণ বলেন, হাজার বৎসর পূর্বেও মণিপুরী নৃত্য প্রচলিত ছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মণিপুর অতি প্রাচীন দেশ বলিয়াই পরিচিত। মহাভারতের আদি ও অশ্বমেধ পর্বে মণিপুরের উল্লেখ আছে। মহাভারতের বর্ণনানুসারে বীর চূড়ামণি অর্জুন এক সময় দ্বাদশবর্ষব্যাপী বনবাসকালে পর্যটনে বাহির হন। এই সময় তিনি দুইটি বিবাহ

করেন। প্রথম বিবাহ হয় গঙ্গাদ্বারের (হরিদ্বারের) নাগ বংশীয় নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলুপীর সহিত এবং দ্বিতীয় বিবাহ হয়, মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত। মহাভারতে আছে, নাগকন্যা উলুপী অর্জুনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জলের নীচে পাতালে টানিয়া লন। ইহার পর তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল এবং উলুপীর গর্ভে ইরাবান্ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। দ্বিতীয় বিবাহ হয়, মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত। মূল মহাভারতে আছে—

"মণিপুরেশ্বরং রাজন্ ধর্মজ্ঞং চিত্রবাহনম্।

তস্য চিত্রাঙ্গদা নাম দুহিতা চারুদর্শনা।"—আদি, ২১৩।১৫

চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। বভ্রুবাহন অপুত্রক মাতামহ চিত্রবাহনের উত্তরাধিকারী হইয়া মণিপুর রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ইরাবান্ নাগপ্রদেশাধিপতি রূপে রাজত্ব করেন। দুই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পাশাপাশি রাজ্যের রাজা হইলেন এবং তাঁহাদের ভিতর বিবাদ লাগিয়াই রহিল। মণিপুরীগণ আর্য হিন্দু ছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কারণ ভারতের পূর্বপ্রান্তে অনার্যজাতিদিগের বাস ছিল। আর্যগণ পূর্বপ্রান্ত আক্রমণ করিয়া অনার্যদিগকে পার্বত্য অঞ্চলে তাড়াইয়া দেন। এই সকল পার্বত্যপ্রদেশের অধিবাসী অনার্যগণের উত্তর পুরুষগণ হইতেছেন নাগা, খাসিয়া, গারো ও কুকি ইত্যাদি। ইতিহাসেও এই নাগাদিগের উল্লেখ আছে। ইঁহারা ঠিক গুপ্তবংশের পূর্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সময় প্রাপ্ত প্রস্তর স্তম্ভে নাগসেন, নাগদত্ত, গণপতি নাগ প্রভৃতি রাজগণের উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দুইটি নাগবংশের উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি বংশ পদ্মাবতীতে অধুনা মধ্যভারতে ও আর একটি বংশ মথুরায় রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয় নাগবংশের উল্লেখ আছে। ইঁহারা কান্তিপুরে রাজত্ব করেন। কান্তিপুরের অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে

নাগবংশের একটি শাখা উত্তরভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু মৈতৈগণ নিজেদের গন্ধর্ববংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। আদমসুমারীতে প্রকাশ, মণিপুরে প্রায় ছয় হাজার সঙ্গীত ব্যবসায়ী আছেন। ইঁহাদের সঙ্গীতপ্রীতি দেখিয়া ইহা অস্বীকার করা যায় না। গন্ধর্বগণের অধিকাংশের বাস ছিল পুরুষপুরে এবং তাঁহারা আর্য ছিলেন। তাঁহারা সঙ্গীতকে কিরূপে ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করেন, পদ্মপুরাণে তাহার একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। একবার মানব, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, নাগ প্রভৃতি বসুন্ধরাকে দোহন করেন। গন্ধর্বগণপতি মহামতি সুরুচিকে দোগ্ধা করিয়াছিলেন এবং সুবিদ্বান চিত্ররথ বৎস হইয়াছিলেন। বসুন্ধরাকে দোহন করিবার পর এক একটি শ্রেণী বিশেষ বিশেষ দ্রব্য লাভ করিয়াছিলেন। গন্ধর্বগণ পদ্মপাত্রে গীত দোহন করিয়াছিলেন এবং ইহার দ্বারাই তাঁহারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্বগণের ব্যবসায়ই হইল সঙ্গীত পরিবেশন। সুতরাং ভারতে যে সকল বংশগত সঙ্গীত ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারা নিজদিগকে গন্ধর্বগণের বংশধর বলিয়া দাবী করিতে পারেন। মণিপুর দুহিতা চিত্রাঙ্গদা নৃত্যগীত পটীয়সী ছিলেন। তাঁহার পিতা চিত্রবাহনও গন্ধর্বদিগের বংশধর ছিলেন। চিত্রবাহনের সময় শঙ্খ, বাঁশরী প্রভৃতির প্রচলন ছিল। নৃত্যে কোমল অঙ্গহারের প্রয়োগ ছিল। শঙ্খগুলি বিভিন্নগ্রামে বাঁধা থাকিত। বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় বিভিন্ন সুরে বাজিয়া উঠিত। মণিপুরীগণ অনার্য নাগগণ কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রথম সূত্রপাত হয় মহাভারতের সময়। বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জুন নিহত হইলে নাগরাজ্য হইতে সুরঙ্গপথে মণি আনিয়া অর্জুনের জীবন দান করা হয়। মণিপুরীগণ বলেন এই মণিবাহিত সুরঙ্গপথ এখনও রাজবাড়ীতে আছে এবং এই সুরঙ্গপথের মুখে একটি সিংহবাহিত সিংহাসন আছে। এই সিংহাসনে আরোহণের সময় মণিপুর রাজগণ সর্পচিহ্নিত অঙ্গত্রাণ, উষ্ণীষ ইত্যাদি পরিধান করেন। সুতরাং তাঁহারা এককালে নিশ্চয়ই নাগপ্রভাবান্বিত

হইয়াছিলেন। এই কারণে মণিপুরে আর্যদিগের মার্গনৃত্যের বিশেষ প্রচলন ছিল না বলিয়াই মনে হয়। তবে একথা স্বীকার্য যে, সঙ্গীতপ্রিয়তা তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

মণিপুরের প্রাচীন জাতীয় নৃত্য হইতেছে লাইহারাওয়া। লাইহারাওয়া নৃত্যে শিবের উপাসনা করা হয়। মণিপুরীগণ বৈষ্ণব হইবার পূর্বে অনার্য দেবতা শিবের ভক্ত ছিলেন। ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মণিপুরী পুরাণ 'বিজয়পাঞ্চালীতে' সঙ্গীতের জন্মকথা সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহাতে শিবের উল্লেখই আছে। ইহাতে বর্ণিত আছে যে, শিব তাঁহার নধর কান্তি পুত্র গণেশের নিকট জগৎস্থষ্টির কথা বলিতে যাইয়া বলেন, সকলের গুরু 'অতিয়াগুরুশিদবা' জগৎ স্থষ্টি করেন এবং মৃত্যুহীন জগতে প্রথম মৃত্যু আনয়নের জন্য কৌদিনকে আহ্বান করেন।

জগৎ স্থষ্টির পর দেবসভার সিংহাসন লইয়া ভীষণ বিতণ্ডা সুরু হয়। দেবতাগণ মহাদেবকে রাজা হইবার জন্য অনুরোধ করেন। মহাদেব রাজা না হইয়া মন্ত্রী হইলেন এবং কার্তিক-গণেশ প্রহরী হইয়া প্রহর যন্ত্রের স্থষ্টি করিলেন। প্রহরে প্রহরে এই যন্ত্রের উপর আঘাত পড়ে এবং প্রহর পরিবর্তন হয়। এই অশ্রুত প্রহর-বাদ্যের সহিত দিন-রাত্রি-প্রহর পরিবর্তন করিতেছে। এইরূপে প্রথম সঙ্গীতের সূচনা হইল। ইহার পর ক্রীড়ার প্রবর্তন হয়। ক্রীড়ার ভিতর মহারাস প্রধান। সুতরাং মণিপুরী পুরাণ অনুসারে স্থষ্টির আদিতেই নৃত্য ও সঙ্গীতের স্থচনা। কিন্তু মণিপুরী নৃত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মণিপুরে অনেক পরে বৈষ্ণব-ধর্মের প্রভাব পড়িয়াছে এবং রাস নৃত্যের প্রচলন হইয়াছে।

মণিপুরের প্রাচীনত্বের আরও কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাহার দ্বারা সঙ্গীতবিষয়ক কতকগুলি তথ্য অনুমান করা যায়। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ধরিত্রী যখন সমুদ্রগর্ভ হইতে আবির্ভূতা হইলেন, সেই মুহূর্তে সূর্যদেব উদয় পর্বতে 'সোমনক' শৃঙ্গে

নিজেকে প্রথম প্রকাশিত করিলেন এবং সূর্যদেবের দক্ষিণ পরিক্রমণ সুরু হইল। বাল্মীকি বলিয়াছেন, সোমনক পর্বতশৃঙ্গ ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। অধুনা ইহা 'সোমারা' পর্বত নামে পরিচিত। বাল্মীকি ও বেদব্যাস উভয়ই বলিয়াছেন যে, দেবতাগণ ভারতের পূর্বপ্রান্তে একটি প্রবেশদ্বার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। মৈতৈগণ ইহাকেই পূর্ব প্রবেশ দ্বার বলেন। পর্বতশৃঙ্গের 'টাঙ্গখুশ' নামক পার্বত্য অধিবাসিগণ এই দ্বার রক্ষা করিত। টাঙ্গখুশকে পূর্বে তণ্ডু বলা হইত। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত তণ্ডুর সহিত এই তণ্ডুর কোন সম্পর্ক আছে কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। তণ্ডু ছিলেন শিবের গণ। নটরাজ শিবের বাস ছিল হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত কৈলাস পর্বতে। সুতরাং দুই পার্বত্যবাসীর ভিতর সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক।

মৈতৈ নারীগণের নৃত্য বিশেষ করিয়া লাস্যপর্যায়ভুক্ত। মৈতৈ নারীগণও ঊষাদেবীর উপাসিকা। ইহার কারণ সম্বন্ধে মৈতৈগণ বলেন যে, সোমনক পর্বত কেবল তেজোদ্দীপ্ত স্বর্ণময় আভরণে ভূষিত আদিত্যদেবের উদয়স্থল নহে, এই শৃঙ্গে লজ্জারুণা, অবগুণ্ঠনবতী, সুন্দরী ঊষা প্রথম অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া নিজের রূপ লাবণ্য প্রকাশ করেন।

মণিপুরে নৃত্যের কিরূপে প্রবর্তন হইল, তাহারও একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। কথিত আছে যে, একবার কৃষ্ণ গোপীগণের সহিত গোপনে রাসলীলা করেন এবং শিবকে দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করেন। শিব এই নৃত্য দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়া যান যে, তিনি সর্বদাই বিমর্ষ হইয়া থাকিতেন। তাঁহার এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়া পার্বতী চিন্তিত হন। অবশেষে স্থির হইল যে, তাঁহারাও রাসলীলা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কৈলাস পর্বত হইতে নীচে অবতরণ করিয়া মণিপুর অঞ্চলে কৌব্রুচীং নামক শৃঙ্গে দণ্ডায়মান হন এবং চারিদিকে জলবেষ্টিত স্থানটিকে নৃত্যের জন্য মনোনীত করেন। শিব তাঁহার ত্রিশূল দ্বারা পর্বতগাত্রে ছিদ্র করেন এবং সমস্ত জল বর্মার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে



বিখ্যাত মণিপুরী নৃত্যশিল্পী
শ্রীনদীয়া সিং

মণিপুরী রাসনৃত্যের একটি মনোরম ভঙ্গি





'অজন্তার মর্মবাণী' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

(সঙ্গীতশ্যামলার
সৌজন্যে প্রাপ্ত)

'অজন্তার মর্মবাণী' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

(সঙ্গীত শ্যামলার সৌজন্যে প্রাপ্ত)



নদীর আকারে প্রবাহিত হয়। তাঁহারা এই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং সেইখানেই রাসলীলা করিতে মনস্থ করিয়া নয়টি অপ্সরাকে নয়টি শৃঙ্গে অবস্থান করিতে বলেন। তাঁহারা রাসলীলা আরম্ভ করিলে, সর্পরাজ পাখাম্বা তাঁহার মাথার মণি দিয়া স্থানটিকে উজ্জ্বল রাখেন। নৃত্যের শেষে নাগরাজ এতই মুগ্ধ হন যে, তাঁহার মণি হইতে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে এবং সমস্ত জায়গাটি আলোকিত হইয়া যায়। এইজন্য এই স্থানটিকে 'মণিপুর' বলে। মণিপুরের ইতিহাসেও এই পাখাম্বার উল্লেখ আছে। তাহাতে 'মণিপুর' নামকরণ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করা হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, মণি উদ্ধার হইতে গন্ধর্বনগর মণিপুর নামে খ্যাত। পাখাম্বা হইতেছেন মৈতৈগণের আদিপুরুষ। ইনি হইতেছেন অনন্ত নাগ এবং অমর। সুতরাং এইখানে মতদ্বৈধ দেখা যায়। মৈতৈগণ নিজেদের গন্ধর্ব-বংশধর বলিয়া দাবী করিলে পাখাম্বা তাঁহাদের আদিপুরুষ কি করিয়া হন? কারণ গন্ধর্বগণ ছিলেন আর্য এবং নাগগণ ছিলেন অনার্য। সুতরাং মনে হয়, আর্য ও অনার্যদিগের মিশ্রণ হইয়াছিল এবং সেইজন্য শিল্পকলার ক্ষেত্রেও আর্য ও অনার্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখি।

মণিপুরীগণ মণিপুরী নৃত্যকে বেদের অনুগামী বলিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়া থাকেন যে, পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে পরিক্রমণ করা আদিত্যদেবের স্বাভাবিক ধর্ম। আদিত্য বলিতে ঋগ্বেদে আদিত্যস্তুতিতে বর্ণিত আদিত্যদেবের কথাই বলা হইয়াছে। সৌরজগতে সূর্যের আকর্ষণে গ্রহগুলি বামদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজকক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। মণিপুরী নৃত্যের গতিকেও সৌরজগতে অবস্থিত নক্ষত্র মণ্ডলীর গতির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই নৃত্যে নর্তকীগণকে মণ্ডলীতে দাঁড়াইয়া ডানদিকে অগ্রসর হইতে হয়। নিজের দেহকে বামদিকে ঘুরাইলেও অগ্রগতি কিন্তু ডানদিকেই থাকিবে। মণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাসদেবতার সহিত সূর্যের তুলনা করা যায় এবং মণ্ডলীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্যরতা নর্তকীগণের তুলনা চলিতে পারে

গ্রহ-নক্ষত্রগুলির সহিত। সৌরজগতে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি নিজেদের কক্ষে থাকিয়া আদিত্যদেবকে বামপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ডানদিকে অগ্রসর হইয়া প্রদক্ষিণ করে। সেইজন্য নৃত্যমণ্ডলীতে নিজস্থানে অবস্থান করিয়া বামপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিবার রীতি আছে। মৈতৈগণ এইজন্য ইহাকে বেদের অনুগামী বলিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, মৈতৈগণ বেদের ব্রাত্যধর্ম পালন করিয়া থাকেন। মনুসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে, তিনবর্ণের নিজ নিজ নির্দিষ্টকালের ভিতর উপনয়ন না হইলে 'ব্রাত্য' নামে অভিহিত হয়। ঊষাদেবীর কথাও বেদে উল্লিখিত আছে। ইনি হইতেছেন প্রভাতের দেবী। মৈতৈ নারীগণও ঊষাদেবীর উপাসনা করেন। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া ইঁহারা নিজেদের বেদের অনুগামী বলিয়া থাকেন।

মণিপুরী রাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলেও প্রান্তীয় দেশ বলিয়া চিরকালই ইহাকে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। প্রতিবেশী রাজ্যগুলি চিরকালই এই রাজ্যটিকে উত্ত্যক্ত করিয়াছে। মণিপুরের উত্তরে নাগা পাহাড়। নাগগণ মণিপুরের চিরশত্রু। প্রায়ই তাহারা হত্যা লুটতরাজ করিয়াছে। পশ্চিমে কাছাড় জেলা। দক্ষিণে কুকি, লুসাই, সুতি প্রভৃতি অনার্য জাতির বাস। পূর্ব সীমায় উত্তর-ব্রহ্মের 'শান' প্রদেশ। চতুর্দিকে নাগা, কুকি, লুসাই, শান ও ব্রহ্মবাসীগণ মৈতৈগণকে নিশ্চিন্তে থাকিতে দেয় নাই। এইজন্য মণিপুরে এই সকল জাতির সহিত সাংস্কৃতিক বিনিময় অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল এবং ভারতবর্ষে অবস্থিত হইলেও এইপ্রান্তে আর্যহিন্দু অথবা ঐস্লামিক প্রভাব অপেক্ষা পার্বত্য ও ভারতের পূর্ব-প্রান্তীয় দেশগুলির মঙ্গোলীয় এবং অনার্য-প্রভাব অধিকতর ছিল।

মণিপুরের রাজগণ এত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন যে, শিল্পকলার প্রতি মনোযোগ দিবার তাঁহাদের সময়ই ছিল না। তবুও নৃত্যকলা চিরকালই মৈতৈগণের নিকট অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে এবং এত যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও ইহা বাঁচিয়া রহিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ,

ইহা ধর্মের অঙ্গীভূত। শুধু তাহাই নহে, ইহা লোকনৃত্যও বটে। জনসাধারণের ভিতর ইহার ব্যাপক প্রসার ছিল বলিয়া ইহা আজও বাঁচিয়া আছে।

এইবার মণিপুরের নৃত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে, বিভিন্ন সংঘাতের ভিতর নৃত্য কিরূপে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিল এবং পরিবর্তিত হইল।

১৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন তাম্রফলকে 'কোয়াই ঝম্পক' নামে একজন সঙ্গীতানুরাগী রাজার নাম পাওয়া যায়। মৈতৈগণের মতে ১০৭৪ খৃষ্টাব্দে লাইহারাওয়া নৃত্যের প্রচলন হইয়াছিল। ইহা মৈতৈগণের জাতীয় নৃত্য। ইহার ভিতর ব্রহ্মদেশীয় এবং বলী দ্বীপের নৃত্যের ছায়াপাত দেখা যায়। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে চীনদস্যু ময়দানা কর্তৃক চীনরাজ্য আক্রান্ত হইলে এবং মণিপুররাজ দেবরুদ্ধসিংহ তাঁহাকে দমন করিলে চীনরাজ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ অনেক উপঢৌকন লইয়া মণিপুরে আসিয়া মণিপুর-রাজের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। ইহাতে মণিপুরের সহিত চৈনিক সাংস্কৃতিক মিলন সম্ভবপর হইয়াছিল। এই সময় মণিপুরে রাসনৃত্যের প্রবর্তন হয় নাই। শানপ্রদেশের পঙ্গরাজ্যের রাজা কম্বার সহিত মণিপুররাজ মোংইয়াম্বার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। কম্বা কর্তৃক প্রদত্ত অনেক জিনিষ মণিপুরে পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মদেশের সহিত সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্ভব হইয়াছিল এবং মণিপুর হইতে অনেক সঙ্গীতজ্ঞগণও ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন। এই সময় মণিপুরীগণ বৈষ্ণব ছিলেন না। আর্য প্রভাব অপেক্ষা মঙ্গোলীয় প্রভাব অধিক কার্যকরী ছিল।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মণিপুর অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। একদিকে ব্রহ্মরাজ মণিপুর রাজ্যটিকে গ্রাস করিবার জন্য আক্রমণ চালাইতেছিলেন, অপরদিকে নাগরাজ পামহৈবা মণিপুর আক্রমণ করেন। পামহৈবা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন যে, ইনি নাগাধিপতি ছিলেন। আবার কেহ বলেন, ইনি মোংইয়াম্বার উত্তরাধিকারী ছিলেন। তবে ইনি যেভাবে মৈতৈগণের ধর্মে, সংস্কৃতিতে ও সামাজিক

জীবনে আঘাত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অনুপ্রবেশকারী বলিয়াই মনে হয়। পামহৈবা মণিপুর রাজ্য জয় করিয়াই হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'গরীব নেওয়াজ' নাম লইলেন। নেওয়াজ কথাটি নাকি পার্শী শব্দ। মনে হয়, তিনি মুসলমানদিগের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাকে বধ করিয়া ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আগতশাহ রাজা হন। ইঁহার পর ভরত শাহ রাজা হন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, 'শাহ' উপাধি তাঁহারা মুসলমানগণের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। চন্দ্রকীর্তি মহারাজের সময় অনেক বাঙ্গালী ও মুসলমান ওস্তাদ মণিপুরে গিয়াছিলেন। সেইজন্য মণিপুরী নৃত্যের ভিতর হিন্দুস্থানী তালের প্রভাব দেখা যায়। ইহা 'তাল' অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। পামহৈবা রাজা হইয়াই মৈতৈগণের ধর্মে আঘাত করিয়া তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটাইতে চাহিলেন। তিনি প্রজাদিগের উপর 'রামান্দি' ধর্ম চাপাইলেন। রামান্দি ধর্মে রামই হইতেছেন আরাধ্য দেবতা। তিনি তাঁহার গুরু শান্তিদাসের সাহায্যে মণিপুরের ধর্মগ্রন্থগুলি পুড়াইয়া ফেলেন এবং প্রজাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করেন। সুতরাং প্রজাগণ ব্রাত্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া রামভক্ত হইয়া পড়িলেন। এইখানেই একটি বিরাট পরিবর্তন সুরু হইল। অনার্যপ্রভাব ও মঙ্গোলীয় প্রভাব ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে লাগিল এবং বৈষ্ণব প্রভাব প্রবল হইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাব ক্রমশঃ কার্যকরী হইতে লাগিল। 'গরীব নেওয়াজ' মৈতৈ সঙ্গীতকলাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য একটি উপায় আবিষ্কার করেন। মৈতৈগণের ভিতর বিদ্যাশিক্ষার অভাব ছিল। সহজ ও সরল বলিয়া অতি সহজেই কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ইহার সুযোগ লইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, যদি মৈতৈভাষায় সঙ্গীতচর্চাকালীন তাঁহাদের রাত্রিতে অথবা দিবসে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যথাক্রমে পেচক ও বায়সে পরিণত হইবেন। এই কুসংস্কারের ফলে নৃত্য

ও সঙ্গীত ভীষণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে গরীব নেওয়াজের পৌত্র মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র এই বিপর্যয় হইতে সঙ্গীতকে রক্ষা করেন। কিন্তু মৈতৈ নৃত্য ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিল। এই সময় চৈতন্যদেবের অনুগামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত প্রেমানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া মৈতৈগণ পরিপূর্ণ বৈষ্ণব হইয়া যান। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের ফলেই মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ রাসলীলার প্রবর্তন করেন। মণিপুরী নৃত্যকেই বিভিন্ন ভাবধারায় বিভাবিত করিয়া, সংস্কার করিয়া, অপরূপ সাজে সাজাইয়া তিনি উপস্থিত করিলেন মৈতৈগণের নিকট। রাসনৃত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হইলেও জাতীয় নৃত্য হিসাবে লাইহারাওয়াও স্থান পাইল। এইরূপে রাস ও লাইহারাওয়া সমান্তরালভাবে মৈতৈগণের নিকট শ্রদ্ধেয় এবং আদরণীয় হইল। ১৭৫৫-১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রহ্মনেতা আলমপোড়া কর্তৃক মণিপুর আক্রান্ত হইতে থাকে। ঐতিহাসিক তথ্যে পাওয়া যায়, ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ যুদ্ধে পরাস্ত হন। অবশেষে ব্রহ্মরাজ দয়াপরবশ হইয়া ইঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু কিংবদন্তী আছে যে, ইনি কৃষ্ণের করুণা লাভ করিয়া পাগলা হস্তীকে নিরস্ত করেন। ইঁহার এইরূপ ভগবদ্‌ভক্তি দেখিয়া ব্রহ্মরাজ ইঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

ইহার পর মণিপুরের রাজা ও প্রজাগণকে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। সিংহাসন লইয়াও ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মণিপুর ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধিকারে করদরাজ্য হিসাবে গণ্য হয়। এই সময় রাজা চারুচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি মৈতৈ ভাষায় সংকীর্তন ও লীলা কীর্তনের প্রবর্তন করেন। তাঁহার সময় মণিপুরে প্রবেশের বাধা থাকাতে মণিপুরী নৃত্য সম্পূর্ণরূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যায়। ইহাকে বিশ্বসভায় উপস্থাপিত করিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। মণিপুরী নৃত্যও সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া জগৎসভায় আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্বেও বলিয়াছি, মণিপুরের দুইটি প্রধান নৃত্য হইতেছে 'রাস' ও

'লাইহারাওবা'। এই দুইটি নৃত্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, সেইরূপ বৈষম্যও লক্ষ্য করা যায়। রাসের দেবতা হইতেছেন নটবর শ্যাম ও কৃষ্ণ-প্রিয়া রাধা। লইহারাওবার দেবতা হইতেছেন অনার্য দেবতা শিব ও শিবজায়া পার্বতী। রাসলীলায় যে মাধুর্য ও কবিত্বের সুন্দরতম পরিচয় পাওয়া যায়, লাইহারাওবাতে সেই মাধুর্য বা কবিত্বের পূর্ণ বিকাশ নাই মনে হয়। উপরন্তু লাইহারাওবার প্রেমের আখ্যানটি কিঞ্চিৎ স্থূলভাবে উপস্থাপিত হয়। ইহাই প্রধান বৈষম্য বলিয়া মনে হয়। রাসলীলায় সামাজিক দৃষ্টিতে শ্রীরাধার উপপতি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। লাইহারাওবাতেও বিবাহের পূর্বে পার্বতীর সহিত শিবের অবৈধ প্রণয় হইয়াছিল। শিব-পার্বতী খাম্বা ও থৈবী রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। মৈরাঙ্ গ্রামের এক দরিদ্র যুবক ছিলেন খাম্বা এবং রাজদুহিতা ছিলেন থৈবী। উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হন। তাঁহাদের এই প্রেমের মিলনের প্রধান বাধা হইয়াছিলেন রাজা স্বয়ং। দুইজনে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া নিজেদের প্রেমের সততা প্রমাণ করেন এবং বিবাহ করেন। পরিণতিতে দুইজনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা একটি বিয়োগান্ত নাটক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের আখ্যানটিও বিয়োগান্ত বলা চলিতে পারে। কারণ শ্রীরাধার সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে চলিয়া যান, পরে আর ফিরিয়া আসেন নাই। দুইটি নৃত্যই ধর্মানুষ্ঠানে করা হইয়া থাকে। মৈরাং পুর্বাতে খাম্বা থৈবীর কথা লিপিবদ্ধ আছে। এই সময় রাজা ছিলেন লয়াম্বা। এই দুইটি নৃত্যের বেশভূষাতে একটি গভীর পার্থক্য আছে। একটিতে ভারতের পূর্বে অবস্থিত দেশগুলির প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং অপরটিতে ভারতের হিন্দুপ্রভাব প্রবলমাত্রায় বিগুমান। রূপসজ্জা পরিচ্ছেদে ইহার আলোচনা করিয়াছি। লাইহারাওবা নৃত্যে মৈতৈভাষার গীত ব্যবহৃত হয় এবং রাসলীলায় বাংলা কীর্তন-পদাবলী প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। মহারাজ শ্রীশ্রীভাগ্যচন্দ্র রাসলীলা নৃত্যের পরিকল্পনা করিয়া তাহা গোবিন্দজীর চরণকমলে নিবেদন করেন। কথিত আছে যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট

হইয়া কৃষ্ণপূজার প্রচার করেন এবং রাসলীলা নৃত্যের প্রবর্তন করেন। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকাল হইতে মহারাজ চন্দ্রকীর্তির রাজত্বকাল পর্যন্ত মণিপুরী ললিতকলার স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র 'ভঙ্গী অচৌবা' নৃত্যের সৃষ্টি করেন এবং মহারাজ কীর্তিসিংএর সময় ভঙ্গী ৬টি ভাগে বিভক্ত হয়। ইহাকে 'ভঙ্গী পারেঙ্‌' বলা হয়। 'পারেঙ্‌' এর অর্থ হইতেছে 'সারি'। সুতরাং 'ভঙ্গী পারেঙ্‌' বলিতে ভঙ্গীর সারি বুঝায়। ভঙ্গীর ছয়টি ভাগ হইতেছে—অচৌবা, বৃন্দাবন, খুডুম্বা, গোষ্ঠ, গোষ্ঠ-বৃন্দাবন ও গোষ্ঠ-খুডুম্বা। ছয় নম্বরের ভঙ্গীটি অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট পাঁচটি ভঙ্গী ও চালি আয়ত্ব করিতে না পারিলে মণিপুরী নৃত্যের শিক্ষা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। এই সকল ভঙ্গীগুলিকে ভিত্তি করিয়া মণিপুরী নৃত্যের পরিকল্পনা করা হয়। এই নৃত্যগুলিকে তাণ্ডব ও লাস্য দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। অচৌবা, বৃন্দাবন ও খুডুম্বা লাস্য পর্যায়ে পড়ে এবং গোষ্ঠ ও গোষ্ঠ-বৃন্দাবন তাণ্ডব পর্যায়ে পড়ে।

রাস—মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র মহারাস, বসন্তরাস ও কুঞ্জরাসের প্রবর্তন করেন। মহারাজ চন্দ্রকীর্তি নর্তনরাসের প্রবর্তন করেন। ইহা ব্যতীত গোষ্ঠরাস, হালিসা, সাঙ্গি প্রভৃতি রাসের উল্লেখও আছে। গোষ্ঠরাসে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বর্ণিত হয়। গোষ্ঠলীলা ও কালীয়দমনে মুখোস ব্যবহার করা হয়।

কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে (শারদোৎসবে) মহারাস হইয়া থাকে। এই রাসের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ শত শত সখী পরিবেষ্টিত হইয়া শারদোৎসবে রাসনৃত্য করিতেছেন। মণিপুরী মহারাসেও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্য, কৃষ্ণের অন্তর্ধান, প্রত্যাবর্তন, পুষ্পাঞ্জলি, গৃহাগমন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। চৈত্রমাসে পূর্ণিমাতে বসন্তরাস করা হয়। ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে 'দোল' উৎসব। ইহাতে কৃষ্ণতাণ্ডব, রাধার নৃত্য, গোপীদিগের নৃত্য, হোলী খেলা প্রভৃতি প্রদর্শিত হয় এবং অচৌবা ও খুডুম্বা ভঙ্গী সংযোজিত

হয়। আশ্বিনমাসের পূর্ণিমাতে কুঞ্জরাস করিবার নিয়ম আছে। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের অভিসার, কুঞ্জে গমন প্রভৃতি রূপায়িত হয়। নর্তনরাস বৎসরের সকল সময়ই করা যায়। ইহা গোবিন্দজীর চরণকমলে অর্পিত হয় নাই। রাসনৃত্যে 'চালি' একটি প্রধান অংশ। মণিপুরী নৃত্য শিখিতে হইলে প্রথমে চালি শিখিতে হয়। মনে হয়, চালি শব্দটি 'চারী' শব্দের রূপান্তর। চারী অর্থে গতি। কারণ 'চর্' ধাতুটি গত্যর্থক ধাতুর অন্তর্গত। 'র'কার স্থানে ইচ্ছামত 'ল'কারের প্রয়োগও সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্মত। চালি নৃত্যে তিনটি মুদ্রার প্রয়োগ আছে। এই তিনটি মুদ্রাই বার বার করিতে হয়। কিন্তু তাহার সহিত বিভিন্ন পদবিক্ষেপে বিভিন্ন গতির সৃষ্টি হয়। এই মুদ্রা তিনটি হইতেছে যথাক্রমে পদ্মকোষ অথবা আলাপদ্ম, অর্ধচন্দ্র ও হংসাস্য। সুতরাং গতির সহিত ইহাতে করকরণের যোগ হয়। সমপাদে, সমশিরেও সমদৃষ্টিতে পতাক হস্তদ্বয় বক্ষের সম্মুখে রাখিয়া চালি নৃত্যের সুরু হয়। পতাক হস্তদ্বয় বক্ষ হইতে সমান দূরত্বে থাকিবে এবং করতল বাহিরের দিকে থাকিবে। ইহার পর বিভিন্ন গতির সাহায্যে এই মুদ্রাগুলি ক্রমান্বয়ে করিতে হয়। ইহা অপরিবর্তনীয়। ইহা হইতেছে নৃত্যের প্রারম্ভিক শিক্ষা। এই প্রারম্ভিক শিক্ষা ব্যতীত মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র যে নৃত্যটি গোবিন্দজীর চরণকমলে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার ২৪, ২৫ ও ২৬ পর্যায়গুলি এই নৃত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাসলীলা ও ভঙ্গীগুলিতে নৃত্যের শেষে 'চালি' নৃত্যের প্রয়োগ হয়। ভাগবতে দশম স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, শারদ রজনীতে রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বিরহতপ্ত গোপীদিগকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য বিবিধ ক্রীড়াসহকারে নৃত্য করেন। ইহাতে গোপীদিগের গর্ববোধ হইলে তাঁহাদের গর্ব চূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া অদৃশ্য হন। যমুনা পুলিনে শোকসন্তপ্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আত্মহারা হইয়া তদ্‌গতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ অনুকরণ করিতে লাগিলেন—

"আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে
স্তা স্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥"

*　　　*　　　*

অসাবহস্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥"

গোপীগণ বিহারবিভ্রম লাভ করিয়া "আমি সেই কৃষ্ণ" এইরূপ বলিতেছিলেন। গোপীগণের এইরূপ আত্মবিভ্রম বিরহ অবস্থাকে ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ পদ্মসরোবরে সাথীহারা রাজহংসীর চকিত বিলাপের সহিত তুলনা করিয়া এই ভাবার্থকে 'চালি' নৃত্যে প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতরা গোপীগণ বিলাপ করিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বিরহে বিচলিত হইয়া দর্শন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোপীগণের প্রেমের নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। চালি নৃত্যে এই ভাবটি প্রকাশ করিবার জন্য প্রারম্ভেই পতাক হস্তের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রেমের জয় ঘোষিত হইয়াছে। উহা যেন প্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী! হংসীগণের ভাব প্রকাশের জন্য হংসাস্য মুদ্রার প্রয়োগ হইয়াছে। পদ্মসরোবর বুঝাইবার জন্য পদ্মকোশ অথবা অলপদ্ম হস্তের প্রয়োগ হইয়াছে। গোষ্ঠ, রাস, কৃষ্ণতাণ্ডব প্রভৃতি নৃত্যের অন্তে চালির প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার কারণ হইতেছে যে, কৃষ্ণপ্রেম বিনা কৃষ্ণ মেলে না। গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমে এমনই পাগল হইয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ দর্শন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ইহাই বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্ব। মনে হয়, এই মূলতত্ত্বকে স্মরণ করিয়া প্রতিটি বৈষ্ণবীয় নৃত্যের শেষে চালি নৃত্যের প্রয়োগ হইয়াছে।

রাসনৃত্য প্রচার সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে যে, পুরোহিতের পূজার অভাবে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া উঠেন। শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যাকুলতায় বিচলিত হইয়া স্বপ্নাদেশ দেন। তাঁহার আদেশে মহারাজ তাঁহার কন্যাকে শ্রীরাধার সাজে সজ্জিত করিয়া মণ্ডলীতে

কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করিয়া রাসনৃত্য করান। ইহা দ্বারাই গোবিন্দের পূজা হয়। কীর্তনের সহিত নর্তকীগণ যে রাস নৃত্য করেন, তাহাকে 'জগোই রাসো সনাবা' বলা হয়। গৃহাঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম কোণে সংকীর্তন যজ্ঞ করিবার নিয়ম আছে। এই নির্দিষ্টস্থানে গায়িকাগণ উপবেশন করিয়া তিনদান, রাজমেল, মেনকূপ প্রভৃতি তালে গান গাহিতে থাকেন। সে গান ভূলোক-দ্যুলোকে ভাসিয়া ভাসিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করে এবং তাহার সহিত নর্তকীগণ নৃত্য করিতে থাকেন। নর্তকীগণ গভীর ভক্তির সহিত 'ভঙ্গী পারেঙ্' নাচেন। রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, কৃষ্ণবিরহে গোপীগণের রোদন ও বনে বনে অন্বেষণ, যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব, গোপীগণের প্রার্থনা, প্রেমসেবা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীগণের প্রশ্নোত্তর, জলকেলি, রাস ও রাত্রিশেষে গোপীগণের গৃহাগমন প্রভৃতি অভিনীত হইয়া থাকে।

মণিপুরী নৃত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—রাস, লাইহারাওয়া, গোষ্ঠ, খুবাক ঈশে, থাবল চোংবী, নটপালা কীর্তন, ওগ্রিহঙ্গেল, চীংখৈরোল।

লাইহারাওয়া—লাইহারাওয়া মণিপুরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নৃত্য। শিব ও পার্বতী, খাম্বা, ও থৈবী নাম ধারণ করিয়া অবতাররূপে মর্তে আবির্ভূত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে অবৈধ প্রণয় সুরু হয়। ইহাই লাইহারাওয়া নৃত্যের বিষয়বস্তু। লাইহারাওয়া নৃত্যকে নাটকাশ্রিত সমবেত নৃত্য বলা যায়। ইহার ভিতর গান থাকে। ইহার পুরোহিত হইতেছেন এ্যামাইবী ও এ্যামাইবা। প্রথম অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীসহ এ্যামাইবী ও এ্যামাইবা একটি ঘোড়াকে সজ্জিত করিয়া শ্বেত পতাকা উড়াইয়া শোভাযাত্রাসহ নদীতীরে যান। এ্যামাইবীগণ নদীতে পুণ্য স্নান করেন। ইহার পর জীবসৃষ্টির রহস্য ব্যক্ত করা হয়। মণিপুরী পুরাণে আছে যে, সাতজন দেবী ও নয়জন দেবতা পৃথিবীর সৃষ্টিকার্যে রত ছিলেন। দেবীগণের জলের উপর নৃত্যের

সময় দেবতাগণ মৃত্তিকা ক্ষেপণ করেন। এইরূপে জগৎ সৃষ্টি হয়। ইহার পর বৃক্ষপূজা হয়। অর্থাৎ তাঁহারা উমঙ্গলাইর (বনদেবী—লাইনিং থো ও বনদেব—লাইরেম্বীর) পূজা ও বন্দনা করেন। ইহার পর শোভাযাত্রা সহকারে এ্যামাইবী ও এ্যামাইবা গ্রামে ফিরিয়া আসেন। পূজা সমাপনান্তে আসনের বামদিক হইতে দক্ষিণমুখে যাইয়া থাংকচিন, ওয়াংবারেন, মরজিত প্রভৃতি দেবতাগণের এবং কুবেরের পূজা করেন। ম্যাইবী সাতপ্রকারের নৃত্য করেন এবং তাঁহার সহিত অন্যান্য নর্তকীগণ বামদিক হইতে মণ্ডলীকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিয়া বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হন। গায়কগণও সঙ্গীত সুরু করিয়া সাতবার সপ্তসুরে "হৈয়া হোয়া" গাহিতে থাকেন এবং নর্তকীগণও তিনপ্রকার 'লাইপৌ' নৃত্য করেন। প্রথম প্রকারে, দেবতা নিজেকে মানবদেহধারী অবতাররূপে প্রকাশ করেন। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ভগবানের দেহের বিভিন্ন অংশ গঠিত হয়। ইহার পরের অংশে ভগবানের বাসস্থানের জন্য মন্দির নির্মাণের বর্ণনা থাকে। পরবর্তী অংশে তুলাচাষ ও বস্ত্রনির্মাণ পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়। লাইপৌ নৃত্যের পর 'নঙ্‌পকনিঙ্‌থউ' ও 'পানথৈবীর' অবৈধ প্রেমবিহার অভিনীত হয়। এর পরবর্তী অংশে মৎস্যশিকার পদ্ধতি রূপায়িত হয় এবং দেবদেবীর প্রত্যাবর্তন কল্পনা করা হয়।

শনশেনবা অথবা গোষ্ঠ—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সখাদিগের সহিত গোচারণলীলা তাণ্ডব-পদ্ধতিতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

খুবাক ঈশে—এই নৃত্য জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় দশদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রথযাত্রাকে মৈতৈ ভাষায় 'কান্‌চিন্‌বা' বলা হয়। যখন জগন্নাথদেবের রথ টানা হয়, তখন হাতে তালি দিয়া এই নৃত্য করা হয়।

থাবল-চোংবী—থাবলচোংবীকে 'কে-কে-কে' ও বলা হয়। ইহা লোকনৃত্য পর্যায়ভুক্ত। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে গ্রামের স্ত্রী ও পুরুষগণ হাত ধরাধরি করিয়া বৃত্তাকারে এই নৃত্যোৎসব করিয়া থাকেন। দলপতি গানের প্রথম লাইনটি গাহিতে থাকেন এবং অন্যান্য সকলে ধুয়া ধরে।

ক্রমশঃ নৃত্যের তাল দ্রুত হইতে থাকে। যতদূর সম্ভব দ্রুত লয়ে গাহিয়া পুনরায় বিলম্বিত লয়ে গানটি গীত হয়। এই নৃত্যে গ্রামবাসিগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। ইহা মণিপুরের একটি অতি প্রাচীন লোকনৃত্য। সাধারণতঃ উষাদেবাকে এই নৃত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনে করা হয়।

নটপালা কীর্তন—নটপালা কীর্তন নৃত্যেরই অঙ্গ। মনিপুরী নৃত্য যদিও বেদকে অনুসরণ করে, তথাপি ইহা কীর্তনাঙ্গ। অধিকাংশ নৃত্যই পালা-কীর্তন অথবা পদাবলী কীর্তনের সহিত হইয়া থাকে। নটপালা কীর্তনে পুরুষগণ মন্দিরা অথবা বড় বড় করতাল হাতে লইয়া বিভিন্ন ভঙ্গীতে বাজাইয়া বাজাইয়া নৃত্য করেন। ইহাকে 'করতাল চোলম্' অথবা 'মন্দিরা চোলম্' বলা হয়। মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে যে নৃত্য করা হয়, তাহাকে 'পুঙ্ চোলম্' বলা হয়। এই সকল নৃত্য করিবার সময় অংশগ্রহণকারীগণ মাথায় বৃহৎ পাগড়ী ও উত্তরীয় ধারণ করেন এবং ধুতি পরিধান করেন। করতাল অথবা মন্দিরাগুলি তালের সহিত বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে বাজান হয় এবং নৃত্যও করা হয়। 'পুঙ্' এর অর্থ হইতেছে খোল। চোলম্ কথাটি চলনম্ শব্দটির অপভ্রংশ। ইহাতে বিবিধ উৎপ্লবন, মণ্ডল, স্থানক ও গতির পরিচয় পাওয়া যায়। কেবলমাত্র পুরুষগণই এই নৃত্য করিয়া থাকেন। 'পুঙ্লোন্ জগোই' এর অর্থ হইতেছে খোল নৃত্য। মনিপুরী ভাষায় নৃত্যকে 'জগোই' বলা হয়।

ঔগ্রিহঙ্গেল—'ঔগ্রি' অর্থাৎ শিবের অঙ্গহার। মৈতৈগণের মতে, শিব এই নৃত্য করিয়াছিলেন। মণিপুরী পুরাণে আছে যে, একসময় মণিপুর সমুদ্রের অংশ ছিল। শিব ত্রিশূল দ্বারা পর্বতগাত্রে ছিদ্র করিয়া সমস্ত জল নিষ্কাশিত করিয়া দেন। পরে এই উন্মুক্তস্থানে দেবদেবীগণকে লইয়া নৃত্য করেন। তিনি সেই সময় যে নৃত্য করেন তাহাকে মণিপুরী ভাষায় 'ঔগ্রিহঙ্গেল' বলা হয়। হাতে তরবারী, বর্শা ও ত্রিশূল লইয়া এই নৃত্য করা হয়। কখনও কখনও শূন্য হাতেও

করা হয়। এই নৃত্যে দুইপ্রকার অঙ্গহার আছে। প্রথমটি সৌভাগ্য ও সাফল্যের ইঙ্গিত করে এবং দ্বিতীয়টি ধ্বংসের ইঙ্গিত করে।

চীংখৈরোল—আজকাল এই নৃত্যটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চীংখৈরোল নৃত্যকে একপ্রকার ব্যায়াম বলা যাইতে পারে। অতি প্রত্যূষে, নির্জনস্থানে এই নৃত্য করা হয়।

মণিপুরে নৃত্যের সময় যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার ভিতর অধিকাংশ যন্ত্রের সহিতই বাংলাদেশে ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মণিপুরী নৃত্যে খোল একটি প্রধান বাদ্যযন্ত্র। বাংলাদেশের খোলগুলি মাটী দ্বারা তৈয়ারী হয়। মৃৎ-অঙ্গ বলিয়া ইহার নাম মৃদঙ্গ হইয়াছে। মণিপুরী খোলগুলি আকৃতিতে একই প্রকার। কিন্তু বাংলার খোল ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মণিপুরী খোলগুলি কাঠের দ্বারা নির্মিত। সঙ্গীতে অথবা খোলবাদ্যে লয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মন্দিরা অপরিহার্য। বাংলা কীর্তনেও মন্দিরা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। অন্যান্য নৃত্যে ঢোল, ঢোলক, খঞ্জরী, ড্রামজাতীয় বাদ্য, পাখোয়াজ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ইহাদের সহিত মন্দিরা ব্যতীত বড় বড় করতাল, গঙ্, ঝালারি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকারের বাঁশী, ময়বুঙ্, খঙ্, পেনা, এস্রাজ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হয়। মণিপুরী নৃত্যকে বাহিরে প্রচার করিয়া যাঁহারা গুরু আখ্যা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতর অমুবী সিং ও আতাম্বা সিংএর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেনারিক রাজকুমার বিপিন সিং, প্রিয়গোপাল সিং, নদায়া সিং, সিংহজিত রায়, ব্রজবাসী সিং প্রভৃতি শিল্পীগণ মণিপুরী নৃত্যকে বাহিরে প্রচারের জন্য বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপে মণিপুরী নৃত্য ইদানীং মণিপুরের বাহিরে প্রচারিত হইয়া নৃত্যরসিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ভরত নাট্যম্



"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী !"

—রবীন্দ্রনাথ

ভরতনাট্যম্

ভারতের দক্ষিণাংশ তিনদিকে সুনীল বারিধি দ্বারা বেষ্টিত ; বহিঃশত্রু এই বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া দক্ষিণভারতকে আক্রমণ করিতে বিশেষ সমর্থ হয় নাই। আক্রমণের প্রথম ও প্রচণ্ডতম আঘাত উত্তর ভারতকেই সহ্য করিতে হইয়াছে। যদিও এই আঘাত হইতে দক্ষিণ ভারত একেবারে অব্যাহতি পায় নাই, তথাপি এই প্রান্তটি নিজ সংস্কৃতিকে অনেক পরিমাণে অবিকৃত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এইজন্য দক্ষিণভারতের সহিত উত্তরভারতের ভাষাগত, কৃষ্টিগত ও রুচিগত বৈষম্য রহিয়াছে। পূর্বে দক্ষিণভারত 'দ্রাবিড়' দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। ইতিহাসে দ্রাবিড় সভ্যতাকে প্রাগ্-আর্যসভ্যতা বলিয়া অনুমান করা হয়। আর্যসভ্যতা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে অনার্য সভ্যতা সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। আর্যাবর্ত আর্যগণের করায়ত্ত হইলে দ্রাবিড়গণ দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দুই সভ্যতার ভিতর সংঘাত লাগিয়াই ছিল। যতদিন পর্যন্ত এই দুই সভ্যতার পারস্পরিক মিলন না হইয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বহু যুগ ধরিয়া সহ-অবস্থানের ফলে এই দুই সভ্যতার মিলন সম্ভবপর হইয়াছিল বটে, কিন্তু একটি অদৃশ্য সীমারেখা ভারতের দুই প্রান্তকে বিভক্ত করিয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে একটি বিষম ভাব দেখা যায়।

যদিও সাতবাহন রাজত্বকালের সামান্য লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায়, তথাপি ঐতিহাসিকগণের মতে সঙ্গমযুগের নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাঁহারা যে সকল সাংস্কৃতিক তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সাতবাহন রাজাদের কীর্তিকলাপ ও জনসাধারণের ব্যবহারিক

জীবন হইতে সঙ্গীতাপ্রিয়তার কথা জানা যায়। শুধু তাহাই নহে, একটু ধৈর্য সহকারে অনুধাবন করিলেই দাক্ষিণাত্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের ধারা কি ভাবে অব্যাহত রহিয়াছে তাহাও অনুমান করা যায়।

সাতবাহন রাজত্বকালে সঙ্গমযুগের সূচনা হয়। সঙ্গমযুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। তামিলনাদে প্রথম শতাব্দীতে কাবেরীপুমত্তনমের পরাক্রমশালী চোলরাজ কারিকালা এবং মাদুরার পাণ্ড্য-রাজ সঙ্গীতকলাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। পরবর্তীকালে শিলপ্পদিকরণের নায়ক নায়িকা 'কোভলন' 'কান্নাকী' ও 'মাধবী'র জীবনের ঘটনাবলী এই শতাব্দীতেই ঘটে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'চেরন্ সেঙ্গুত্তভন্' নামক চেররাজ উত্তর ভারত জয় করেন এবং হিমালয় হইতে একটি পাথর আনিয়া তাহাতে কোভলনের সতী সাধ্বী পত্নী কান্নাকীর মূর্তি খোদিত করেন। চেরন্ সেঙ্গুত্তভনের ভ্রাতা ইলাঙ্গো তামিলনাদের বিরাট কাব্যগ্রন্থ 'শিলপ্পদিকরণ' রচনা করেন। তাঁহার বন্ধু 'সিথলাই সথনর' মাধবীর কন্যাকে লইয়া 'মেনিমেখলী' রচনা করেন। এই দুইটি গ্রন্থেই নৃত্য ও গীত সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই দুইটি কাব্যের জন্য সঙ্গমযুগ অমর হইয়া আছে।

শিলপ্পদিকরণের মধ্যমণি ছিলেন চোলরাজ কারিকালা। ১৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজা হন। পণ্ডিত নসিনরক্কিনিয়ারের মতে কারিকালা একজন 'ভেলির' কন্যাকে বিবাহ করেন। তিরুমঙ্গাই আলভার বলেন, কারিকালার 'আডিমণ্ডি' বলিয়া এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার স্বামী ছিলেন চেরবংশীয় রাজকুমার। তাঁহার নাম ছিল 'অট্টন অট্টি'। প্রাচীন গাথায় আডিমণ্ডি ও অট্টির কথা পাওয়া যায়। গাথানুসারে ইঁহারা ছিলেন পেশাদারা নর্তক-নর্তকী।

সঙ্গমযুগে একদল ভ্রাম্যমাণ পেশাদারী নর্তক-নর্তকী ও বাদকদলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর বাদকদলকে 'পনর্' বলা হইত। ইহাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি অদ্ভুতধরণের হইলেও এইগুলি হইতে সুন্দর ও

সুমিষ্ট স্বর বাহির হইত। বাদ্যযন্ত্রের ভিতর মৃদঙ্গ ও বংশীজাতীয় বাদ্যযন্ত্রও ছিল। এই বাদকদলের ভিতর নর্তক-নর্তকীও থাকিতেন। তাঁহাদিগকে 'ভিরালি' বলা হইত। অনুমান করা হয়, ইঁহারা আদিম উপজাতিদিগের বংশধর ছিলেন। ইঁহারা যে সকল নৃত্য-গীত পরিবেশন করিতেন তাহার সহিত নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত দেশী নৃত্যের গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও ইঁহাদের পরিবেশিত সঙ্গীতের মধ্যে লোকগীত ও লোকনৃত্য প্রধান ছিল, তথাপি মার্গনৃত্যের প্রভাবও অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে আর্যদিগের ভিতর প্রচলিত মার্গনৃত্য এই সকল অনার্য নৃত্যের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। সেইজন্য তৎকালীন প্রচলিত মার্গ নৃত্যের সহিত এই সকল নৃত্যের সাদৃশ্য ছিল। ভিরালিদিগের নৃত্যের ভিতরও দেশী ও মার্গ নৃত্যের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। ভরত অবশ্য মার্গনৃত্যকে আর্যগণের নৃত্য বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কারণ, ইহা দেবতাদিগের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আর্যগণ অনার্যগণের নিকট হইতে সঙ্গীতের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। ইহার আলোচনা পূর্বেও করিয়াছি। যাহা হউক, এই সকল পেশাদারী নর্তক-নর্তকী ও বাদকবৃন্দের দল রাত্রিবেলা উন্মুক্ত প্রান্তরে নৃত্যগীতের আয়োজন করিতেন। একটি প্রদীপদানিতে স্থাপিত বৃহৎ প্রদীপের সাহায্যে রঙ্গভূমিকে আলোকিত করা হইত। দক্ষিণ ভারতে এখনও গ্রামের মন্দিরে অথবা উন্মুক্ত প্রান্তরে নৃত্যনাট্য প্রভৃতি করিবার সময় এই প্রথা দেখা যায়। মৃদঙ্গ, বাঁশী এবং নানা প্রকার অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রের সহিত নৃত্যগীতের ব্যবস্থা হইত। গায়িকাবৃন্দকে বলা হইত 'পদিনী'। গীতের সহিত নর্তক-নর্তকীগণ হাতের ইশারায় ভাব প্রকাশ করিতেন। ইঁহারা একসঙ্গে যে নৃত্য করিতেন, তাহাকে 'তুলাঙ্গাই' ও 'আলিয়স্' (হল্লীস) বলা হইত। ইঁহারা অত্যন্ত গরীব ছিলেন। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'হল্লীস' নৃত্যের উল্লেখ আছে। এই নৃত্য বোধ হয় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই সকল নর্তক-নর্তকীর দল নৃত্যে যে সকল অঙ্গহার ব্যবহার করিতেন, নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত অঙ্গহারের

সহিত তাহাদের গভীর সাদৃশ্য ছিল। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, পরবর্তী যুগে দাক্ষিণাত্যে যে সকল লোকপ্রিয় নৃত্যনাট্য প্রচলিত ছিল তাহার বীজ নিহিত ছিল ভিরালিদিগের নৃত্যের ভিতর।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খৃষ্টাব্দ হইতে দক্ষিণভারতে ভক্তিবাদের সূচনা হয়। প্রায় পঞ্চম খৃষ্টাব্দে ভক্তিবাদের প্রবল বন্যা আসে। এই সময় ভক্তিমূলক বহু নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্য রচিত হইতে লাগিল। মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীগণের নৃত্যের প্রচলনও অব্যাহত ছিল। এই মন্দির নৃত্য একমাত্র দেবদাসীদিগের জন্যই ধার্য ছিল। নট্টুভনর অথবা সঙ্গীতাচার্যগণ এই সকল দেবদাসীদিগের শিক্ষাগুরু ছিলেন। এইসকল দেবদাসী ও নট্টুভনরগণ বহুযুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক দীপবর্তিকা বহন করিয়া সাংস্কৃতিক পথকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের দীপবর্তিকার আলোকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন কলারসিক রাজা মহারাজগণ। কাঞ্চীপুরমের পল্লবগণের (৭ম-৮ম খৃষ্টাব্দ) সঙ্গীতপ্রিয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পল্লবগণের ভিতর নরসিংহ বর্মা সঙ্গীত-কলাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। পল্লব-চোলরাজ পরকেশরী বর্মা চিদাম্বরমে স্বর্ণনির্মিত নটনসভা নির্মাণ করেন। ১০০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজরাজা ও তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র (১০৪২ খৃঃ) সঙ্গীতকলার উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোলথুঙ্গা (১ম ও ২য়), রাজরাজন্ (২য়) ও কোলথুঙ্গার (৩য়) রাজত্বের সময় সঙ্গীতের গতি অব্যাহত ছিল। এই সময় চাক্কিয়ারগণ, তামিল, সংস্কৃত ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া সঙ্গীতদেবীর আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতে বাহিরাগতদের আগমনে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে নাট্যশাস্ত্রকার শার্ঙ্গদেব দৌলতাবাদের রাজা সিঙ্গান্নাদেবের আশ্রয় লাভ করেন। চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের সূত্রপাত হয়। রাজা কৃষ্ণদেবের রাজত্বের সময় পুনরায় সঙ্গীতকলা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পূজায় নৃত্য অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। অতি প্রাচীন 'মুরুগণ'পূজাতে নৃত্য করা হইত। পরবর্তীকালে শিকারীগণ কর্তৃক 'কোরাভাইয়ের' পূজা, গোপালিকাগণ কর্তৃক কৃষ্ণপূজা প্রভৃতির ভিতর নৃত্যগীতের আয়োজন করা হইত। এই সকল পূজাতে অনুষ্ঠিত নৃত্যগুলি সাধারণতঃ সমবেত ভাবে করা হইত। ইহা ব্যতীত আল্লিয়স্ (কংসের হাতী কুবলয়পদ বধ), কুদম্ (কৃষ্ণের ছদ্মবেশে বাণরাজের নগরে যাইয়া নৃত্য), পাবৈ (বিষ্ণুর মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অসুরদিগের হৃদয় হরণ), কডয়ম্ (বাণরাজ্যে ইন্দ্রাণীর নৃত্য) ইত্যাদি একক নৃত্যও প্রচলিত ছিল। এইগুলিকে 'কুথু' বলা হইত। শিলপ্পদিকরণ ও অন্যান্য তামিলগ্রন্থে ইহাদের কুথুই বলা হইয়াছে। এই কুথু দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—'আহ' কুথু ও 'পুরা' কুথু। 'আহ' কুথুতে প্রেমের উপাখ্যান এবং 'পুরা' কুথুতে যুদ্ধের উপাখ্যান স্থান পাইত। কথিত আছে, একাদশ প্রকার কুথুর প্রচলন ছিল।

ভক্তিযুগে যে সকল নৃত্যনাট্য রচিত হইয়াছিল, তাহার ভিতর 'ব্রাহ্মণমেলা', 'শিবলীলা', 'নট্টুভমেলা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল নাটকই পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন নাম লইয়াছে। প্রতিভাশালী কবি অথবা নাট্যকারগণ ইহাতে বহু সংযোগ-বিয়োগ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দাতে 'ভাগবতমেলা', 'কুচ্চিপদী', 'যক্ষগণ' প্রভৃতি নৃত্য-নাট্যগুলি প্রাচীন নৃত্যনাট্যগুলির পরিণত অবস্থা। এই সকল নৃত্য-নাট্যগুলির প্রবর্তকগণ ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা একাধারে কবি, নৃত্যজ্ঞ ও নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইঁহারা রাজা-মহারাজাদিগের দাক্ষিণ্যলাভ করিয়া গ্রামে স্থিতি লাভ করেন। ইঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় নৃত্যনাট্যগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। এইজন্য ষোড়শ শতাব্দীর নৃত্যের ইতিহাস বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই যুগে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য উভয় দেশেই সর্বপ্রকার শিল্পকলাতে প্রাণসঞ্চার হইয়াছিল। দক্ষিণে ভাগবতারগণ কলাদেবীর আরাধনা করিয়া প্রাচীনকলাকে পুনরুজ্জীবিত

করিয়া তুলিলেন। যাঁহারা কথকতা করিতেন অথবা জনসাধারণের সম্মুখে জীবিকা হিসাবে ভগবানের গান করিতেন, তাঁহাদিগকে তামিলনাদে 'ভাগবতার' এবং অন্ধ্রপ্রদেশে 'ভাগবতালু' বলা হইত। কথকতাকে 'কালক্ষেপম্' বলা হইত।

চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে আমরা দক্ষিণ ভারতের নৃত্যকলার ধারাবাহিকতার একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে পারি। তাহাতে দক্ষিণে নৃত্যকলা কিরূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায়। এই সকল জনপ্রিয় নৃত্যনাট্য রচিত হইবার পূর্বে অন্ধ্ররাজগণ দেবদাসী নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। দেবদাসীগণের নৃত্য ছিল আত্মকেন্দ্রিক। একমাত্র দেবতা ইহার দ্রষ্টা ছিলেন। রাজা ও তাঁহার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিগণ এই প্রসাদ লাভ করিতে পারিতেন। অর্থাৎ তাঁহারাও এই নৃত্য দর্শনের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হইতেন। প্রচারধর্মী ছিল না বলিয়াই জনসাধারণের সহিত এই নৃত্যকলার কোন পরিচয় ছিল না। কালক্রমে দেবদাসীপ্রথা বিপথগামী ও বিপন্ন হইলে নট্টুভনরগণ জীবিকার্জনের জন্য মন্দিরের বাহিরেও নৃত্যশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। অপরপক্ষে দেবদাসীগণ মন্দিরের সহিত সংযোগ হারাইয়া একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হইলেন এবং জনগণের ঘৃণা ও অবজ্ঞার কেন্দ্রস্থল হইলেন। ইঁহারা বিশেষ করিয়া 'শ্রীকাকুলম্'-এর 'দিবি' তালুকে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় ভক্তিবাদের প্রাবল্যে ভক্তিমূলক নাটকাদি রচিত হইতে লাগিল এবং সেইগুলি ধর্মপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। এই সকল নাটক ও সঙ্গীতের রচয়িতা ব্রাহ্মণ ভাগবতারগণ ধর্ম ও ঈশ্বরবাদে একনিষ্ঠ প্রেম ও ভক্তি, শিল্পকলার প্রতি নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও চাতুর্যের দ্বারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে নৃত্যকলার সহিত জনসাধারণের গভীর সংযোগ স্থাপিত হইল। নৃত্যনাট্যগুলিও জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। ভাগবতারগণ তাঁহাদের রচনায় দেশী ও মার্গ সঙ্গীতের অপূর্ব সমাবেশ করিলেন। যদিও

পবিত্রতা রক্ষার্থে তাঁহারা দেবদাসীগণের সান্নিধ্য হইতে দূরে রহিলেন, কিন্তু শিল্পকলায় ইঁহাদের ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করেন নাই। এমন কি নট্টুভনরগণও ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এই সকল কারণে 'ভরতনাট্যম্' বলিতে শুধুই 'দাসীঅট্টম্' নহে। ইহার পরিধি আরও বিস্তৃত। ইহার ভিতর 'কুচ্চিপদী', 'ভাগবতমেলা নাটক', 'কুরুভঞ্জী' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যকেও গণ্য করা হয়। 'দাসীঅট্টম্' অন্যান্য নামেও অভিহিত হইয়া থাকে যথা—'চিন্নমেলম্' 'সাদীর নৃত্য', 'তাঞ্জোর নৃত্য' ইত্যাদি। যাহাই হউক, 'ভরতনাট্যম্' নামকরণের সার্থকতাই হইতেছে যে, ইহা ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াছে। অনেকে অবশ্য বলিয়া থাকেন যে, ইহাতে ভাব-রস-তালের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'ভরতনাট্যম্' হইয়াছে। ইহা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কারণ ভরতের নাট্যশাস্ত্র অবলম্বন করিলে এই তিনটি সংগ্রহ আপনা হইতেই নৃত্যে যুক্ত হয় এবং নাট্যে যাহা করণীয় তাহারও প্রয়োগ হয়। সুতরাং নামকরণ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, যাহা ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াছে তাহাই 'ভরতনাট্যম্।' সেইজন্য 'ভরতনাট্যম্' নৃত্যকে ভরত কর্তৃক নির্দেশিত প্রাচীন নৃত্যধারার একমাত্র পথিকৃৎ মনে করা হয়।

কাকতীয় রাজ্যের পতনের পর গঙ্গবংশীয় প্রথম ভানুদেব এই রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১২৬৩-১২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিবার পর ভানুদেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার নাবালক পুত্রের অভিভাবক রূপে পরমবৈষ্ণব নরহরি তীর্থ 'শ্রীকাকুলামে' আসিবার সময় কয়েকজন দেবদাসীকে লইয়া আসেন। এই সকল দেবদাসীগণ সুললিতকণ্ঠে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গাহিতেন এবং নৃত্য করিতেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রচলন হয়। তাঁহাদের এইরূপ গীতগোবিন্দ অভিনয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া আঞ্চলিক দেবদাসী ও নর্তকীগণও এই সকল গীত শিক্ষা করেন। গীতগোবিন্দের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া অনেক ভাগবতার ও কবিগণ কৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা

করিতে লাগিলেন। ইহারই পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ১৩৫০ হইতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের ভিতর সিদ্ধেন্দ্রযোগী তাঁহার অনুপম কাব্যপ্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও অতুলনীয় শিল্পীমন লইয়া নূতন নৃত্যনাট্য সৃষ্টি করিলেন যাহা 'কুচ্চিপদী' নামে অভিহিত হইল।

কৃষ্ণা নদীর তীরে 'কুচ্চেলপুরম্' গ্রাম হইতে এই নৃত্যের উদ্ভব হয় বলিয়া ইহার নাম 'কুচ্চিপদী'। কুচ্চেলপুরম্ গ্রাম পরবর্তীকালে 'কুচ্চীপদী' বলিয়া অভিহিত হয়। কনকলিঙ্গেশ্বর রাও 'কুচ্চীপদী' নামকরণের একটি সুন্দর ব্যাখা করিয়াছেন। সিদ্ধেন্দ্রযোগী 'ভামকালপম্' রচনা করিয়া তাহার রূপায়ণের জন্য একদল ব্রাহ্মণ বালক মনোনীত করেন এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য ইহা নিষিদ্ধ করেন। এই ভ্রাম্যমাণ ব্রাহ্মণগণকে বলা হইত 'কুচিলু'। 'কুচিলু' 'কুশীলবের' অপভ্রংশ। এই সকল ব্রাহ্মণবালকগণ যে গ্রামে বসতি স্থাপন করেন তাহা 'কুচ্চেলাপুরী' বলিয়া খ্যাত। সুতরাং বলা যাইতে পারে, 'কুচ্চেলাপুরমের' নামকরণও 'কুচিলু' হইতে হইয়াছে। আরও পরবর্তীকালে ইহা 'কুচ্চীপদী' হইয়াছে। সিদ্ধেন্দ্রযোগীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে 'ভামকালপম্'। কৃষ্ণের স্তুতিমূলক কতকগুলি গানের গুচ্ছকে 'ভামকালপম্' বলা হইয়াছে। 'ভামকালপম্'এ তিনি কৃষ্ণকে লোকভর্তা এবং নিজেকে সত্যভামা কল্পনা করিয়া সত্যভামার প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন। নৃত্যকুশলা ভ্রষ্টা দেবদাসীরা এই অনুপম 'ভামকালপম্' শিখিতে চাহিলে সিদ্ধেন্দ্রযোগী তাহা অনুমোদন করেন নাই। তিনি স্ত্রী-চরিত্র রূপায়ণেও পুরুষদিগের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ইহাতে কোন ব্যভিচারিতা প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া ইহাতে স্ত্রীলোকগণের অভিনয় তিনি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মণবালককে ভামকালপম্ শিক্ষা দিয়া জনসমক্ষে তাহা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ নর্তক হইতে চাহিলেন না। সিদ্ধেন্দ্রযোগী তাঁহাদিগকে নৃত্যের মহিমা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে, ইহার দ্বারা মোক্ষলাভ করা

যায়। নৃত্যে গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য তিনি বলিলেন, প্রত্যেক অভিনেতাকে বেদ, শাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইবে এবং তিনবার সন্ধ্যা-বন্দনা করিতে হইবে। ইহাতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ বিরুদ্ধাচরণ করিলে সিদ্ধেন্দ্রযোগী নর্তকদিগকে লইয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানটি 'কুচেলপুরম্' বলিয়া খ্যাত হয়। নৃত্যনাট্যগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিলে বিজয়নগরের মহারাজ বীর নরসিংহ দেবরায় ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজদরবারে এই সকল শিল্পীগণকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাদের নৃত্যকলায় বিশেষ সন্তুষ্ট হন। এখনও পর্যন্ত দেখা যায়, ব্রাহ্মণদিগের ভিতর এক শ্রেণী বংশগত অধিকার সূত্রে এই কলার চর্চা করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও রাজামহারাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত তালুকের বিষয়সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করেন।

কুচিপদী নৃত্যনাট্যের ভিতর 'পারিজাতহরণ' বা 'ভামকালপম্' বিশেষভাবে খ্যাত। সাধারণতঃ ত্রিরাত্রি ধরিয়া এই সকল নৃত্যনাট্যের আয়োজন হইত। ইহার একটি ধর্মগত কারণও আছে। পদ্মপুরাণে আছে যে, নবরাত্রি জাগরণ করিয়া বিষ্ণু সমক্ষে হৃষ্টচিত্তে করতাল বাদ্য, গীত-নৃত্যাদি পরিবেশন, কৃষ্ণচরিত্র পাঠ, শাস্ত্রালোচনা, তিল প্রদীপ প্রজ্বলন, সদালাপ, প্রসন্নভাব, ভক্তিভাবের উন্মেষ প্রভৃতির দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়। রাত্রিজাগরণের এই প্রকার দ্বাদশটি বিধি আছে। সেইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভক্তিমূলক নাটকগুলি রাত্রিতেই অনুষ্ঠিত হইত। এক রাত্রিতে ইহা শেষ হইত না। সেইজন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নাটকগুলি কয়েক রাত্রি ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইত।

কুচ্চীপদী নৃত্যনাট্যে অভিনেতৃগণ স্বয়ং গান করেন এবং তাহার সহিত নৃত্য করেন। কুচ্চীপদী নৃত্যনাট্যকে নাট্যধর্মী বলা যাইতে পারে। কারণ ইহাতে পুরুষগণই নারীচরিত্র অভিনয় করেন। নৃত্যনাট্য আরম্ভ হইবার পূর্বে চারিটিবেদ হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়।

ইহার পর নর্তক 'পুণ্যাহ' বারিসিঞ্চনে রঙ্গমঞ্চকে পবিত্র করেন। রঙ্গদেবতার সম্মুখে ৫৮টি প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয় এবং ধূপ দেওয়া হয়। ইহার পর দর্শকদিগের শুভকামনা করিয়া ফুল প্রদান করা হয়। ফুল প্রদানের পর রঙ্গমঞ্চে ইন্দ্রের বিঘ্ননাশক-'জর্জর' স্থাপন করা হয়। 'জর্জর' স্থাপনান্তে গণেশ প্রবেশ করিয়া শিল্পীগণকে আশীর্বাদ করেন। আশীর্বাদান্তে 'অম্বা' অথবা গুরু-প্রার্থনা করিয়া নান্দীস্তোত্র পাঠ করা হয়। ইহার পর সূত্রধার 'কুটিলক' দণ্ড ধারণ করিয়া গুরু-প্রার্থনা করেন এবং দর্শকদিগকে অভিবাদন করিয়া বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দান করেন। অতঃপর নৃত্যাভিনয় সুরু হয়। 'ভাগবত মেলা' নাটকের ন্যায় ইহাতেও 'কোণাঙ্গী'-প্রবেশ, 'পাত্র-প্রবেশ', 'দারু' প্রভৃতি আছে।

বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর অনেক নৃত্যশিল্পী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ তাঞ্জোর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঞ্জোররাজ অচ্যুথাপ্পা নায়ক সাদরে ইঁহাদের আশ্রয় দেন (১৫৭২ খৃঃ)। ইঁহার উত্তর পুরুষ রঘুনাথ নায়ক এবং বিজয়রাঘভুলু নায়কের রাজত্বকালে (১৬১৪-১৬৭৩ খৃঃ) অন্ধ্রদেশীয় সাধু তীর্থনারায়ণ যোগী ও ক্ষেত্রায়ার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তীর্থনারায়ণ যোগী তামিলনাদের তাঞ্জোর প্রদেশের অন্তর্গত বরাহুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গানগুলি 'তরঙ্গম্' বলিয়া কথিত হয়। তীর্থনারায়ণ যোগীই গীতিনাট্যগুলিকে নৃত্যনাট্যে পরিণত করেন। তাঁহার রচনার মূল প্রেরণা ছিল ভরতের নাট্যশাস্ত্র। ইহা ব্যতীত তিনি 'রুকমঙ্গদ' প্রভৃতি নৃত্যনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। তীর্থনারায়ণকে 'ভাগবত মেলা' নাটকের স্রষ্টা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে ইহার পূর্বেও যে নৃত্যনাট্যের প্রচলন ছিল তাহা অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীর শিলালিপি হইতে জানা যায়। 'ভাগবতমেলা' নাটকের অন্তর্গত 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে 'কোণাঙ্গী' অর্থাৎ ভাঁড় প্রবেশ করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিয়া সকলকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। বাদ্যবৃন্দের সহযোগে দেবতার আরাধনান্তে সর্ববিঘ্ননাশকারী গণেশের

নৃত্য হয়। গণেশনৃত্যের পর 'পাত্রপ্রবেশম্'-এ যে গীত ও নৃত্য হয় তাহাকে 'দারু' বলা হয়। ইহার পর নৃত্যনাট্য আরম্ভ হয়। ইহাতেও শব্দম্, পদবর্ণম্, তিল্লানা প্রভৃতি থাকে।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে অচ্চুথাপ্পা নায়ক কর্তৃক ১৫০ জন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত 'অচ্চুথাপুরম্' গ্রামটি পরবর্তীকালে 'অন্নদাপুরম্' এবং তাহারও পরে 'মেলাটুর' নামে পরিচিত হয়। ১৫০ শত বৎসর পূর্বে ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রীর সময় মেলাটুর গ্রামের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলগুলিও অনুপ্রাণিত হইয়া নৃত্যকলার চর্চা আরম্ভ করে। 'শূলমঙ্গলম্', 'উথুকডু', 'নালুর', 'শৈলমঙ্গলম্' এবং 'তেপেরুমন্নলুর' গ্রামে এই নৃত্যনাট্যের চর্চা সুরু হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে ভাগবতারদিগের মৃত্যুতে প্রায় সকল গ্রাম হইতেই এই নৃত্যকলা লুপ্ত হইয়া যায়। কেবলমাত্র মেলাটুর গ্রামে ইহার অস্তিত্ব থাকে। এই মেলাটুর গ্রামেই ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন।

নায়করাজগণের হস্ত হইতে রাজশক্তি মহারাষ্ট্রীয় রাজগণের হস্তে চলিয়া যায়। তাঞ্জোরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা তুলাযাজী সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তুলাযাজী 'তিন্নিভেলী' হইতে একজন দক্ষ ভরতনাট্যম্-নৃত্যশিল্পীকে নিজ রাজসভায় আনয়ন করেন। ইহার নাম ছিল মহাদেব আন্নাভি। আন্নাভি তাঞ্জোর রাজসভায় আসিবার সময় তাঁহার দুইজন শিষ্যাকে সঙ্গে লইয়া আসেন। ইঁহারা বনজাক্ষী ও মুথুমন্নর নামে পরিচিত। প্রতাপসিংহ ও তুলাযাজীর রাজত্বকালেই ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রীর আবির্ভাব হয়। মহাদেব আন্নাভি 'ভরতনাট বিদ্বান্' নামে বিশেষভাবে সম্মানিত হন। রচয়িতা ও শিক্ষাগুরু হিসাবে ইনি বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঞ্জোরের বিখ্যাত ভ্রাতৃচতুষ্টয় চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, ভেডিভেলু ও শিবানন্দমের পিতা সুব্বারাও তাঞ্জোরাধিপতির দাক্ষিণ্যলাভ করেন।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সারফোজী ও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিবাজীর রাজত্বকালে সঙ্গীতের

বিশেষ উন্নতি হয়। কথিত আছে যে, ইঁহাদের রাজত্বকালে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, ভেডিভেলু এবং শিবানন্দম্ আধুনিক ভরতনাট্যম্ নৃত্যের সংস্কার করেন। ত্রিবাঙ্কুররাজ স্বাতী তিরুমল নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ এবং গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি ভেডিভেলুকে তাঁহার রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসেন। এই সময় 'কুত্রলা' কুরুভঞ্জী নৃত্যনাট্যের উপর ভিত্তি করিয়া 'সারফোজী' কুরুভঞ্জী রচিত হয়। তাঞ্জোররাজ চিন্নাইয়ার নৃত্য দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন এবং পুরুষগণকে এই নৃত্যে পারদর্শী করিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেন। চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দম্, ও ভেডিভেলু কর্তৃক ভরতনাট্যম্ নৃত্যের সংস্কার হইবার পূর্বে ইহার রূপ ছিল একটু অন্যপ্রকার। তাহাতে নৃত্তের অংশ খুবই কম ছিল। নৃত্যে 'কৌস্তভম্' অথবা 'কবিত্বম্' প্রদর্শিত হইত। কিন্তু এই ভ্রাতৃচতুষ্টয় নৃত্যের সহিত সমান অংশে নৃত্তের যোগ করিলেন। ইহার ফলে, এই নৃত্য আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠে।

তামিলনাদে আর একপ্রকার নৃত্যনাট্যের প্রচলন ছিল। ইহাকে 'কুরুভঞ্জী' বলা হইত। ইহাতে পুরুষগণ অংশ গ্রহণ করেন না। কেবলমাত্র ছয়জন হইতে আটজন নর্তকী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। একটি বিরহকাতরা প্রেমিকার কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্যনাট্য রচিত। ইহার নায়ক কোন রাজা অথবা অদৃশ্য দেবতা। একটি যাযাবর নারী প্রেমিকার হস্তরেখা বিচার করিয়া নায়িকার কল্পিত প্রেমিকের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে। এই নৃত্যনাট্যে যাযাবর নারীচরিত্রটিই প্রধান। ইহাই নৃত্যনাট্যের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে বিংশতি প্রকার কুরুভঞ্জীর প্রচলন ছিল। তাহার ভিতর অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিরুকুডা রাজাপ্পা কবিরাজ কর্তৃক রচিত—'কুত্রলা' কুরুভঞ্জী, 'সারফোজী' কুরুভঞ্জী, 'ধীরলি' কুরুভঞ্জী বিশেষভাবে খ্যাত। কুরুভঞ্জী ও সাদীর নৃত্যে অব্রাহ্মণ শিল্পীগণ অংশ গ্রহণ করেন। ইহার পরিচালক, শিক্ষাগুরু এবং অন্যান্য সকলেই অব্রাহ্মণ

হন। অপরপক্ষে 'ভাগবত মেলা' ও 'কুচিপদী' নাটকে অব্রাহ্মণগণ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। সুতরাং বিকল্পহিসাবে যে দেবদাসীগণ কুরুভঞ্জী নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করিতেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

ভরতনাট্যম্-আচার্যগণের মতে এই নৃত্য দুই প্রকার হইতে পারে—'গৌরীভরতম্' ও 'নন্দীভরতম্'। অনেকে বলেন, 'নন্দীভরতম্' এবং 'হনুমত্ ভরতম্'। গৌরীভরতম্ নাট্যশাস্ত্রকে এবং নন্দীভরতম্ অভিনয় দর্পণকে অনুসরণ করে। অবশ্য ইহার ভিতর ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রভাবও দেখা যায়। 'সাদীর' কথাটি 'চতুর' কথাটির অপভ্রংশ। চারিটি বেদ হইতে ইহার সারাংশ সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'চতুর' অথবা 'সাদীর' নাট্য বলা হইয়া থাকে। 'চতুর' কথাটির 'নিপুণ' অর্থও করা যায়। নট্টুভমেলা হইতে সাদীর নৃত্যের উদ্ভব।

ভরতনাট্যম্ শিখিতে হইলে প্রথমেই 'আদাউ'-এর অভ্যাস করিতে হয়। ইহাতে নৃত্তহস্ত, পাদভেদ, স্থানক, চারী, রেখা ও সৌষ্ঠবের সমন্বয় হইয়া থাকে। এইগুলি পরিপূর্ণভাবে আয়ত্তে আসিলে নৃত্যের পরবর্তী অংশগুলি শিখিতে হয়।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যপদ্ধতিতে পদতল সম্পূর্ণরূপে ভূমিতে স্থাপনকে 'টাট্' বলা হয়। ভূমিতে গোড়ালির দ্বারা আঘাত করাকে 'মেট্' বলা হয়। পর্যায়ক্রমে পদতল ও গোড়ালির দ্বারা আঘাত করাকে 'টাট্ মেট্' বলা হয়। নৃত্যে 'তেইউমদত্তা' বোলটি 'টাট-মেট্'এর সাহায্যে করা হয়। পদতলের অগ্রভাগ দ্বারা লাফাইয়া গোড়ালির দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিলে 'কুদিত্তি মেট্টি' হয়। এই ধরণের পদক্রিয়ার দ্বারা 'তেইকৎতেই' করিতে হয়। পদতলের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিলে 'নাট্' হয়। ভরতনাট্যম্ নৃত্যে ছোট বোলকে 'জেদী' বলা হইয়া থাকে এবং কতকগুলি জেদার সমষ্টিকে অথবা বৃহৎ বোলকে 'তিরমন্নম্' বলা হইয়া থাকে।

সাদীর নৃত্যের ছয়টি অংশ—আলারিপ্পু, যতিস্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্, তিল্লানা ও পদম্।

আলারিপ্পু—ইহা সর্বাপেক্ষা সরল ও সংক্ষিপ্ত অংশ। এই অংশে রঙ্গদেবতাকে প্রণাম ও সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে অভিবাদন জানানো হয়। ইহাতে পুষ্পের কলির ন্যায় গ্রীবারেচক, হস্তরেচক, বর্তনা ও আদাউএর দ্বারা দেহকে বিকশিত করিয়া তোলা হয়। অর্থাৎ পুষ্পকলি ধীরে ধীরে যেরূপ নিজেকে বিকশিত করে, শিল্পীও সেইরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা নৃত্যকে বিকশিত করেন। ইহা হইতেছে নৃত্যারম্ভ অথবা পূর্বপ্রস্তুতি। ইহাতে লয় ও ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং প্রদর্শন করিতে অর্থহীন কতকগুলি ছন্দময় শব্দের প্রয়োগ হয়। ইহাকে 'শোল্লকুট্টশ' বলা হয়।

যতিস্বরম্—ইহা সম্পূর্ণ নৃত্তপর্যায়ভুক্ত ও অধিকতর জটিল। ইহাতে যতি ও রাগের সমন্বয় হয়। কোন বিশেষ তালের ছন্দের সহিত স্বরগ্রামগুলিকে গ্রথিত করা হয় এবং তাহার সহিত যতপ্রকার সম্ভব অঙ্গহারের সমন্বয় করা হয়। এই সকল অঙ্গহারগুলি কোন ভাবের দ্যোতক নহে। অথবা ইহাতে কোন অভিনয় থাকে না। যতির সহিত স্বরগ্রামের গ্রন্থন হয় বলিয়া ইহাকে 'যতিস্বরম্' বলা হয়।

শব্দম্—নৃত্যাভিনয়ের প্রথম রসাস্বাদন হয় 'শব্দম্'-এ। সুন্দর সুন্দর গীতের সাহায্যে অভিনয় প্রদর্শন করা হয়। ইহাতে দেবতা অথবা রাজার স্তুতি করিয়া যশোগান করা হয়। সঞ্চারী ভাবের সাহায্যে একই অর্থকে বিভিন্নভাবে প্রদর্শন করা হয়।

বর্ণম্—ইহা ভরতনাট্যমের সর্বাপেক্ষা জটিল ও দীর্ঘতম অংশ। ইহার ভিতর নৃত্য ও নৃত্ত সমানভাবে কার্য করে। গানের প্রতিটি পংক্তি সূক্ষ্ম ও কঠিন তাললয়ে বিভিন্ন মুদ্রা ও অভিনয়ের সাহায্যে গীত হয়। মধ্যে মধ্যে স্বরগ্রামের সহিত যতি অথবা 'তিরমান্নম্'ও করা হয়। ইহাতে নৃত্যের রীতি সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলা হয়; অর্থাৎ

পদদ্বয়ের দ্বারা কঠিন তাল-প্রবন্ধ, হস্তের দ্বারা সঙ্গীতের অর্থ ও মুখমণ্ডলের দ্বারা অভিনয় করা হইয়া থাকে। ইহাতে শিল্পীর চাতুর্য, প্রতিভা এবং শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণমের ভিতর দুইটি ভেদ আছে—পদবর্ণম্ ও তানবর্ণম্। পদবর্ণমে সাহিত্যের সহিত তিরমন্নমের সংযোগ হইয়াছে। তানবর্ণম্ দ্রুত ছন্দে করা হয়। ইহাতে তিরমন্নম্ ও সরগম্ থাকিলেও সাহিত্যের প্রাধান্য নাই। তানবর্ণম্ আয়ত্ত করা অতি দুরূহ।

তিল্লানা—ইহার সহিত 'তিলানা' গীত হয় বলিয়া ইহাকে 'তিল্লানা' বলা হয়। ইহাতে গানের সহিত ছন্দের বৈচিত্র্য একটি অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করে। ইহার অন্তে গণেশ-বন্দনা প্রভৃতি থাকে। 'জেদা' (যতি) অথবা 'তিরমান্নমের' সহিত বিভিন্ন করণ, চারী প্রভৃতির সংযোগ হয়। 'তিলানা' উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্গত। প্রায় দেড়শত হইতে দুইশত বৎসর পূর্বে উত্তরভারতের কয়েকজন সঙ্গীতগুণী দক্ষিণ ভারতে আসেন এবং তখনই ইহা কর্ণাটক সঙ্গীতের সহিত মিশ্রিত হয়। পুন্নাইয়া পিল্লাইয়ার সময় 'তিলানা' গান দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যে সংযোজিত হয় এবং তাঁহার পরিবারস্থ পরবর্তী চারজন নট্টুভনর তাঁহাদের শিষ্যদিগকে ইহা শিক্ষা দেন।

নৃত্যের শেষ অংশে 'পদম্' প্রদর্শিত হয়। পদমে যে সকল গীত সংযোগ করা হয় তাহার অধিকাংশই প্রেম-সঙ্গীত। নায়কের সহিত নায়িকার মিলিত হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি পদমের ভিতর ব্যক্ত করা হয়। ক্ষেত্রায়ার পদাবলী ও জয়দেবের অষ্টাপদীও পদমে গীত হয় এবং মুখাভিনয়ে ইহা সর্বাপেক্ষা উপযোগী। পদমে রসনিষ্পাদন সার্থক হয়। ভরতনাট্যম্ নৃত্য একাধারে সাহিত্যে, ভাস্কর্যের সৌন্দর্যে, শাস্ত্রের অনুশাসনে ও রসের অভিব্যক্তিতে রূপময় হইয়া উঠে।

বিভিন্নস্থানের আঞ্চলিক পদ্ধতি হিসাবে ভরতনাট্যম্ নৃত্যে বাহ্যিক সামান্য বৈষম্য থাকিলেও মূলগত কোন বৈষম্য নাই। অবশ্য বিভিন্ন

অঞ্চলের নট্টুভনরগণের ভিতর এই নৃত্যে প্রতিযোগিতা থাকিলেও উত্তর ভারতের ন্যায় বিবাদ নাই।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যে বাদ্যযন্ত্রের ভিতর মৃদঙ্গ প্রধান। তালের গতি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য মন্দিরা বাজান হয়। ইহাকে 'ঝালর' অথবা 'তালম্' বলা হয়। ইহা ব্যতীত বাঁশী, বেহালা, তম্বুরা, মুখবীণা, নাগেশ্বরম্ প্রভৃতিও সহযোগিতা করে। প্রাচীনকালে কথকনৃত্যের যন্ত্রীগণের ন্যায় ভরতনাট্যম্ নৃত্যেও যন্ত্রীগণ ও গায়ক-গায়িকাগণ নৃত্যশিল্পীর অতি নিকটে পদচারণা করিয়া সহযোগিতা করিতেন। প্রাচীন কথাকলি নৃত্যেও এই প্রথা দেখা যায়।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যে যুগান্তকারী ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সুযোগ্য অধিকারী হইতেছেন পাণ্ডানাল্লুরের মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই। ইঁহার সুযোগ্য শিষ্য এবং শিষ্যাগণ ভরতনাট্যম্ নৃত্যের গৌরবকে শতগুণ বর্ধিত করিয়াছেন। নৃত্যের সংস্কারক হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ আয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন আইনবিশারদ হইয়াও নৃত্যানুরাগী ছিলেন। ভরতনাট্যম্ নৃত্যকে জনসাধারণে প্রচার করিবার জন্য তিনি স্বয়ং স্ত্রীলোক সাজিয়া নৃত্য করিতেন। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বালা সরস্বতীকে তিনিই প্রথম জনসমক্ষে পরিচয় করান। বালা সরস্বতী দেবদাসীবংশোদ্ভূত। ভরতনাট্যম্ নৃত্যের সঠিক ধারাটিকে তিনিই বহন করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত রুক্মিণী দেবী, রামগোপাল, শান্তা রাও, মৃণালিনী সারাভাই, ইন্দ্রাণী রেহমান, কমলা লক্ষ্মণ, রিতা চ্যাটার্জী প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।



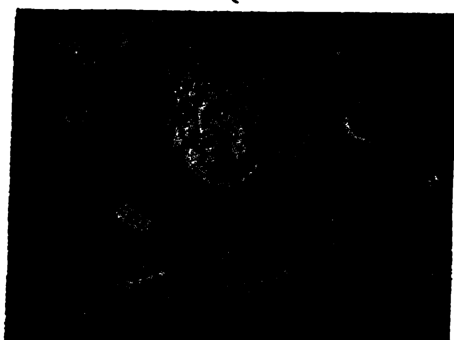
বিখ্যাত কথক নৃত্যশিল্পী
বিন্দাদীন মহারাজ ও
কালকাপ্রসাদের
সুযোগ্য শিষ্য ও
সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ
ঝাণ্ডে খাঁ



ভরতনাট্যম্ নৃত্যের
দিকপাল মরুথাপ্পা পিল্লাই



মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী
কথক নৃত্যের অধ্যাপিকা (রবীন্দ্রভারতী)



কৃষকবধূ

কথাকলি



"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবনমরণ
হরণ করি।"

—রবীন্দ্রনাথ

কথাকলি

কথাকলি নৃত্যের গৌরব বহন করিতেছে দক্ষিণভারতের পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার প্রান্তদেশে আরবসাগরের উপকূলে তালবৃক্ষরাজিশোভিত আধুনিক কেরালা রাজ্যটি। রাজ্যটি ক্ষুদ্রায়তন বটে, কিন্তু শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনকালে এই রাজ্যটির আয়তন ছিল কুমারিকা অন্তরীপ হইতে উত্তরে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাজ্যের চের ও পেরুমল রাজগণও শিল্পকলা, সাহিত্য ও রাজনীতিতে নিজেদের শিল্পপ্রীতির স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসের কালস্রোতে তাহা আজও ম্লান হয় নাই।

কোরালা রাজ্যটি বহু প্রাচীন। ইহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রন্থ শিলপ্পদিকরণে। ইহাতে আছে যে, যখন চেররাজ সেঙ্গুত্তভন নীলগিরির নিকট সৈন্যশিবির খুলিয়াছিলেন, সেই সময় ত্রিবাঞ্চিকুলমের পারুর হইতে চাক্কিয়ারগণ আসিয়া নৃত্য ও মূকাভিনয়ের দ্বারা রাজার মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কথাকলি নৃত্যে এই চাক্কিয়ারগণের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চাক্কিয়ারগণই সঙ্গীত-শাস্ত্রে, সংস্কৃতনাটক প্রভৃতিতে ‘সূতপুত্র’ বলিয়া পরিচিত। সূতপুত্রের ব্যাখ্যা পূর্বে করিয়াছি। কেরালায় সূতপুত্রগণ, চাক্কিয়ার’ এবং সূতকন্যাগণ ‘নাঙ্গিয়ার’ নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহারা সমাজে নটনটী হিসাবে স্বীকৃতি পাইতেন। চাক্কিয়ারগণের কথকতাকে ‘চাক্কিয়ার কুত্তু’ বলা হইত। চাক্কিয়ারগণ নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারাই কেরালার নৃত্যনাট্যকলা কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

চাক্কিয়ারগণ নিজদিগকে দেবদাস বলিয়া পরিচয় দেন। দেবদাসীগণের ন্যায় তাঁহারাও মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত নাটকে নৃত্য,

গীত ও অভিনয়াদি দ্বারা দেবতা এবং সুধীজনের মনোরঞ্জন করিতেন। মন্দিরের এই নৃত্যপ্রাঙ্গণকে 'কুথম্বলম্' বলা হয়।

চাকিয়ারগণের 'কুত্তু'কে দুই প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে—'প্রবন্ধকুত্তুম্' অথবা 'কথাপ্রসঙ্গম্ মন্ত্রকম্' এবং 'কুডিয়াট্টম্'। 'প্রবন্ধকুত্তুমে' কথকতার আশ্রয় লওয়া হইত। ইহা যখন জনসাধারণের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইত, ইহাতে বাচিকাভিনয়ের প্রাধান্য থাকিত। মৃদঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন বাদ্য যন্ত্র থাকিত না। ইহা নাঙ্গিয়ারগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে, 'নাঙ্গিয়ার কুত্তু' অথবা 'মত্তবিলাসম্' বলা হইত।

কুডিয়াট্টমে চাকিয়ারগণ সমবেতভাবে নৃত্যাভিনয় করিতেন। ইহাতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই অংশ গ্রহণ করিতেন। কুডিয়াট্টমে কেবলমাত্র সংস্কৃত নাটকই অভিনীত হইত এবং উচ্চবর্ণের ভিতরই ইহার প্রচলন ছিল। ইহাতে কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল যাহা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সেইজন্য সংস্কৃত নাটকের সহিত ইহার সামান্য প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন মুখচিত্রণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রজ্বলিত দীপ, যুদ্ধের দৃশ্য, রক্তপাত প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকে দেখিতে পাওয়া যাইত না। বিশেষ করিয়া রক্তপাত, মৃত্যুর দৃশ্য প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকে বর্জনীয়। ইহাতে বিদূষকই একমাত্র মুখ্য শিল্পী। বিদূষক তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, তীব্র শিল্পানুভূতি, গভীর শিল্পচাতুর্যের দ্বারা সমগ্র নাটকটিকে জমাইয়া রাখিতেন। যদিও কুডিয়াট্টম্ সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্ঠিত হইত, তথাপি গ্রামবাসীদিগের বোধগম্যের জন্য বিদূষক মালয়ালম্ ভাষায়ও নাটকের ব্যাখ্যা করিতেন। কুডিয়াট্টমের অভিনয়াংশ দ্বারা কথাকলি নৃত্য পুষ্ট হইয়াছে। কুডিয়াট্টমের অভিনয় দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিত। 'নাগানন্দ', 'আশ্চর্য চূড়ামণি' নাটকগুলি সাধারণতঃ কুডিয়াট্টমে করা হইত। এই নৃত্যকলা চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত পেরুমল রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। কুলশেখর পেরুমল, ভাস্কর পেরুমল, চেরমন পেরুমল প্রভৃতি রাজগণ এই নৃত্যনাট্যের বিশেষ সমাদর করিতেন।

কেরালার পেরুমল রাজবংশ যদিও শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতেন, কিন্তু নির্বাচিত হইতেন নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রেরিত জন-প্রতিনিধি দ্বারা। নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণগণ কেরালার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শাসনতন্ত্র অপেক্ষা আধ্যাত্মিকতায় ও শিল্পকলায় ইঁহাদের অধিকতর অনুরাগ ছিল। পেরুমল রাজগণ এই শিল্পকলাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। চতুর্থ খৃষ্টাব্দে পেরুমল রাজগণ হীনবীর্য হইলে নায়ারগণ প্রাধান্য লাভ করেন। ইঁহারা সামরিক শক্তিতে বলবান ছিলেন। ইঁহাদের সময় 'কলারী' অথবা সামরিক বিদ্যালয়গুলির অভ্যুত্থান হয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে যোদ্ধাদের দেহগুলিকে ব্যায়ামের দ্বারা সুগঠিত করিয়া তোলা হইত। পরবর্তীকালে এই ব্যায়াম সামরিক নৃত্যপর্যায়ভুক্ত হয়। নায়ারগণ এই 'কলারী' পর্যায়ভুক্ত সামরিক নৃত্যগুলির ধারক ছিলেন। নায়ারগণ যদিও অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন, তথাপি নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণগণ পদমর্যাদায় উচ্চস্থানীয় ছিলেন। নায়ারগণ যুদ্ধকৌশলী ছিলেন কিন্তু নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রে ও শিল্পকলায় নিপুণ ছিলেন। ইহার ফলে দুই শ্রেণীর ভিতর যে নাট্যের উদ্ভব হয়, তাহার একটি মার্গনৃত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং আর একটি লোকনৃত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কথাকলি নৃত্যে লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ হইয়াছিল। ইহার আরও একটি কারণ অনুধাবন করা যায়। কেরালার আদি অধিবাসিগণ ছিলেন দ্রাবিড়। কিন্তু আর্যগণের আগমনে দ্রাবিড় সভ্যতা পরিবর্তিত হইয়া হিন্দুসভ্যতায় পর্যবসিত হইল। আর্যগণের সংস্কৃতি দ্রাবিড়গণকে প্রেরণা দিয়াছিল। আর্য-সাহিত্যের নায়ক-প্রতিনায়কগণ দ্রাবিড়গণকে মুগ্ধ করিত এবং তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে আর্যগণকে অনুকরণের চেষ্টা করিতেন। কেরালার গ্রামবাসিগণ হস্তনির্মিত গহনা ও ভূষণের দ্বারা সজ্জিত হইয়া নিজদিগকে আর্যসাহিত্যের নায়ক-প্রতিনায়ক কল্পনা করিয়া নৃত্য ও বাচিক অভিনয়ের মাধ্যমে তাহা প্রদর্শন করিতেন। বাঁশের কঞ্চির দ্বারা

মাথার মুকুট, গহনা, ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেন ও চালের গুঁড়া, চূর্ণ প্রভৃতি মিশাইয়া মুখ চিত্রিত করিতেন। ইহার সহিত কোন বাদ্যযন্ত্র অথবা সাহিত্য ছিল না। ইহা কেবলমাত্র আনন্দলাভের জন্যই করা হইত। কিন্তু এই খেলার ভিতর ছিল মহীরুহের বীজ। এই খেলাকে বলা হয় 'কেলি।'

কেরালার নৃত্যকলা বহু স্তর অতিক্রম করিয়া আধুনিক কথাকলি নৃত্য পর্যায়ে আসিয়াছে। কেরেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নৃত্য হইতেছে 'মিত্তিয়েত্তু'। ইহার অর্থ হইতেছে 'বিজয়'। শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও সামরিক নৃত্যের ভিতর উল্লেখযোগ্য হইতেছে 'শাস্ত্রকেলি', 'সজ্ঘকেলি', 'এঙ্গমাত্তুকেলি', 'কলারী' ইত্যাদি।

ধর্মীয়-ক্রিয়া-অনুষ্ঠান সম্বলিত নৃত্য হইতেছে 'ভগবতী পাত্তু', 'তিয়েত্তু', 'পানা', 'কাহ্লাইয়ার কেলি', 'টুক্কু', 'কালীঅট্টম্' ইত্যাদি। 'ভগবতী পাত্তুতে' ভগবতীর দ্বারা দৈত্যনিধনের দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। দ্রাবিড় প্রভাবান্বিত মাতৃপূজার উপর ভিত্তি করিয়া এই সকল নৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। দৈত্যগণের ভীষণতাকে রূপ দিবার জন্য মুখোসের ব্যবহার হইত। ক্রিয়াহীন ধর্মীয় নৃত্যের ভিতর 'চাকিয়ার কুত্তু', 'কৃষ্ণঅট্টম্', রামায়ণের ছায়া নৃত্য ইত্যাদির নাম করা যায়।

মধ্যযুগের 'কৃষ্ণঅট্টম্' ও 'রামঅট্টমের' অবদান অবিস্মরণীয়। কথাকলি নৃত্যের কলেবর পুষ্ট করিতে ইহা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে কালিকটের স্যামুরিন মানবেদ 'কৃষ্ণঅট্টম্' রচনা করেন। কথিত আছে যে, একদা নিশীথ রাত্রে মানবেদ কৃষ্ণগোপালকে স্বপ্ন দেখেন এবং 'কৃষ্ণঅট্টম্' রচনা করিতে আদিষ্ট হন। স্বপ্নে তিনি একটি ময়ূরের পাখাও প্রাপ্ত হন। 'কৃষ্ণ অট্টম্' গীতগোবিন্দের অনুকরণে সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল।

কেরালার নৃত্যনাট্যে সাহিত্যের এই প্রথম সংযোজন। এই নাটকটিকে রূপদান করিতে মানবেদ উত্তর কোট্টয়মের রাজা, কুশলী অভিনেতা ও দুইজন মান্দুত্রী ব্রাহ্মণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন।

এই নৃত্যনাট্য মন্দির-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া উচ্চবর্ণ ব্যতীত অন্য কেহই ইহাতে যোগদান করিতে পারিত না। কৃষ্ণাদেশে এই নাটক রচিত হইয়াছিল, সেইজন্য ইহার সংস্কারও হয় নাই। এখনও পর্যন্ত 'কৃষ্ণ-অট্টম্' অভিনীত হইবার সময় অভিনেতাদিগকে শিখীপুচ্ছ ধারণ করিতে হয়।

কথিত আছে যে, একদা রাজা (স্যামুরিন) কৃষ্ণঅট্টম্ অভিনয় করিবার জন্য কোট্টরাকারার রাজা সম্পূরণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু স্যামুরিন মানবেদ এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে অপমানিত ক্ষুব্ধ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইতে সমগ্র জীবনের কার্যাবলী লইয়া 'রামঅট্টম্' রচনা করেন। এই নাটকটিকে ৮টি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং আটদিন ধরিয়া ইহা অভিনীত হইয়াছিল। 'রাম অট্টম্' মন্দির-প্রাঙ্গণের বাহিরেও অনুষ্ঠিত হইত। জনসাধারণের সুবিধার্থে মালয়ালম্ ভাষায় ইহা অনুষ্ঠিত হইত। 'রামঅট্টমে'র সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া অনেক পণ্ডিত, কবি ও নাট্যকারগণ নাটক রচনা করেন।

কৃষ্ণঅট্টমের অভিনয়াংশ কথাকলির ন্যায় এত সমৃদ্ধ ছিল না। ইহাতে সমবেত অথবা যূথ নৃত্যের সমাবেশ ছিল। নৃত্তাংশের উপর অধিকতর মনোনিবেশ করা হইত। ইহাতে অভিনেতাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে লীলাবসান পর্যন্ত সমগ্র কাহিনীটিকে রূপায়িত করিতে হইত। উত্তর মালাবারের গুরুভায়ুর মন্দিরে ইহা এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

রামঅট্টমের সময় পর্যন্ত নৃত্যনাট্যে বাচিক অভিনয়ের প্রচলন ছিল। ইহাতে গীতের ব্যবহার ছিল, কাঠের মুকুট পরিধান করা হইত এবং মুখোশ ব্যবহার করা হইত। পরবর্তীকালে ইহার পরিবর্তন হয়। ইহাতে নৃত্যের সংযোজন হয় এবং বাচিক অভিনয় সম্পূর্ণ বর্জিত হয়। বাচিকের স্থান পূর্ণ করিল পদমে (গীতে) বর্ণিত কথোপকথন। শুধু তাহাই নহে, সংস্কৃতে নাটকের নায়ক-নায়িকা ও অন্যান্য

চরিত্রগুলির পরিচয় ও স্থায়ীভাব বর্ণনা করার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। কথাকলি নৃত্যেও এই পন্থা অনুসৃত হইল। এই প্রকার নৃত্যনাট্য বা অট্টকথা কথাকলি নৃত্যনাট্যে পরিণত হইল।

কেরালার রাজগণ কলাপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ বহু নৃত্যনাট্য রচনা করিয়াছেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে কোট্টয়মের রাজা থম্পুরণ রাজ্যলাভ করিয়া ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার ভিতর তিনি 'বকবধ' 'ক্রিমিরা বধ', 'কালকেয়বধ' ও 'কল্যাণসৌগন্ধী' নামক চারটি নাটক রচনা করেন। ইনি স্বয়ং অভিনেতা ও নর্তক ছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কার্ত্তিক থিরুমলের প্রকৃত নাম ছিল, 'বলরাম বর্মা'। ইনি সংস্কৃতে একটি পুস্তক রচনা করেন। ইহার নাম 'বলরাম ভরতম্'। ইহা ব্যতীত ইনি সাতটি নাটক রচনা করেন। অশ্বতী থিরুমল চারটি নাটক লেখেন। এই চারটি নাটক হইতেছে 'পূতনা মোক্ষম্', 'অম্বরীষ চরিতম্', 'পুণ্ডরীক বধম্' ও 'রুক্মিণী স্বয়ম্বরম্'। ১৮১৩-১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাতী ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা থিরুমল রাম বর্মা কথাকলি নৃত্যনাট্যের জন্য ৭৫টি পদ রচনা করেন। ইঁহার সমসাময়িক কবি ইরিয়াম্মান থাম্পি তিনটি মনোজ্ঞ নাটক রচনা করেন। এইগুলি হইতেছে 'কীচক বধম্' 'দক্ষযজ্ঞম্', 'উত্তরা-স্বয়ম্বরম্'। ইঁহার সুযোগ্যা কন্যাও কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এইগুলির নাম হইতেছে 'শ্রীমতী স্বয়ম্বরম্', 'পার্বতী স্বয়ম্বরম্', 'মিত্রসাহা মোক্ষম্' ইত্যাদি। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা উথ্রাম থিরুমল কথাকলি নৃত্যের উন্নতির জন্য সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কথাকলি নৃত্যনাট্য মন্দির প্রাঙ্গণে অথবা কোন গৃহাঙ্গনের মুক্ত-স্থানে অভিনীত হইয়া থাকে। লতাপাতা ও ফুল দিয়া মণ্ডপটিকে সজ্জিত করা হয়। নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য কোন পৃথক মঞ্চ থাকে না। মণ্ডপের ভিতর একটি স্থান নির্দিষ্ট করা হয় এবং সেই স্থানে মাদুর বিছান হয়। ইহার উপর অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় এবং ইহার চারিপাশে উন্মুক্ত আকাশের নীচে দর্শকগণ আসন গ্রহণ করেন। অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্টস্থানে একটি মাত্র প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে। দিবা অবসানে

'চেণ্ডা' ও 'মদ্দলমের' গুরুগম্ভীর শব্দ গ্রামের দূর দূর প্রান্তে কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠানের বার্তা ঘোষণা করে। ইহাকে 'কেলিকুত্তু' বলা হয়। রাত্রি ৮-৩০ টার সময় গুরু গম্ভীর বাদ্যযন্ত্রের সহিত নৃত্যানুষ্ঠান সুরু হয়। নৃত্যানুষ্ঠানের প্রারম্ভে 'চেণ্ডা', 'মদ্দলম্' প্রভৃতি শুষ্কবাদ্যের অনুষ্ঠান হয়। ইহাকে 'শুদ্ধ মদ্দলম্' বলা হয়। ইহার পর দুইজন পুরুষ একটি ত্রিকোণা পর্দা লইয়া মঞ্চে উপস্থিত হন। এই পর্দাটি সাধারণতঃ ১২ ফুট দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রস্থ হইয়া থাকে। কাপড়টির উপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম অঙ্কিত থাকে এবং কাপড়টিও বিচিত্র রঙে রঞ্জিত থাকে। ইহাকে 'তিরশিলা' বলে। ইহার পশ্চাতে দুইজন নর্তক 'টোডয়ম্' নৃত্য করেন। 'টোডয়ম্' হইতেছে দেবতাদিগের প্রশস্তিমূলক নৃত্য। ইহাতে দেবতাদিগের বন্দনা করা হইয়া থাকে। ইহার পর 'পুরুপ্পাড' অনুষ্ঠিত হয়। 'পুরুপ্পাডের' অর্থ হইতেছে 'প্রবেশ বা প্রস্তাবনা। ইহাতে 'পচ্চা' চরিত্রগুলির দ্বারা 'নৃত্ত' প্রদর্শিত হয়। উত্তমচরিত্রগুলিই 'পচ্চা' নামে অভিহিত হয়। 'পুরুপ্পাড' অর্থাৎ প্রস্তাবনার দ্বারা নৃত্যনাট্যের আরম্ভ হয়। 'চেণ্ডা' 'মদ্দলম্' শঙ্খবাদ্য প্রভৃতির সহিত পর্দাটিকে অর্ধনমিত করা হয়। 'পচ্চা' চরিত্রের দুই পার্শ্বে দুইজন ময়ূরপঙ্খধারী ও দুইজন চামরধারী থাকেন। ইহার পর ভ্রূ, চক্ষু ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন আরম্ভ হয়। 'পুরুপ্পাডের' পর গীতগোবিন্দ হইতে যে গান করা হয় তাহাকে 'মঞ্জুথরা' বলা হয়। পরবর্তী অংশ 'মেলাপদমে' বাদকগণ তাঁহাদের চাতুর্য প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ 'মদ্দলমে' শুষ্কবাদ্য করা হয়। প্রথম দৃশ্যে সাধারণতঃ নায়ক-নায়িকার প্রেমের দৃশ্য থাকে। এই দৃশ্যে নায়ক-নায়িকার পরিচয় হয়।

কথাকলি নৃত্যনাট্যে নায়ক-প্রতিনায়কের চরিত্রগুলি তাহাদের চরিত্রগুণোচিত বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রকাশ পায়। অহঙ্কারে, গর্বে, ঐশ্বর্যে, মান-অভিমানে এই চরিত্রগুলি মহিমান্বিত হইয়া ওঠে। এইরূপে নিজের প্রতাপ প্রকাশ করাকে 'তিরনোক্কু' বলা হয়। কোন অঙ্গহার আরম্ভ হইবার পূর্বে 'মুখজ' অভিনয়ের প্রাধান্য থাকে।

যখন কোন বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করা হয়, তাহাকে 'নোক্কিকান্নুকা' বলা হয়। কথাকলি নৃত্যনাট্যে যুদ্ধের দৃশ্যটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়। যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে সমরায়োজনকে 'পডপুরপ্পড' বলা হয়। পরস্পর যুদ্ধে আহ্বান (challenge) করাকে 'পোরভিলি' বলা হয়। রক্তপাতের দৃশ্যকে 'নিনম্' বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ শূর্পণখার নাসিকা কর্তন, দুঃশাসনের রক্তপান ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কথাকলি নৃত্যনাট্যে প্রণয়ের দৃশ্যে লাস্যনৃত্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই লাস্য নৃত্যের অন্তর্গত হইতেছে 'সারি' ও 'কুমি'। উদ্যানে নায়ক নায়িকার প্রেমের দৃশ্য নৃত্যে অভিনীত হইলে তাহাকে 'সারি' নৃত্য বলে। নৃত্যনাট্যের ভিতর রাজদরবারেরও দৃশ্য থাকে। এই রাজদরবারে অনুষ্ঠিত নৃত্যকে 'কুমি' বলা হয়। ইহাতে রাজার যশোগান করা হয় এবং চার বা ততোধিক নর্তকী অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

'কলাস' শব্দটি সঙ্গীতরত্নাকরে পাওয়া যায়। ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। ইহার সহিত কথাকলির 'কলাসমে'র সামান্য প্রভেদ আছে। পদমের প্রত্যেকটি স্তবকের অন্তে বিভিন্ন ছন্দের তিহাইকে 'কলাসম্' বলা হয়। বিভিন্ন তালে নির্দিষ্ট সংখ্যার 'কলাসম্' থাকে। বিলম্বিত লয়ের সঙ্গে নৃত্যকে 'পতিঞ্জুআট্টম্' বলা হয়।

কথাকলি নৃত্যে দুইপ্রকার পদম্ গীত হয়—শৃঙ্গার পদম্ ও মুর্গীয় পদম্। শৃঙ্গার পদমে গান মধ্যলয়ে গীত হয় এবং মুর্গীয় পদমে গান দ্রুতলয়ে গীত হয়। পদাভিনয়ের তিনটি ভাগ থাকে—এলাকিয়াট্টম্, চুল্লিয়াট্টম্ ও কুডিয়াট্টম্।

এলাকিয়াট্টম্—ইহাতে কোন গীত থাকে না। শুধুমাত্র 'ঘন' বাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে হয়। ইহাতে শিল্পীর নৃত্যচাতুর্য প্রদর্শনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

চুল্লিয়াট্টম্—এই নৃত্যাংশে সঙ্গীতের প্রয়োগ থাকে।

কুডিয়াট্টম্—পদমের ভিতর দুইটি চরিত্রের কথোপকথন থাকিলে তাহাকে 'কুডিয়াট্টম্' বলে।

কথাকলি নৃত্যে দুইজন গায়ক থাকেন। যিনি মুখ্য গায়ক তাঁহাকে 'পন্থানি' বলা হয়। যিনি মুখ্য গায়ককে সহযোগিতা করেন তাঁহাকে 'সাংগরী' বলা হয়। ইঁহাদের সহিত বাদ্যযন্ত্রী থাকেন। ইঁহারা বৃহৎ গঙ, ঘণ্টা, চেণ্ডা, মৃদঙ্গ ও করতাল প্রভৃতি দ্বারা নৃত্যের সহযোগিতা করেন।

কথাকলি নৃত্যশিল্পীদিগের ভিতর বলি অথিক্কন নাম্বুদ্রী, কুঞ্জুকৃষ্ণ পানিক্কর, নলন্ উন্নি, বেচুর রমণ পিল্লাই, কাভালাপ্পারা নারায়ণ নায়ার, শঙ্করণ নাম্বুদ্রী প্রভৃতির নাম তাঁহাদের শিল্পচাতুর্যের সহিত অমর হইয়া আছে। যাঁহারা এখনও জীবদ্দশায় এই নৃত্যকলার সেবা করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে কুঞ্জু কুরূপ, রাবণি মেনন ও পান্নিকরের নাম উল্লেখযোগ্য শ্রীগোপীনাথের নামও স্মরণীয়। সাগরপারের শিল্পী রাগিণীদেবী এই নৃত্যকলায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া এই নৃত্যকলা শিক্ষা করেন। তিনি গোপীনাথের নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথাকলি নৃত্যশিল্পীদিগের ভিতর অনেকে বাংলাদেশে আসিয়া যশ অর্জন করিয়াছেন। ইঁহাদিগের ভিতর কেলু নায়ার, গোবিন্দম্ কুট্টী, বালকৃষ্ণ মেনন, শিবশঙ্করণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কথাকলি নৃত্যে মুদ্রার বহুল প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রায় চরিশত মুদ্রার প্রয়োগ আছে। সংযুত ও অসংযুত মুদ্রা প্রয়োগের সহিত মিশ্র মুদ্রার ব্যবহারও হইয়া থাকে। মিশ্র মুদ্রা দুই হস্তে করিতে হয়। কিন্তু দুই হস্তে একই প্রকার মুদ্রা ব্যবহৃত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। ইহাকে মিশ্র মুদ্রা বলা হয়। মুদ্রার অত্যধিক ব্যবহারে অনেক সময় কথাকলি নৃত্যের গতি রুদ্ধ হয়। যাঁহারা নৃত্যে মুদ্রার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নহেন, অথবা যাঁহারা মালয়ালম্ ভাষার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, তাঁহাদের নিকট এই মুদ্রার বহুল প্রয়োগে নৃত্য ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

লোকনৃত্য



সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত।
আগল দীঘল সামাল কইরা শক্তে বাইন্দো পাত

লোকনৃত্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কতপ্রকারের যে বর্ণাঢ্য লোকনৃত্য আছে তাহার হিসাব রাখা দুষ্কর। অধুনা ভারত সরকারের চেষ্টায় লোকনৃত্য পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতার পূর্বে লোকনৃত্য শহরের লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর হইতে জনসমাজে লোকনৃত্য সম্বন্ধে একটি চেতনাবোধ দেখা দিয়াছে, দেশীয় সংস্কৃতির উপর একটি মমত্ববোধ জাগিয়াছে, স্বদেশ ও স্বজাতিকে জানিবার ও চিনিবার একটি অদম্য স্পৃহাও জাগ্রত হইয়াছে। যাহার ফলে উত্তরের হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত জানা, অজানা সকল জাতি ভারতের বেদীতলে সংস্কৃতির অর্ঘ্য সাজাইয়া আনিয়াছে।

আদিম যুগে মানুষের আবির্ভাব হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। বিভিন্ন স্তরে সমাজের বিবর্ত্তন হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে সমাজ অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। সমাজের এই বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া লোকসংস্কৃতির প্রবাহ ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া জাতির জীবনতরুকে রসসিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। এই লোকসংস্কৃতি ফুলে ফলে পল্লবিত হইয়া সমাজের আর্থিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিক রীতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই, সামাজিক উৎসবে অথবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্য করিবার প্রথা রহিয়াছে। লোকনৃত্য একক নৃত্য নহে। ইহা সংহত সামাজিক নৃত্য। যখন গ্রামের দেবতা রুষ্ট হন, তখন সেই ক্রোধের ফল ব্যক্তিগত কাহারও উপর পড়িবার আশঙ্কা করা হয় না। তাহা সকল গ্রামবাসীর শঙ্কার কারণ হইয়া উঠে। দেবতা কোনো একজন বিশেষ গ্রামবাসীর নহেন; তিনি সকলের দেবতা। সেইজন্য লোকনৃত্যের কোন অনুষ্ঠান শুধু ব্যক্তিবিশেষের নহে। ইহাতে প্রত্যেকে যোগদান করিতে

পারেন। এই যোগদান পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে হইয়া থাকে। সকলে যদি নৃত্য-গীতে যোগদান করিতে নাও পারেন, তাহা হইলে সঙ্গদান করেন। এই সঙ্গদানের অর্থ হইতেছে নিজের আনন্দ অথবা বিষাদকে সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া। সেইজন্য শীতের শেষে ফসল কাটা শেষ হইলে বসন্তের সমাগমে, হোলী উৎসবে অথবা বর্ষার আবির্ভাবে সমবেত ভাবে নৃত্য-গীতের দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অনাবৃষ্টির সময়, দুর্ভিক্ষের সময়, মহামারীর সময় সমবেতভাবে নৃত্যগীতের দ্বারা দেবতাকে প্রার্থনা জানাইবার রীতিও আছে। সুতরাং লোকনৃত্যে কাহারও ব্যক্তিগত প্রতিভা প্রকাশের অবকাশ নাই। ইহাতে শিক্ষার আভিজাত্য নাই, নাট্যশাস্ত্রের চুলচেরা বিচার নাই, রঙ্গমঞ্চেরও প্রয়োজন হয় না। ইহা স্বাভাবিক আনন্দের স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ। ইহাতে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করিতে পারেন। যদিও ইহা শাস্ত্রীয় নৃত্যের জনক, তথাপি শাস্ত্র মানিবার কোন নিয়ম ইহাতে নাই। বিচ্ছিন্নকে একসূত্রে গাঁথিবার শক্তি ইহার প্রবল। এই লোকনৃত্যের জন্য বিশেষ শিক্ষার দরকার হয় না, বংশপরম্পরায় ইহা প্রচলিত হইয়া থাকে। মুখে মুখেই লোকগীতির প্রসার ঘটে।

লোকসংস্কৃতি নিজের ভিতর আবদ্ধ থাকে না। ইহা নদীর স্রোতের ন্যায় কূল ভাসাইয়া চলে। নিজের আবর্তের ভিতর সকল কিছু টানিয়া লয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মিশ্রিত সংস্কৃতি অনেক স্ফীত হইয়া ওঠে। কিন্তু যাহার স্রোত রুদ্ধ, তাহা ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।

লোকনৃত্য লৌকিক জীবনে ছন্দের স্পন্দন জাগায়। সেইজন্য শত দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্যের নিপীড়নেও জনসমাজে লোকনৃত্যের নির্মল আনন্দটুকু জাগিয়া রহিয়াছে।

লোকসংস্কৃতিতে পুরাতনের ভিতর নূতনের বিকাশ হইয়াছে। প্রান্তীয় উপজাতি ও আদিবাসিগণের সংস্কৃতির সহিত সভ্যতর সংস্কৃতির

মিলন হইয়াছে। এই মিলিত সংস্কৃতি হইতেছে লোকসংস্কৃতি। কিন্তু আদিবাসিগণের সংস্কৃতি আদি ও অকৃত্রিম রহিয়া গিয়াছে। কারণ ইহার ভিতর বাহিরের কোন সংস্কৃতি আসিয়া মিলিত হইতে পারে নাই। সুতরাং লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসিগণের সংস্কৃতির ভিতর অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও ব্যবধান রহিয়াছে।

লোকনৃত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—সামাজিক নৃত্য, ধর্মীয় নৃত্য ও সামরিক নৃত্য। বিবাহবাসরে ও আনন্দোৎসবে অনুষ্ঠিত নৃত্যাদিকে সামাজিক নৃত্য বলা হয়। ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল নৃত্য হয়, তাহাকে ধর্মীয় নৃত্য বলা হয়। বাংলার গাজন, বাউল প্রভৃতি নৃত্য এই শ্রেণীভুক্ত। লাঠিনৃত্য, তরবারিনৃত্য, ঢালনৃত্য প্রভৃতি সামরিক নৃত্যের অন্তর্গত।

সামরিক নৃত্যের উৎপত্তি জমিদার ও রাজা-মহারাজদিগের রাজত্বের সময় হইতে। পূর্বে রাজা ও জমিদারগণ নিজেদের রাজত্ব রক্ষা করিবার জন্য লাঠিয়াল অথবা অস্ত্রবিদ্‌গণকে অর্থ দিয়া পোষণ করিতেন। এই সকল লাঠিয়ালগণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া রাজত্ব রক্ষা করিত।

লড়াইয়ের পদ্ধতি আয়ত্তে আনিবার জন্য এবং দেহকে সুস্থ রাখিবার জন্য ইঁহারা নৃত্যের মাধ্যমে নানা প্রকার কসরৎ করিতেন ও অস্ত্র চালনা অভ্যাস করিতেন। সমবেতভাবে অভ্যাসের জন্য একটি ছন্দের প্রয়োজন হয়। এই ছন্দে সমতা রাখিবার জন্য বাদ্যের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ঢাক, ঢোল কাঁসর প্রভৃতি ব্যবহার হয়। রৌদ্ররস ও বীররস প্রকাশের জন্য মুখে নানাপ্রকার আওয়াজ করিবার প্রথাও আছে।

সামাজিক জীবনের সহিত ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাধাকৃষ্ণের কথা, শিবের কথা, মনসা দেবীর মাহাত্ম্য ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া রহিয়াছে। গ্রামের সীমানায় পূজামণ্ডপে ভাগবত পাঠ, কথকতা ও নৃত্য-গীতের আয়োজন দ্বারা গ্রাম্য দেবতার তুষ্টি করা হয়।

লোকনৃত্যের সৃষ্টি পল্লীর সামাজিক জীবনের স্বাভাবিক ভাবের উল্লাস হইতে। কিন্তু আদিবাসিগণের নৃত্যের ভিতর মানব প্রকৃতির নগ্নরূপ দেখা যায়। দুর্ধর্ষ পার্বত্যজাতিগণ শিকার ঘিরিয়া হাতে অস্ত্র লইয়া আদিম উল্লাসে নৃত্য করিত। এই নৃত্যের ভিতর সৌন্দর্য অপেক্ষা বন্যতাই অধিক প্রকাশ পাইত। সেইজন্য আদিবাসিগণের নৃত্যের ভিতর উদ্দামতা ও উন্মাদনা সমভাবে বিদ্যমান।

বাংলাদেশে পুরুষদিগের লোকনৃত্যের ভিতর একটি বলিষ্ঠ ও দৃঢ় ভাব আছে। নৃত্যের ভিতর শরীরের উপরের অংশের বলিষ্ঠ প্রয়োগ হইয়া থাকে। বাদ্যযন্ত্রের ভিতর বিশেষ করিয়া ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি থাকে। কখনও কখনও বেণুরও ব্যবহার হইয়া থাকে। স্ত্রীগণের নৃত্যে শরীরের নিম্নাংশ বেশী আন্দোলিত হইয়া থাকে।

বাংলা লোকনৃত্যের ভিতর উল্লেখযোগ্য হইতেছে রাইবেশে, ঢালী, কাঠি, ভাদু, জারি, ভাজো, ঘাটু, ঘাটওলানো, মনসা-ভাসান, ব্রতচারী ইত্যাদি।

'রাইবেশে' নৃত্য সাধারণতঃ বীরভূম জেলার রাজনগর এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে 'ভল্ল' জাতির মধ্যে প্রচলিত। 'ভল্ল' শব্দটির অর্থ হইতেছে বল্লম জাতীয় অস্ত্র। পুরাকালে সৈন্যদিগকে 'রাইবেঁশে' বলা হইত। 'রাইবেশে' নৃত্যকে সামরিক নৃত্যের অন্তর্গত বলা যায়। রাইবেঁশে সৈন্যগণ সাধারণতঃ নিম্ন ও নিপীড়িত শ্রেণী হইতে আসিতেন। ইঁহারাই এই নৃত্য করিতেন। ইহাতে মুখে হাত দিয়া আওয়াজ করিতে করিতে নর্তকগণ লাফ দিতে দিতে রঙ্গ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। ঢাকের তালে তালে কাঁধ ও বক্ষঃস্থল ঝাঁকি দিতে দিতে তাঁহারা নৃত্য সুরু করেন। ক্রমশঃ নৃত্যের সহিত নানাপ্রকার লম্ফ ও কসরৎ সুরু হয়। নৃত্যের শেষে শুধুই নানাপ্রকার কসরৎ প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

ঢালী—'ঢালী' শব্দটি হইতে বোঝা যায় যে ইহা সামরিক নৃত্য। ঢাল সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয় এবং যাঁহারা এই ঢাল ব্যবহার

করেন তাঁহাদিগকে 'ঢালী' বলা হয়। বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্য বাহান্ন হাজার ঢালী সৈন্য রাখিয়াছিলেন। ঢালী সৈন্য সকল বর্ণ হইতে সংগ্রহ করা হইত। এমন কি ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতেও সংগ্রহ করা হইত। ঢালী নর্তকগণ কখনই প্রকৃত ঢাল ব্যবহার করেন না। সাধারণতঃ বাঁশ অথবা বেতের ঢাল ব্যবহার করেন। ইহার ব্যাস ৮ হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। ইঁহারা উঁচু করিয়া মালকোচা মারিয়া কাপড় পরেন। দেহের উপরের অংশ নগ্ন থাকে। ইঁহারা এক পায়ে ঘুঙুর পরেন। সাধারণতঃ মহরম্ অথবা বিবাহোৎসবে 'ঢালী' নৃত্য হইয়া থাকে। ঢালীদিগের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান অথবা নমঃশূদ্র। প্রথমে নর্তকদলের প্রধান নৃত্যবাসরের মধ্যস্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হন এবং গোড়ালীর উপর দাঁড়াইয়া সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়া যান। ইহার পর বাম হাতে মাটি লইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। মন্ত্র উচ্চারণের উদ্দেশ্য হইতেছে যে, মা ধরিত্রী যেন তাঁহাদিগকে শত্রুপক্ষ হইতে রক্ষা করেন। ইহার পর 'প্রধান' অন্যান্য সভ্যদিগের জন্য অপেক্ষা করেন। অন্যান্য সভ্যগণ একের পর এক শ্রেণীবদ্ধভাবে হাতে ঢাল ও লাঠি লইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেন। 'প্রধান' ইঁহাদের সকলের কপালে মন্ত্রপূত মাটি দিয়া জয়-টীকা আঁকিয়া দেন। ইঁহারা নৃত্য আরম্ভ করিবার পূর্বে সমগ্র রঙ্গভূমিটি পরিক্রমণ করেন। এক একটি কোণ যখন অতিক্রম করেন তখন মাথার উপর লাঠি ঘুরাইয়া দিক্‌পালদের প্রণাম জানান। মঙ্গলাচরণ সমাধা হইবার পর 'ই-ই-ই-ই' শব্দ করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া গোলাকারে দণ্ডায়মান হন এবং ঢাল ও কাঠি ভূমিতে রাখিয়া ডান হাঁটু ভূমিতে স্পর্শ করিয়া বাম পা পিছনদিকে সোজা করিয়া এবং বাম হাত পিঠের উপর রাখিয়া মুখে শব্দ করেন। দ্বিতীয়বারে পা এবং দিক পরিবর্তন করিয়া পুনরায় এইরূপ করেন। ইহার পর দাঁড়াইয়া নৃত্যের সহিত নানাপ্রকার ব্যায়াম করেন। ব্যায়ামের পর দুই সারিতে পরস্পর সম্মুখীন অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধের কৌশলাদি প্রদর্শন করেন। শেষ অংশে তাণ্ডব নৃত্যের মাধ্যমে

ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের শেষে রঙ্গভূমি দৌড়াইয়া অতিক্রম করিয়া নর্তকগণ বিদায় লন।

কাঠি—সাধারণতঃ বেহারা ও বাগদী শ্রেণীভুক্ত নর্তকগণ ইহা করিয়া থাকেন। ইঁহারা মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া নগ্ন দেহে এই নৃত্য করেন। এই নৃত্যে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে মাদল ব্যবহৃত হয়। দেড়হাত লম্বা লাঠি লইয়া ৪ হইতে ৮ জন নর্তক বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হইয়া গানের সহিত নৃত্য সুরু করেন। ইঁহারা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত গতিতে বৃত্তাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে অবস্থিত জুড়িদের লাঠিতে লাঠির আঘাত করেন। সঙ্গীতও ক্রমশঃ ক্রমশঃ দ্রুততর হইতে থাকে। কাঠি লইয়া নৃত্য করা হয় বলিয়া ইহাকে 'কাঠি' নৃত্য বলা হয়।

জারি :—পূর্ব মৈমনসিংহের 'জারি' নৃত্য বীর ও করুণ রসের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। ইহা নৃত্যসম্বলিত সঙ্গীত। ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্ত। একজন মূল গায়েনের অধীনে ২৫ হইতে ৩০ জন নর্তক পায়ে নূপুর পরিয়া হাতে রঙ্গিন রুমাল লইয়া সারিবদ্ধভাবে গোলাকারে বৃত্তের ভিতর নাচিতে থাকেন। মূল গায়েন সকলকে সেলাম ও প্রণাম জানাইয়া গান সুরু করেন।

"সভা কইর‍্যা বইস ভাইরে
হিন্দু মুসলমান
বন্দনা সারিরা আমি গাইমু
জারির গান।"

ইহার পর জারি গান সুরু হয়। নর্তক হাতের রুমাল দোলাইয়া ঘুঙুরের আওয়াজ করিয়া তাল রাখেন ও মধ্যে মধ্যে ধুয়া ধরেন, "সাবাস ভাই, সাবাস, বেশ ভাই বেশ।" মূল গায়েন বলেন—"চুপ কর ভাই সকলে,—সবুর।" এইভাবে নৃত্যের সহিত জারি গান গাহিয়া কারবালার করুণ রসাত্মক কাহিনী বর্ণনা করা হয়।

সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণ মহরমের সময় জারি গানের সহিত 'জারি' নৃত্য করিয়া থাকেন।

ঝুমুর :—মানভূম জেলায় ঝুমুর গানের সহিত নৃত্যের বেশী প্রচলন আছে।

তেরা তালি :—'তেরা তালি' নৃত্য খুব চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। ইহাতে দুই হইতে তিনজন স্ত্রীলোক শরীরের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরা বাঁধেন। মুখমণ্ডল ওড়নাতে আবৃত থাকে এবং নর্ত্তকী দাঁত দিয়া তরবারি ধরিয়া থাকেন। মাথার উপর একটি ঘড়া থাকে। গানের তালের সহিত তাল রক্ষা করিয়া শরারের বিভিন্নস্থানে মঞ্জিরা বাজাইয়া ইঁহারা নৃত্য করেন।

কাচ্চি ঘোড়ী :—বাঁশ ও কাগজের ঘোড়া নির্মাণ করিয়া তাহার ভিতর ঢুকিয়া তাসা ও ঢোলকের সহিত নর্তকগণ নৃত্য করেন। উত্তর ও দক্ষিণভারতে এই প্রকার নৃত্যের প্রচলন আছে।

রাজস্থানের বালুকাময় মরুপ্রান্তরে আরবী সুরে উটওয়ালার গীত অথবা গ্রাম্যবালিকাদিগের পূর্ণিমারাত্রে গ্রামের প্রান্তরে কুয়া হইতে জল আনিবার সময় নৃত্য ও গীত বিশেষ মনোমুগ্ধকর।

গুজরাটের লোকনৃত্যের ভিতর 'গরবা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত 'গরবা,' 'রাস' প্রভৃতির নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গরবা :—'গরবা' নৃত্য নবরাত্রির সময় 'অম্বা' মাতার সম্মুখে করা হয়। 'অম্বা' মাতা হইতেছেন শক্তির আধার। রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে শক্তির প্রতীক হিসাবে মঙ্গলদীপ রাখা হয়। মঙ্গলদীপটিকে ঘিরিয়া নারীগণ নৃত্য করেন। অনেক সময় ঘড়ার ভিতর মঙ্গলদীপটিকে স্থাপন করিয়া মাথায় লইয়া নৃত্য করাও হয়। কলস অথবা কাঠি না লইলে হাতে তালি দিয়া নৃত্য করার প্রথা আছে। একতালি, দুইতালি হিসাবে তালের বিভাগ করিয়া এই নৃত্য করা হয়। ইহাতে সকল বয়স্কা নারীগণই অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

গরবী :—'গরবী' নৃত্যে পুরুষগণ অংশ গ্রহণ করেন। মাতা 'অম্বার' প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া নবরাত্রিতে এই নৃত্য করা হয়। 'অম্বার' একটি প্রতিকৃতির সম্মুখে একটি প্রজ্বলিত প্রদীপ রাখিয়া নৃত্য করিতে হয়। 'গরবী' নৃত্যের যদিও নিজস্ব গীত আছে তথাপি 'গরবা' নৃত্যের বহু গীত ইহাতে ব্যবহৃত হয়। পুরুষগণ শুধুমাত্র ধুতি পরেন, অনেক সময় জামাও পরেন।

দক্ষিণভারতেও নানাপ্রকার লোকনৃত্যের প্রচলন আছে।

কোলকালি :—কেরালার মুসলমানদিগের ভিতর এই নৃত্য প্রচলিত আছে। যদিও মুসলমানগণ এই নৃত্য করেন, তথাপি ইহার গান হিন্দু দেবদেবাকে লইয়া রচিত। নৃত্যমণ্ডপে একটি প্রদীপ রাখা হয়। প্রদীপের চারিপার্শ্বে নর্তকগণ বৃত্তাকারে বসিয়া থাকেন এবং লাঠিগুলি মাটি স্পর্শ করিয়া থাকে। গানের সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের লাঠির সহিত লাঠি বাজাইতে থাকেন এবং ক্রমশঃ উঠিয়া দাঁড়ান। তাহার পর নাচিতে সুরু করেন। ক্রমশঃ ক্রমশঃ ইহার ছন্দ দ্রুততর হইতে থাকে। এক একটি নৃত্যের পর প্রদীপের নীচে নর্তকগণ প্রণতি জানান।

ভেলাকালি :—ইহা কেরালার সামরিক নৃত্য এবং কেবলমাত্র নায়ারগণই এই নৃত্য করিয়া থাকেন। ত্রিবাঙ্কুরের পদ্মনাভস্বামীর মন্দিরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এই নৃত্য করা হয়। এই নৃত্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দৃশ্য প্রদর্শিত হয়। নর্তকগণ কুরুদিগের ভূমিকা অভিনয় করেন। কাষ্ঠের দ্বারা পাণ্ডবদিগের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া মন্দিরে রাস্তার ধারে পুতিয়া রাখা হয়। ড্রাম ও ভেরীবাদ্যের সহিত যুদ্ধঘোষণা করা হয়। প্রত্যেক নর্তক-যোদ্ধার বাম হাতে একটি ঢাল এবং ডান হাতে একটি লাঠি থাকে। সাদা লুঙ্গির উপর একটি লাল রঙের কাপড়ের টুকরা বাঁধা থাকে এবং মাথায় লাল পাগড়ী থাকে। এই নৃত্যে যুদ্ধের নানাপ্রকার কৌশল প্রদর্শিত হয় এবং পরিশেষে ইহার গতি দ্রুততর হয়। কুরুদিগের পলায়ন পর্ব দেখাইয়া নৃত্য শেষ হয়।

থেরায়ট্টম্ :—মালাবারে ভগবতী পূজার সময় এই নৃত্য করিতে দেখা যায়। শক্তিরূপী কালী অথবা ভগবতীর অনুচরদিগের সাজ পরিয়া নর্তকগণ জনসাধারণের সম্মুখে নৃত্য করেন। নর্তকগণ সাজ-পোষাক পরিয়া গ্রামের পূজাবেদী পরিক্রমণ করেন। ইহার পর তাঁহারা যূপকাষ্ঠের সম্মুখে আসিলে ভক্তগণ তাঁহাদের নিকট মুরগী প্রভৃতি পূজার বলি নিবেদন করেন। একটি ছুরিকার সাহায্যে বলির গলাটি কাটিয়া ফেলিয়া দেহটি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। নৃত্যের সহিত ইহা করা হইয়া থাকে। ইহার ভিতর কোন নৃত্যচাতুর্য নাই। সহজ সরল ছন্দের গতিতে সরল পদ বিক্ষেপের সহিত ইহা করা হয়। ইহা ব্যতীত বহু প্রকারের নৃত্য আছে—'তিয়াত্তম,' 'পারায়ণ কেলি,' 'কেনিয়ার কেলি' ইত্যাদি।

ডাপ্পু :—অন্ধ্রপ্রদেশের 'ডাপ্পু' নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিজনগণ ঢোলকবাদ্যের সহিত এই নৃত্য করেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া ঢোলক ও কাঠি থাকে। নর্তকগণ ঢোলক বাজাইতে বাজাইতে কখনও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া কখনও দুলিতে দুলিতে পাশে যাইয়া নৃত্য করেন।

মাথুরী :—আদিলাবাদ জেলায় এই নৃত্যের প্রচলন আছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এই নৃত্য করেন। পুরুষগণ ঢোল বাজাইতে থাকেন এবং নর্তকীগণ হাতে তালি দিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে থাকেন। স্ত্রী নর্তকীগণের পোষাক বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। ইঁহারা রঙ্গিন ঘাগরা ও ওড়না ব্যবহার করেন। গহনার ভিতর কদমফুলের ন্যায় কাপড়ের তৈয়ারী বালা পড়েন। পুরুষগণ ধুতি, ফ্রককোট ও পাগড়ী ব্যবহার করেন।

কুম্মি নৃত্য:—ইহাতে বালিকা ও স্ত্রীগণই অংশ গ্রহণ করেন। বালিকাগণ 'কুম্মি' গানের সহিত হাতে তাল দিয়া বৃত্তাকারে নাচে।

লোকনৃত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্বত্রই একই মত পোষণ করা হয়। শুধু মতেরই ঐক্য নহে, নৃত্যের ভিতরও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ তরবারি নৃত্যের কথা বলা যাইতে পারে। তরবারি নৃত্য, কাঠি নৃত্য, রুমাল নৃত্য পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে। বসন্তকালে ইংলণ্ডে তরবারি নৃত্য হয়। একটি উৎসর্গীকৃত বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া নর্তকগণ বৃক্ষটিকে স্পর্শ করেন। তাঁহাদের ধারণা যে-শক্তিতে বৃক্ষে ফুল ফুটিতেছে সেই শক্তি তাঁহাদের ভিতরও প্রবেশ করিবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এখনও 'মেপোল' নৃত্য করা হয়; যদিও তাহা একটি অর্থহীন প্রথায় পর্যবসিত হইয়াছে। 'মে' দিবসে তরবারি নৃত্যে নর্তকগণ এক একটি তরবারি ধারণ করেন। একজন নিজের তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা অন্যজনের তরবারির অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া থাকেন। ইহার পর নানাপ্রকার কসরৎ সুরু হয়। পরিশেষে সকলে বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হন। একজনের তরবারির উপর অন্যজন তরবারি ন্যস্ত করেন এবং এইরূপে তরবারিগুলি দ্বারা একটি তারার আকৃতি হয়। ইহার নীচে একজন হাঁটু ভাঙ্গিয়া মাথা পাতিয়া বসেন। তাঁহাকে মনে করা হয় উৎসর্গীকৃত বলি। তাঁহার মাথায় ও ঘাড়ে তরবারির বন্ধনটি পড়ে এবং তিনি ঢলিয়া পড়িয়া মৃতের অভিনয় করেন।

পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপে শৌর্য, বীর্য প্রকাশের জন্য তরবারি ও লাঠির সাহায্যে নৃত্য করা হইয়া থাকে। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশের নর্তকগণই হাতে রুমাল লইয়া নৃত্য করেন। রুশ, ভারতবর্ষ, ইরাণ প্রভৃতি দেশে এবং পাশ্চাত্য দেশেও হাতে রুমাল লইয়া তরুণগণ নৃত্যের ভিতর দিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। এইরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশের লোকনৃত্যের ভিতর একটি পারস্পরিক যোগসূত্র রহিয়াছে যাহা সকল জাতি ও দেশকেই একসূত্রে গাঁথিতে পারে।

আধুনিক নৃত্যধারা



আধুনিক নৃত্যধারা

নৃত্যের আধুনিক যুগ বলিতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কাল পর্যন্ত নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই একশত বৎসরে কথক, কথাকলি, ভরতনাট্যম্ ও মণিপুরী নৃত্যের প্রভৃত সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের আধুনিক নৃত্যের পর্যায়ে গণ্য করা হয় না। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইহাদের সংস্কার সাধন করা হইলেও ইহার মূল নিহিত আছে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যে।

আধুনিক নৃত্য অথবা প্রাচ্য নৃত্যের উদ্ভব হইয়াছে বাংলাদেশেই। আধুনিক, প্রাচ্য অথবা রাবীন্দ্রিক পদ্ধতির পূর্বে বাংলাদেশে কী প্রকার নৃত্যের প্রচলন ছিল এবং মার্গনৃত্যের প্রচলন বাংলাদেশে কোনকালে ছিল কি না, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশ আর্য-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল না। বেদের সংহিতাভাগেও বাংলাদেশের নাম নাই। বাংলাদেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে—

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সুরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

বৈদিককালের পর অঙ্গদেশে আর্যগণের আগমন হয়। আর্যগণের পূর্বে বঙ্গ, রাঢ় ও সুহ্ম প্রভৃতি জাতি আর্যেতর ছিল। ইহার পর আর্যসভ্যতা পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রভূমিতে প্রসার লাভ করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্র, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি ব্রাত্য বা অন্ত্যজ জাতিদিগের সহিত পুণ্ড্রদিগের উল্লেখও করা হইয়াছে।

মৌর্যযুগের আরম্ভে আর্যগণ বঙ্গে ব্যাপকভাবে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তবে বরেন্দ্রভূমি ও রাঢ় অঞ্চলে যাঁহারা বসতি স্থাপন করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই জৈন ছিলেন। বঙ্গের পূর্বপ্রান্তে অনার্যজাতির প্রভাব বেশী ছিল এবং এই দেশটি দুর্গম ছিল বলিয়া এই অঞ্চলে আর্যপ্রভাব বহুদিন প্রতিহত ছিল। বরেন্দ্র ও রাঢ় অঞ্চলে জৈনদিগের পর বৌদ্ধগণের আধিপত্য বিস্তৃতি লাভ করে। ৪৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৪৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাহাড়পুরের স্তূপ নির্মিত হয়। এই স্তূপে সঙ্গীতরতা নারী ও নরদিগের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। জৈন ও বৌদ্ধদিগের ভিতর সঙ্গীতের চর্চা কিরূপ প্রবল ছিল তাহা 'নৃত্যের ইতিহাস' অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধমতাবলম্বী 'পাল' রাজবংশ বাংলায় রাজত্ব করিয়া ইহাকে আর্যভূমিতে পরিণত করেন পালগণ অষ্টম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজবংশ ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। পালগণের সময় হইতে বাংলাদেশে অনার্য সংস্কৃতির পরিবর্তে আর্য সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার আর্যভাষা প্রভৃতি প্রবর্তিত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে বাংলা সংস্কৃতির সূচনা হইল। যাহাই হউক, আর্য সংস্কৃতির সহিত আর্য সঙ্গীতেরও প্রচলন হইল। আর্য সঙ্গীতের ভিতর মার্গসঙ্গীতই আর্যগণের প্রিয় ছিল। সেইজন্য অবশ্যম্ভাবীরূপে মার্গ-সঙ্গীতেরও প্রসার হইল। সুতরাং কিছুকালের জন্য বাংলাদেশে যে মার্গসঙ্গীতের প্রাবল্য ছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। রাজতরঙ্গিনীতে আছে যে, ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি ছদ্মবেশে যখন নগরে প্রবেশ করেন, তখন কার্তিকেয় মন্দিরে দেবনর্তকী কমলার নৃত্যনৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশেও এককালে দেবদাসীপ্রথা ও দেবদাসীনৃত্যের প্রচলন ছিল। বৃত্তি হিসাবে হয় ত প্রভেদ ছিল।

বাংলা সংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় 'সেন' রাজত্বকালে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে কবি জয়দেবের আবির্ভাব হয়। জয়দেব নীলাচলে পদ্মাবতী নামক এক নৃত্যকুশলা দেবদাসীকে বিবাহ করেন। কথিত আছে যে, পদ্মাবতী সঙ্গীতে নিপুণা এবং দেবদাসীগণের মার্গ নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে উমাপতি ধর, ধোয়ী প্রভৃতি কবিগণ বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেন। 'পবনদূত' রচয়িতা ধোয়ীর কাব্যে নৃত্যকুশলা গন্ধর্বকন্যার নৃত্যের খ্যাতির উল্লেখ ছিল এবং তিনি লক্ষ্মণসেনের প্রতি আসক্ত ছিলেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস সঙ্কলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃতে'ও নৃত্যের উল্লেখ আছে। রাজা লক্ষ্মণ সঙ্গীতপ্রিয় এবং স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার পূর্বপুরুষগণ কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং সঙ্গীতপ্রিয়তা ইঁহাদের জন্মগত ছিল। এই সময় নট গাঙ্গোকের উল্লেখও আছে। সঙ্গীত, কাব্য প্রভৃতি আর্যভাষা সংস্কৃতে রচিত হইত। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, একসময়ে বাংলাদেশে মার্গসঙ্গীতের প্রচলন ছিল। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আর্যসংস্কৃতির সহিত সমান্তরাল ভাবে অনার্য-সংস্কৃতিও প্রসার লাভ করিয়াছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তে বাংলাদেশে তুর্কীদিগের আগমন হয়। ইহার পর বাংলাদেশে কিছুকাল অরাজকতা চলে। এই সময় মুসলমানগণ বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রবল আঘাত করিলেন। ধর্ম বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। যে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন বহু পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা এই বিষম বিপদকালে পূর্ণতা লাভ করিল। এই মিশ্রিত সংস্কৃতিকে আর্য অথবা অনার্য সংস্কৃতি বলা চলে না। তাহা হইতেছে আর্য-অনার্য-মিশ্রিত বাংলা সংস্কৃতি। বাংলা সংস্কৃতির যুগে 'ইলিয়াস্ শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইঁহাদের সময় হইতে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে শিল্প ও জ্ঞানের চর্চা সুরু হয়। বাংলার স্বনামখ্যাত রাজা ও তাঁহার বিধর্মী পুত্র জালালুদ্দীন বিদ্যোৎসাহী ও কলারসিক ছিলেন। ইঁহার সময় কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে নৃত্যগীতের

উল্লেখ আছে। তাঁহার রাজত্বকালে অর্থাৎ চতুর্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর ভিতর চর্যাপদগুলির সৃষ্টি হয়। এইগুলি বিশেষ বিশেষ রাগ রাগিণীর সহিত গীত হইত। এই চর্যাপদগুলির ভিতর নৃত্যের উল্লেখও আছে। কিন্তু এই সকল নৃত্য-গীত অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিতর প্রচলিত ছিল না।

মুসলমানদিগের আগমনে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম নির্মূল হইল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব কমিল বটে, কিন্তু বৌদ্ধ, আর্য ও অনার্য দেবতাগণ এক হইয়া গেলেন। এই সময় যে সকল গীতধর্মী বা নাট্যধর্মী কাব্য রচিত হইতে লাগিল, তাহা 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত হইল। 'মঙ্গলকাব্য' অর্থাৎ মনসা, চণ্ডী প্রভৃতির কাহিনী নৃত্য ও গীতের সহিত অভিনীত হইতে লাগিল। গ্রামবাসীদিগের নিকট ইহা অতি সমাদরে গৃহীত হইতে লাগিল। এই সকল নৃত্যে ও গীতে শাস্ত্রীয় অনুশাসন ছিল না। বরং ইহা আঞ্চলিক অনার্য সঙ্গীত অথবা লোক সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়াছিল। এই সকল কাব্যে বা কাহিনীতে অনার্য দেবতাগণ কখনও বাহন হইয়া মানুষের অনিষ্টকারী হইয়াছেন, কখনও বা আর্যদেবতাগণও অনার্যদেবতাদিগের ন্যায় রুদ্ররূপ ধরিয়া মানুষের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটাইয়াছেন। অবশেষে নানারূপ প্রতিকূলতার ভিতর দিয়া নিজেদের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং অনার্যপ্রভাব যে পড়িয়াছিল তাহা বুঝাই যায়! এই সকল মঙ্গলকাব্যগুলি কোন পুরাণ হইতে লওয়া হইত না। বরং এইগুলিকে আর্যেতর অপৌরাণিক কাহিনীভুক্ত করা যায়। •

ইহার পর হোসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। এই সময় বাংলার কৃষ্টি কিরূপ ছিল তাহা শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেনের উক্তিটি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—'রামায়ণ কাহিনী, মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরির পাঁচালী এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা কাহিনী নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে গীত হইত। কালীয়দমন গীত, শিবের গীত, দুর্গা ও লক্ষ্মীর গীত

প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে আনন্দের যোগান দিত।" সুতরাং দেখা যায়, এই ব্রতকথা, উপকথাগুলিই গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে প্রচার করা হইত। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবে সংস্কৃতির ধারা পরিবর্তিত হইল। বৈষ্ণব সাহিত্যের সমাদর বৃদ্ধি পাইল। সাহিত্যে, নৃত্যে ও গীতে একটি উচ্চস্তরের ভক্তিরসের ভাবধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কীর্তনের সহিত ভাবোন্মাদে নৃত্য করা হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভুর এই জাতীয় নৃত্যের বর্ণনা আছে।

১৫৫০ খৃষ্টাব্দকে 'কৃষ্ণকীর্তনের' রচনাকাল বলিয়া অনুমান করা হয়। 'কৃষ্ণকীর্তন' বাংলার একটি নিজস্ব নাট্যগীতি। নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে ইহা চিরকালই বাঙ্গালীর অন্তর জয় করিয়াছে। ইহার পর 'ঢপ্' কীর্তনের প্রবর্তন হয়। 'ঢপ্' কীর্তনে গীতের সহিত আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হয়।

মহাপ্রভুর সময় হইতেই শিক্ষিত সমাজে 'মঙ্গল' প্রভাব অর্থাৎ অনার্যপ্রভাব কমিতে লাগিল। কিন্তু গ্রামের নিম্নসম্প্রদায়ের ভিতর ইহার প্রভাব বিশেষ কমিল না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত অশিক্ষিত গ্রামবাসীদিগের ভিতর দেহতত্ত্ব ও মনঃশিক্ষামূলক বাউল গানের প্রচলন হইল। বাউলগণ গানের সহিত পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া মাঠে ঘাটে নাচিয়া নাচিয়া গ্রামবাসীদিগের মনোরঞ্জন করিতেন। সুতরাং বাংলাদেশ মার্গ নৃত্যের পীঠভূমি বলিয়া দাবী করিতে পারে না বটে, কিন্তু লোক সংস্কৃতিতে বাংলা গৌরবান্বিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলাদেশে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সমান্তরালভাবে আদিরসাত্মক সঙ্গীতের আবির্ভাব হইল। 'ঝুমুর' 'খেমটা' 'আখড়াই' প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। সাধারণতঃ গ্রামের পেশাদারী নর্তকীগণ এই সকল নাচ নাচিত। পরবর্তীকালে কীর্তন হইতে 'পাঁচালী' গানের উদ্ভব হইল। ইহাতে একজন পাত্র সাজসজ্জা করিয়া গীত সহযোগে নৃত্য করিয়া গীতের ভাবার্থ ব্যক্ত করিতেন। এই 'পাঁচালী' হইতেই 'যাত্রা' গানের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাত্রায় একাধিক পাত্র

অংশ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে হাস্যরসের অবতারণার জন্য নারদের ভূমিকাও থাকিত। পরবর্তীকালে যাত্রায় নৃত্যের সংযোজন হইয়াছিল। এই নৃত্যগুলি উচ্চশ্রেণীর ছিল না। প্রথমে তালের উপর প্রাধান্য দিয়া তবলার সঙ্গতে কিছুক্ষণ নৃত্য হইত। এই নৃত্যের পর সখীগণ গীতের সহিত ভাব ব্যক্ত করিত। ইহাতে শাস্ত্রীয় রীতির প্রয়োগ ছিল না। বরং ঝুমুর, খেমটা প্রভৃতি নৃত্যের কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল। ইহার পর সখের যাত্রার উদ্ভব হইল। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সহরবাসীর নিকট ইহা সমাদর পাইল না। ধনী জমিদার গৃহে সঙ্গীতের আয়োজনে বাংলার বাহির হইতে হিন্দীভাষী বাঈজীদিগের আবির্ভাব হইতে লাগিল। ইহার ফলে শিক্ষিত সমাজ হইতে নৃত্য অন্তর্হিত হইল এবং নৃত্য সম্বন্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণা মানুষের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। বিকল্প হিসাবে শিক্ষিত সমাজে থিয়েটারের উদ্ভব হইল। প্রথমে ইহা মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ধনী সম্প্রদায়ের ভিতর আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ন্যাশন্যাল্ থিয়েটারের সহিত জনগণের সম্পর্ক স্থাপিত হইলে ইহা ব্যাপকতা লাভ করে। থিয়েটারের ভিতরও যাত্রার অনুকরণে সখীদের নৃত্য অথবা দেববালাদিগের নৃত্য থাকিত। এই সময় বিখ্যাত নাট্যকার স্বর্গত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নৃত্যধর্মী 'আলিবাবা' নাটকটি রচনা করেন। নৃত্যগীতবহুল এই নাটকটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। অবশ্য বর্তমান যুগের বিচারে এই নাটকটির নৃত্য ও গাত উচ্চস্তরের ছিল না। কিন্তু সেই সময় ইহার চটকদার নৃত্য ও গীত দর্শকের হৃদয় হরণ করিয়াছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার নৃত্যের ইতিহাসে আর একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। নৃত্যের যখন এইরূপ অবহেলিত ও অসম্মানজনক অবস্থা, তখন পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া ইহাকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকার গণের ব্যাকরণগত বিধিনিষেধের অর্গল ভাঙ্গিলেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রবর্তিত আত্মিক ভাবধারার সহিত নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর

সামঞ্জস্য করিয়া নৃত্যে অভিনব রূপদান করিলেন। তাই তাঁহার কণ্ঠে গীত হইল—

"নৃত্যের তালে তালে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে
সুপ্তি ভাঙাও চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে।"

বর্ষামঙ্গল উৎসবে তাঁহার স্বরচিত গানগুলির সহিত নৃত্যের সংযোজন হইল। ইহাই নৃত্যের মাধ্যমে উন্নততর ভাব প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা। ইহার পর 'নটীর পূজায়' নৃত্যের ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গী আরও সহজ ও স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। প্রতিমা দেবীর ভাষায় বলি—"সহজ ও স্নিগ্ধ তার গতি।" নৃত্যকে আরও উন্নততর করিবার প্রচেষ্টা তখনও চলিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যে ব্যাকরণের শৃঙ্খল ভাঙিয়া তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিলেন। যে দেশে যাহা দেখিয়া তাঁহার সুন্দর লাগিয়াছে, তিনি তাহাই সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়াছেন। ঋতুরঙ্গে তিনি যবদেশীয় নৃত্যপদ্ধতির প্রয়োগ ও পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য মণিপুরী নৃত্যের আধারে ও আঙ্গিকে রচিত হইয়াছিল। মণিপুরী নৃত্যের উপর বাংলার যে প্রভাব রহিয়াছে তাহা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সেই জন্য বোধহয় কবিগুরু এই মৃদু, কোমল ও ললিত অঙ্গভঙ্গীযুক্ত মণিপুরী নৃত্যকেই বিশেষ পছন্দ করিয়াছিলেন। মণিপুরী নৃত্যের অনুকরণে রাবীন্দ্রিক নৃত্যে 'মুখজ' অভিনয় অপেক্ষা দেহরেখা ও ছন্দের উপর অধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণভারতের কথাকলি নৃত্যের আঙ্গিক ও তালের ছন্দকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কথাকলি নৃত্যের মুদ্রার বাহুল্যকে তিনি বর্জন করিয়াছিলেন। এই দুই পদ্ধতির নৃত্যই লোকনৃত্যের ভিত্তিতে রচিত। মনে হয়, সেইজন্য এই দুইটি নৃত্যপদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভরতনাট্যম্ ও কথককে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিমা দেবী বলিয়াছেন—"চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে আমরা একটি জিনিষ পুরাতন প্রথা অনুযায়ী গ্রহণ করিনি, সেটি হচ্ছে দক্ষিনী ও উত্তরভারতীয় ঘাড় ও

চোখের খেলা।" তাঁহার মতে "পুরাকালে যখন আরবী ও পারশী প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতের উপর ছায়াপাত করেছিল সেই সময় নাচের এই চোখ ও ঘাড় নাড়ার ভঙ্গাও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমাদের নৃত্যে এসে পড়েছিল, সেইজন্য অন্য কোন এদেশীয় লোকনৃত্যে এই ভঙ্গীগুলি চোখে পড়ে বলে জানি না।" কিন্তু এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইতে দ্বিধা হয়। কারণ ১ম খৃষ্টাব্দ হইতে রচিত যতগুলি নাট্যশাস্ত্রের কথা জানা গিয়াছে, তাহাতে আঙ্গিক অভিনয়ের ভিতর গ্রীবাভেদ, অক্ষি, অক্ষিপুট ও ভ্রূভেদের উল্লেখ আছে। হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তিতে রচিত নাট্যশাস্ত্রগুলিতে ভারতীয় নৃত্যের ব্যাখ্যাই বিশদভাবে করা হইয়াছে। সুতরাং এইগুলি বাহিরের জিনিষ হইতে পারে না। অবশ্য অধুনা শান্তিনিকেতনে কথাকলি নৃত্যের অধ্যাপকদিগের শিক্ষাধারায় এই বাধানিষেধ বিশেষভাবে অনুসৃত হয় না। ভরতনাট্যম্ ও কথকনৃত্য লোকনৃত্যের পর্যায়ে পড়ে না বলিয়াই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ইহাকে গ্রহণ করেন নাই। কারণ নৃত্যের তখন শৈশব অবস্থা। শৈশব অবস্থায় তাহাকে বিশেষ যত্নে পালন করা দরকার. যাহাতে কোন দূষিত বস্তু তাহার অনিষ্ট করিতে না পারে। কারণ চারিদিকে পঙ্কবেষ্টিত পঙ্কজের অবস্থার মত ভরতনাট্যম্ ও কথকের অবস্থা ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে সেই সকল পঙ্কের অপসারণে মালিন্যমুক্ত পঙ্কজগুলি ক্রমশঃ সমাজে ব্যাপক সমাদর লাভ করিতেছে। সুতরাং এখন ইহার গ্রহণে কোন বাধা তো নাই, বরং ইহা রাবীন্দ্রিক পদ্ধতিকে পুষ্ট করিতেছে।

বাংলাদেশে দক্ষিণভারতের ন্যায় শুদ্ধ নৃত্যনাট্যের প্রচলন কোন কালেই ছিল না। যাত্রা বা থিয়েটার প্রভৃতিতে বাচিক অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে গীতের সহিত নৃত্য হইত। রবীন্দ্রনাথ প্রথম চিত্রাঙ্গদা নাটকটিকে সম্পূর্ণভাবে নৃত্যের মাধ্যমে রূপ দিয়া এক বিস্ময়কর সৃষ্টি করেন। ইহাতে তিনি ইউরোপীয় নৃত্যনাট্যের উন্নততর গ্রন্থনাপদ্ধতি গ্রহণ করেন। ইহা বাংলার নৃত্যের ইতিহাসে এক দৃঢ় পদক্ষেপ।

সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি বাঙালী তরুণ তরুণীদিগকে উপযুক্ত নৃত্যশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। শ্রী শান্তিদেব ঘোষ একদা তাঁহার রচনায় লিখিয়াছিলেন যে, "রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নৃত্যশিল্পী ছিলেন না। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদিগকে শুধুমাত্র নৃত্যশিল্পী তৈরী করিবার বাসনাও তাঁহার ছিল না। কিন্তু নৃত্যের ভিতর সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে অন্যান্য কলাবিদ্যার ভিতর নৃত্যকেও গণ্য করা হইত। সেইজন্য তিনি চাহিয়াছিলেন যে, অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার সহিত নৃত্যও শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হইয়া শান্তির প্রলেপ লেপন করুক"। তাঁহার নৃত্যনাট্যগুলির ভিতর যে বিশ্বমানবতার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে তাহা শিক্ষিত সমাজে সাগ্রহে ও সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা প্রথম রাবীন্দ্রিক নৃত্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভিতর নন্দিতা দেবী, শ্রীমতীঠাকুর ও শান্তিদেব ঘোষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

এই সময় নৃত্যের জগতে ভারতের সর্বত্র প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিল। বিশেষ করিয়া শিক্ষিত সমাজেও নৃত্যের প্রচলন হইতে লাগিল। এ বিষয়ে আরও একজন পথিকৃৎ আমাদের পথ দেখাইয়াছিলেন। ইনি হইতেছেন বিশ্ববিশ্রুত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর। উদয়শঙ্কর পাশ্চাত্যে যাইয়া প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন। রূপসজ্জায়, সঙ্গীতে, নৃত্যের আঙ্গিকে, মঞ্চসজ্জায় প্রাচ্যের ভাবধারা যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। ভারতের ভাস্কর্যে যেন প্রাণ সঞ্চার হইল। উদয়শঙ্কর স্বয়ং চিত্রশিল্পী ছিলেন বলিয়া ভারতের চারুকলার উৎসটি কোথায় তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পর্বতগাত্রে খোদিত প্রস্তর মূর্তিগুলির অনুকরণে নৃত্যের রূপসজ্জা রচনা করিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হইতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেন এবং মঞ্চসজ্জায় ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিলেন। পাশ্চাত্য জগৎ ইহা দেখিয়া মুগ্ধ হইল এবং এই নৃত্যই প্রাচ্য (Oriental) নৃত্য বলিয়া পরিচিত হইল। বিদেশীগণ যে ইহাতে কত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন,

তাহা পাশ্চাত্য নর্তকীগণের প্রাচ্যনৃত্য শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। বিদেশী নর্তকী অ্যানাপাভ্‌লোভা উদয়শঙ্করের নায়িকা হইয়া রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে অবতীর্ণ হন। বিদেশী নর্তকী রাগিনীদেবী ভারতে আসিয়া বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় নৃত্য শিক্ষা করেন। বিশেষ করিয়া কথাকলি নৃত্যে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। আমেরিকার নর্তকী লা মেরী ভারতে আসিয়া সাতবৎসর ভারতীয় নৃত্যশিক্ষা করেন। তিনি কথক ও ভরতনাট্যম্‌ নৃত্যে খ্যাতিলাভ করেন। উদয়শঙ্করের বিপুল খ্যাতির মূলে বিদেশী নৃত্যশিল্পী সিমকীর দান অবশ্যই স্বীকার্য। ইহা ব্যতীত জোহরা, উজারা, অমলাশঙ্কর, লক্ষ্মা-শঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর ও রবিশঙ্করের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক কালে অনেক গুণী উদয়শঙ্করের নৃত্যবাসরকে মুখর করিয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবও তাঁহার সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছিলেন। উদয়শঙ্করের নৃত্যে গীতের পরিবর্তে সমবেত যন্ত্র-সঙ্গীতের প্রয়োগ হয়। ইহাও একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ পাশ্চাত্য অর্কেষ্ট্রার অনুকরণে অনেকগুলি বাদ্যযন্ত্র সমবেতভাবে নৃত্যের সহিত সহযোগিতা করিল। এই অর্কেষ্ট্রা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন সুবিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক শ্রীতিমিরবরণ। নৃত্যের সহিত সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত যে সুষ্ঠুভাবে সহযোগিতা করিতে পারে, তাহার প্রথম নিদর্শন তিনিই দিলেন। সঙ্গীত নৃত্যের বৃত্তি বা Moodকে প্রকাশ করিতে বিশেষ সহায়ক হইল।

বাংলাদেশে আধুনিককালে নৃত্য যে পর্যায়ে আসিয়াছে, তাহার পশ্চাতে অনেক কৃতী নৃত্যশিল্পী, প্রযোজক ও যন্ত্রশিল্পীর অবদান আছে। ইহার একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস দেবার চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে বাঙালা ব্যতীত বহিরাগত শিল্পীদিগের অবদানও অস্বীকার করা যায় না।

শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যের অধ্যাপকরূপে শ্রীনবকুমার যোগদান করেন। ইহার পর সেনারিক রাজকুমারও মণিপুরী নৃত্যের

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কথাকলি নৃত্যের অধ্যাপকরূপে শ্রীকেলু নায়ার ও শ্রীবালকৃষ্ণমেননের নাম উল্লেখযোগ্য। রাবীন্দ্রিক নৃত্য-পদ্ধতিকে ইঁহারা আরও সুসংবদ্ধ করেন।

ভারতের নৃত্যজগতে বাঙালী নৃত্যপ্রযোজক শ্রীহরেন ঘোষের দান অনস্বীকার্য। তিনি ভারতের বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগকে কলিকাতার দর্শকদিগের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি ১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদিগের দ্বারা কলিকাতায় নৃত্যপ্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩০, ১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে উদয়-শঙ্কর কর্তৃক নৃত্যোৎসবের আয়োজন করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বালা সরস্বতীকে, ১৯৩৪ ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মায়া টাক্কিকে ও বার্মার 'পোয়ে' নৃত্যদলকে, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এনাক্ষী রমা রাওকে, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে 'ছউ' নৃত্য সম্প্রদায়কে কলিকাতায় আনয়ন করিয়া নৃত্যপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সাধনা বোস, মণিপুরী নৃত্য-সম্প্রদায় ও রুক্মিণীদেবী হরেন ঘোষের প্রযোজনায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করেন। তৎকালীন কুশলী চিত্রাভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী সাধনা বোস মার্গনৃত্যকে পরিহার করিয়া ছোট ছোট কাহিনীকে নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়ণের চেষ্টা করেন। ইহা ব্যতীত বাচিক অভিনয়ে তিনি নৃত্যের সংযোজন করিয়া তাহা মঞ্চস্থ করেন। সমকালীন নৃত্যশিল্পী ও চিত্রাভিনেত্রা লীলাদেশাইয়ের নামও বাংলার নৃত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের পূর্বে শ্রীমণিবর্ধন অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের লইয়া নৃত্য-বাসরের আয়োজন করেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত শ্রীবুলবুল চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের পরবর্তীকাল হইতে বাংলার নৃত্য-শিল্পীগণ ব্যাপকভাবে বাংলার বাহিরে যাইয়াও নৃত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আঙ্গিকের দিক হইতে নৃত্য পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। বহু বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া অগ্রসর

হইয়া নৃত্যকে পথ করিয়া লইতে হইতেছিল। শ্রীসমর ঘোষ এই সময় একটি দল গঠন করিয়া বাংলা ও ভারতের বিভিন্নস্থানে নৃত্য প্রদর্শন করিতেছিলেন। ইহাতে সঙ্গীত পরিচালকরূপে শ্রীরবি রায় চৌধুরী সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বহিরাগতদিগের ভিতর ব্রজবাসী সিংহ ও গোপাল পিল্লাই যথাক্রমে মণিপুরী ও কথাকলি নৃত্যের শিক্ষা দিয়া কলিকাতার আসর জমাইয়া তোলেন। মেনকাদেবী, রামগোপাল প্রভৃতি শিল্পীগণ তাঁহাদের নৃত্য প্রদর্শনের দ্বারা কলিকাতার রসিক সমাজের অন্তর জয় করিলেন। কলিকাতার সঙ্গীত সম্মিলনীতেও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে খ্যাতনামা শিল্পীগণ যোগদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে কলিকাতাবাসীগণ ভারতের বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। বিখ্যাত কথক-নৃত্যশিল্পী শম্ভু মহারাজ কলিকাতায় কথক নৃত্যের প্রকৃত রূপটি প্রদর্শন করেন। জয়পুর ঘরানার প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী সোহনলাল এই সময় কলিকাতায় আসেন। তিনি ঝর্ণা সাহা ও বেলা অর্ণবকে কথকনৃত্যে পারদর্শী করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, বাঙ্গালী মেয়েরাও সর্বপ্রকার নৃত্য করিতে সমর্থ। লক্ষ্মৌ ঘরানার দিক্‌পাল শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ঝণ্ডে খাঁ তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রতিভা লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। অনেকে তাঁহার নিকট শিক্ষা লইতে থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালীদের ভরতনাট্যম্ নৃত্যে শিক্ষাগ্রহণ করিবার সুযোগ তখনও আসে নাই।

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে পরাধানতার গ্লানি শিল্পীদিগের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য জনসাধারণের সহিত তাঁহাদেরও প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। এই সময় কতকগুলি স্বাধীনতামূলক নৃত্যনাট্য রচিত হয়। তাহাদের মধ্যে Discovery of India, My country, অভ্যুদয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। Discovery of India যদিও বোম্বাই প্রদেশের অবদান, তথাপি ইহাতে বহু প্রতিভাবান বাঙ্গালী

শিল্পী ছিলেন। শিল্পীদিগের ভিতর অনেকেই উদয় শঙ্করের দলভুক্ত ছিলেন।

এই সময়ে নৃত্যে একটি পরিবর্তন দেখা দেয়। নৃত্যের প্রত্যেকটি গতিভঙ্গী, পদবিক্ষেপ ও ভাবাভিনয়ের সহিত সুরের আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য বিধান করিয়া সঙ্গীতের সৃষ্টি হইতে লাগিল। নৃত্য যেন সঙ্গীতের সাহায্যে আরও মুখর হইয়া উঠিল। নৃত্যের সহিত স্বরবিন্যাসের এইরূপ সামঞ্জস্য করিয়া নূতনত্বের সৃষ্টি করেন শ্রীরবি রায় চৌধুরী। নৃত্যনাট্যে সৌন্দর্যবর্ধনে আমরা আরও একজনের দান অস্বীকার করিতে পারিনা। আশ্চর্যজনকভাবে আলোকসম্পাত করিয়া নৃত্যের সৌন্দর্য শতগুণ বর্ধিত করেন শ্রীতাপস সেন। তাঁহার পূর্বে রঙ্গমঞ্চে ঠিক এই ধরণের উন্নততর আলোকসম্পাত হইত না। তাপসসেনের পরবর্তীকালে অনেকে এই বিষয়ে দক্ষতা দেখাইয়াছেন; কিন্তু পথিকৃৎ রূপে তাঁহার নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়।

অভ্যুদয় নৃত্যনাট্যে অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিক, নৃত্যশিল্পী, ও সঙ্গীতশিল্পী যোগদান করিয়াছিলেন। সকলের মিলিত চেষ্টায় 'অভ্যুদয়' অদ্ভুত সফলতা লাভ করিয়াছিল। ইহাতে কয়েকটি নৃত্য ব্যতীত শ্রীপ্রহ্লাদ দাস সামগ্রিকভাবে নৃত্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল শ্রীসুকৃতি সেনের উপর এবং গ্রন্থনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ সান্যাল। ইহাতে উচ্চাঙ্গের নৃত্য অথবা সঙ্গীতের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সেইদিক দিয়া ইহা বিচার্য নহে। কিন্তু ইহার দেশাত্মবোধক অনুভূতি সেই যুগে প্রত্যেক শিল্পীকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল এবং দর্শকদিগের ভিতরও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

'আমার দেশ' নামক নৃত্যনাট্যটির নৃত্যপরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব যথাক্রমে শ্রীঅতীন লাল ও শ্রীরবি রায় চৌধুরীর উপর ন্যস্ত ছিল। ইহা একটি সার্থক দেশাত্মবোধক নৃত্যনাট্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ইহাতে নৃত্যকৌশল অপেক্ষা নাটকের

ভাবপরিবেশ (Temperament)-এর উপর অধিক দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। সেই পরাধীনতার যুগে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্য সহজেই দেশাত্মবোধক নৃত্য-নাট্যগুলি দর্শকের অন্তর স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল। ইহাকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য মণিশঙ্কর ও প্রভাত ঘোষের উত্তম উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে সমগ্র ভারতে নৃত্যনাট্য রচনায় একটি অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে বাংলা অগ্রণী ছিল। একমাত্র বাংলাদেশই নৃত্যকে নূতন ভাবধারায় উদ্দীপ্ত করিয়া, সনাতন নৃত্যের বন্ধন ভাঙ্গিয়া, তাহাকে যুগোপযোগী ভাবে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় অপরূপ করিয়া যখন বিশ্বসভায় উপস্থিত করিল, তখন তাহার মনোমুগ্ধকর রূপের ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইল। ইহাতে নৃত্যশিল্পীর স্বাধীনতা বহুগুণ বর্ধিত হইল। কারণ, সনাতন নৃত্যগুলিকে নাটকের চরিত্র, কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তন করা হইতে লাগিল। অর্থাৎ এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, নৃত্যের মধ্যে মিশ্রণ সুরু হইল এবং ইহাই আধুনিক নৃত্যে একটি বৈশিষ্ট্য দান করিল। ইহাতে সুফলের সহিত কুফলও দেখা দিতে লাগিল। কারণ, নৃত্যনাট্য পরিচালনা করিতে হইলে মার্গনৃত্যগুলির উপরও পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই, তাহা না হইলে পরিমাণবোধ আসে না এবং এই বোধ না থাকিলে উচ্চস্তরের নৃত্যনাট্য রচনা করাও সম্ভব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নৃত্যপরিচালক নৃত্যের কুশলতা প্রদর্শনের অতি উৎসাহে নাটকের রসটিকে (Mood) নষ্ট করেন; অথবা নাটকের Mood রাখিতে যাইয়া উহাকে ভাবাভিনয়ে পরিণত করেন। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানের উপরই নৃত্যনাট্যের সফলতা নির্ভর করে। অনেকে এই মিশ্রণকে ভাল চক্ষে দেখেন না। তাঁহাদের মতে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির মার্গনৃত্যকে অবলম্বন করিয়া নৃত্যনাট্য রচনা করা উচিত। তাহা না হইলে নৃত্যের কৌলিন্য রক্ষা করা যায় না। ইহাও ভাবিবার বিষয়। কিন্তু মিশ্রণ তো কালের

প্রবাহে অগোচরে সকল নৃত্যশৈলীর ভিতরই আসিয়া পড়িয়াছে। আধুনিক যুগে আমাদের ভিতর প্রাদেশিকতা বোধ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমরা আমাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছি। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের নামে আমরা অজ্ঞাতসারে সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতেছি কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বৈশিষ্ট্য ও সঙ্কীর্ণতা এক জাতীয় নহে। আমরা যখন মার্গ নৃত্যের বিশেষ বিশেষ শৈলীতে নাচিব, তখন তাহার বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু আমরা যদি নৃত্যনাট্যের ভিতর মিশ্রণ করি, তখন তাহাকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে বইকি? দেড়শত বৎসর পূর্বে ভরতনাট্যম্, কথক, কথাকলি ও মণিপুরী নৃত্যের যে আঙ্গিক ছিল, এখনও কি তাহাই আছে? যুগধর্মের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে কি তাহারও পরিবর্তন হয় নাই? সুতরাং এই মিশ্রণ ও পরিবর্তনকে আমরা সুস্থমনে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না কেন? আমরা যাহা লইতেছি তাহা তো ভারতেরই সামগ্রী। আমরা অন্যের দ্বারস্থ হইয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছি না। দুই বা ততোধিক মৌলিক উপাদানে রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন কোন রাসায়নিক দ্রব্যের উৎকর্ষ অথবা গুরুত্ব কোন মৌলিক উপাদান হইতে কম নহে।

আধুনিক নৃত্যনাট্যে আঙ্গিক, বাচিক এবং আহার্য তিনপ্রকার অভিনয়েরই আশ্রয় লওয়া হয়। এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের মতে নৃত্যাভিনয়ে নেপথ্যে বাচিক অভিনয় অথবা গীতের কোন প্রয়োজনই হয় না। কারণ নৃত্যকে বলা হইয়াছে Gesture of Language. ইহা খুবই সত্য। তবু বলি নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে সৌন্দর্য সৃষ্টি। এই সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে গীতের প্রয়োজন আছে বই কি। গীতের কাব্যিক ভাষা ও ভাষার সহিত সুরের ইন্দ্রজাল নৃত্যের ভাব প্রকাশের বিশেষ সহায়ক। অনেক সময় যেমন ভারী জিনিষ উঠাইতে হইলে অপরের একটু সাহায্যেই তাহা সম্ভবপর হয়; নৃত্যেও সেইরূপ গভীর তত্ত্বমূলক গূঢ় অর্থ প্রকাশে

সঙ্গীতের কিঞ্চিৎ সাহচর্য বিশেষ সহায়তা করে। বিশেষ করিয়া ভারতীয় নৃত্য হইতেছে দর্শনভিত্তিক। এইজন্য অনেক সময় abstract ভাব (নির্বস্তু) শুধুমাত্র আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না। বরং অর্থের জটিলতা আঙ্গিক অভিনয়ের সহিত নেপথ্যে দুই একটি শব্দের সাহায্যেই অতি সরল হইয়া ওঠে। কিন্তু একটি বিষয়ে সর্বদা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, ভাষার প্রয়োগ প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হইয়া পড়ে। ইহার কার্য হইতেছে সকলের অলক্ষ্যে কেবলমাত্র সৌন্দর্যের সহায়ক হইয়া স্নিগ্ধ ও মৃদু সৌরভের ন্যায় সানন্দ রসানুভূতি সৃষ্টি করিয়া আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন রাখা।

এখন, মঞ্চসজ্জা নৃত্যনাট্যে প্রয়োজন কি না, ইহাও বিচার্য বিষয়। বহু প্রাচীনকালে নাটক প্রভৃতি অভিনীত হইবার সময় যুগধর্ম অনুসারে মঞ্চসজ্জার যে রীতি ছিল, তাহা আমরা নাট্যশাস্ত্রে পাই। কিন্তু মধ্যযুগে রঙ্গমঞ্চ অথবা মঞ্চসজ্জা বলিয়া কোন বস্তুই ছিল না। তখন শিল্পীদিগকে আসরের মধ্যস্থলে অভিনয় করিতে হইত। দর্শকগণও চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া বসিতেন। দর্শক ও শিল্পীগণের ভিতর কোন ব্যবধান ছিল না। শিল্পীগণও তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের দোষত্রুটি লইয়া দর্শকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। দর্শকগণ ইহাতে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া নাটকের চরিত্রগুলি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইত না। কিন্তু এখন যুগের সহিত রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। ইংরাজদিগের কৃপায় ইংরাজী শিক্ষায় ও ইংরাজী ভাবধারায় আমরা ভাবিত হইয়াছি। ইহার সুফল ও কুফল দুইই ভোগ করিতেছি। প্রাচ্য চিরকালই আদর্শবাদী। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা বাস্তববাদী হইয়া উঠিতেছি। তাহার ফলে শিল্পে ও নাট্যেও বাস্তবতার স্পর্শ লাগিয়াছে। আধুনিককালে নৃত্যনাট্য অথবা নাটকগুলি বাস্তবমুখী হইয়া উঠিতেছে। ইহাকে বাস্তবমুখী করিবার জন্য সেইরূপ পরিবেশ সৃষ্টি প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে মঞ্চসজ্জারও প্রয়োজন হয়।

এখন শিল্পী ও দর্শকদিগের ভিতর একটি গভীর ব্যবধান রচিত হইয়াছে। মঞ্চের সম্মুখস্থ পর্দাটি এই ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ব্যবধানের জন্যই চরিত্রগুলি দর্শকদিগকে পূর্বপ্রস্তুতির সুযোগ না দিয়া দর্শকদিগের সম্মুখে একটি বিস্ময় লইয়া আবির্ভূত হয়। মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আবহসঙ্গীত নাটকের পরিবেশ রচনায় সহায়তা করে। চরিত্রগুলির পর্দার আড়াল হইতে আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সর্বক্ষণই একটি কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া রাখে।

নৃত্যনাট্য ও নাটকের বিষয়বস্তুর ভিতর একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নাটকের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ বস্তুতান্ত্রিক হয় এবং তাহাতে গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি বিষয় প্রকাশ করা সম্ভব হয়। কিন্তু নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ কল্পনাশ্রয়ী হয়। নাটকে স্থান, কাল, পাত্রের জন্য মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন হয়। নৃত্যনাট্যে মঞ্চসজ্জার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিলেও চলে। অবশ্য আধুনিক কালে নৃত্যনাট্যে মঞ্চসজ্জা একটি স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে। নৃত্যনাট্যে মঞ্চসজ্জা Suggestive (ব্যঞ্জনাপূর্ণ) হইলেও চলে। বৃহৎ এবং ভারী মঞ্চসজ্জা নৃত্যনাট্যে উপযোগী নহে। কারণ ইহা মঞ্চের অনেকখানি অধিকার করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, অতিরিক্ত মঞ্চসজ্জার প্রভাবে দর্শকের দৃষ্টি ব্যাহত হইলে নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা গৌণ হইয়া পড়ে। শিল্পীর অঙ্গের সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলি সম্যক-দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার ফলে রসহানি হয়। নৃত্য করিবার সময় মঞ্চে স্থানেরও অভাব হইয়া পড়ে। সুতরাং নৃত্যনাট্য যখন মঞ্চস্থ করা হয়, তখন সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহা মঞ্চস্থ করা বাঞ্ছনীয়।

অনেকে মনে করেন, নৃত্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রচারধর্মী হওয়া উচিত। তাহা না হইলে, ইহার কোন সার্থকতা নাই। ইহা আংশিক সত্য। কিন্তু যখনই ইহা দলগত প্রচারধর্মী হইয়া পড়ে, তখন ইহার সার্বজনীন আবেদনটি ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ, ইহা তখন

সীমাবদ্ধ কাল ও স্থানের ভিতর আবদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রচারের উপরই তখন অধিক দৃষ্টি থাকে। কিন্তু কোন আর্টই কালজয়ী হয় না, যদি তাহার ভিতর সার্বজনীন আবেদনটি না থাকে। এ্যানা পাভলোভার 'মৃত্যুমুখী হংসী' (dying swan) অথবা ইসাডোরা ডানকানের 'নীল দানিউব' নৃত্যগুলি সর্বদেশের, সর্বকালের। তাহা কালজয়ী ও জাতি-ধর্মনির্বিশেষে রসিকচিত্তজয়ী। তাহা যুগধর্মকে আশ্রয় করিতে যাইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে নাই।

এই অধ্যায়ে যাহা আলোচিত হইল, তাহা বাংলার আধুনিক নৃত্যের উৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থা। ইহা আমার জীবনের আবাল্য সঞ্চিত বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি চিত্র বলা যাইতে পারে। হয় তো, আমার জ্ঞানের পরিধির বাহিরে এই বিষয়ে অন্যান্য শিল্পীর অবদানও থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের অনুল্লেখ ইচ্ছাকৃত নহে। যাহা হউক, ভবিষ্যতে অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষণের দ্বারা বাংলার আধুনিক নৃত্যকলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া পূর্ণতর রূপদানের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব ভবিষ্যৎ শিল্পীগণের উপর ন্যস্ত থাকিল।

—০—

পরিশিষ্ট

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় নৃত্যগুলির সংস্কার করা হইয়াছে। যাহা অব্যবহার্য ছিল, বিস্মৃতির অতলে ছিল, তাহাকে পরিমার্জিত ও শোধিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত ভারতের চারটি অঞ্চলের নৃত্যকে (কথক, মণিপুরী, ভরতনাট্যম্ ও কথাকলি) আমরা 'ক্লাসিক্যাল্' অথবা প্রাচীন নৃত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই চারিটি নৃত্য ব্যতীত আরও একটি নৃত্যের ধারা ইদানীং পরিচিত হইতেছে এবং ক্ল্যাসিক্যালের ভিতর স্থান করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই নৃত্যধারাটি হইতেছে 'ওড়িষী' নৃত্য। উড়িষ্যার দেবদাসীগণের ভিতর ইহা প্রচলিত ছিল এবং এই কলা-কৌশল প্রয়োগের একটি পদ্ধতিও আছে। অবশ্য এই নৃত্যটি এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় নাই। ইহা বহু প্রাচীন বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ মনে করিয়া থাকেন। উড়িষ্যার রাজগণ একসময় 'মাহারী'গণের নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে খারবেলের সময় হইতে ষোড়শ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রের রাজত্বকাল পর্যন্ত 'মাহারী'গণের নৃত্য প্রচলিত ছিল। ইহার পর উড়িষ্যার নৃত্যের আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। কিন্তু কয়েকবৎসর হইল এই 'ওড়িষী' নৃত্যের পুনর্জাগরণ হইয়াছে। চার্লস্ ফেব্রী বলেন, তিনি এই নৃত্যকে প্রথম লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে আনিয়া সকলের নিকট ক্ল্যাসিক্যাল্ নৃত্য বলিয়া পরিচিত করেন। তাঁহার মতে ভরতনাট্যম্ ও কুচিপদীর সহিত ইহার গভীর সাদৃশ্য আছে। থাকাই স্বাভাবিক। কারণ যে সকল নৃত্য হিন্দু নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নহে। বৃত্তি হিসাবে হয় ত সামান্য বৈষম্য থাকিতে পারে। ওড়িষী নৃত্যের সঙ্গীত কিন্তু উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকে অনুসরণ করে। নৃত্যের ভিতরও ভ্রমরী প্রভৃতিতে

মনে হয় উত্তর ভারতীয় নৃত্যের স্পর্শ আছে। ইহার কারণ অনুমান করা কঠিন নহে। উড়িষ্যা হইতেছে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের সংযোগস্থল। সুতরাং ইহাতে দুইটি অঞ্চলের প্রভাবই পড়িবে। শুধু তাহাই নহে, ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যা পাঠান-মোগলের অধিকারে আসে। সুতরাং উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের সহিত ইহার মিশ্রণ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

ওড়িষী নৃত্য কতকগুলি বিশেষ শাস্ত্রকে অনুসরণ করে। এইগুলি হইতেছে নাট্যমনোরমা, সঙ্গীত নারায়ণ, সঙ্গীত কল্পলতা, সঙ্গীত দামোদর, সঙ্গীত অভিনয় দর্পণ এবং গীতপ্রকাশ। ওড়িষী নৃত্যের হস্তভেদগুলির গুরুত্ব ভরতনাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যের হস্ত ভেদের গুরুত্ব অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। উপরি-উক্ত নাট্যশাস্ত্রগুলি ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হইলেও তাহাতে উড়িষ্যার নিজস্ব কতকগুলি পদ্ধতির উল্লেখ আছে। 'অভিনয়চন্দ্রিকা' নামে আরও একটি নাট্যশাস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনয় দর্পণের অসংযুত হস্তের ভিতর ২৪টি ওড়িষী নৃত্যে প্রচলিত আছে। অনেকগুলির প্রয়োগরীতি এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। অভিনয় চন্দ্রিকাতে কতকগুলি হস্তভেদের পরিচয় আছে।

ওড়িষী নৃত্যে কতকগুলি আঙ্গিক রীতি আছে; যথা—উঠ, বৈঠ, স্থানক, চালি, বুরুহা, ভাস, ভউনরী, পালি। এইগুলির সমষ্টিকে 'বোল' বলা হয়। উৎপ্লবনকে 'উঠ' বলা হয়। উপবেশনকে 'বৈঠ' বলা হয়। 'স্থানক' হইতেছে দাঁড়াইবার ভঙ্গী। 'চালি' হইতেছে গতি। 'বুরুহা'র অর্থ হইতেছে হস্ত ও পদের তীব্র গতি। 'ভাস'তে শিল্পী সম্মুখে ও পশ্চাতে, বামে ও দক্ষিণে দেহকে ধীরে ধীরে দোলাইতে থাকেন এবং তাহার সহিত হাত দুইটি সাঁতার কাটিবার মত ভঙ্গীতে আন্দোলিত করেন।

ভ্রমরীকে 'ভউনরী' বলা হয়। একটি নৃত্যাংশ শেষ করিয়া অপর অংশ আরম্ভ করিবার পূর্বে নর্তক যখন পদবিক্ষেপ পূর্বক

ভঙ্গীসহকারে পশ্চাতে গমন করেন, তখন তাহাকে 'পালি' বলা হয়।

নৃত্তাংশের মৌলিক অবস্থানকে 'ভঙ্গী' বলা হয়। এইখানে কতকগুলি ভঙ্গীর নাম করা যাইতে পারে—স্থায়ী, চৌকা, চির, লখা, নটবর, বৈঠী। ওড়িষী নৃত্যে অধস্তন করণগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়—নিবেদন, প্রণতা, উত্তোলিতা, বিরাজ, আকুঞ্চন, সংরক্ষণ, গোপন, অভিমান, কুঞ্জরবক্ত্র, তরঙ্গ, নিকুঞ্চন, মর্দন, আরত্রিকা, সগদীয়া। ওড়িষী নৃত্যের কয়েকটি অংশ আছে; যথা—ভূমি, প্রণাম, বিঘ্নরাজ পূজা, বটু নৃত্য, ইষ্টদেব বন্দনা, স্বরপল্লবী, সাভিনয় ও তারিঝম্।

ভূমি প্রণাম অথবা মঙ্গলাচরণে নর্তক সমস্থানকে দণ্ডায়মান হন। ইহার পর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী করিয়া 'উকুট্ট' অর্থাৎ বোলের সহিত ভূমিকে প্রণাম করেন। ইহার পর বিঘ্নেশ্বরের নামে মঙ্গলাচরণ হয় এবং নৃত্যশিল্পী কখনও কখনও নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা তাহার অর্থ ব্যক্ত করেন। এই অংশটিকে 'বিঘ্নরাজ' বলা হয়।

পরবর্তী অংশ হইতেছে বটু নৃত্য। ইহাতে বটুকেশ্বর অর্থাৎ মহাদেবের সম্মানার্থে নৃত্য করা হয়। ইহাতে নৃত্য ও নৃত্তের সমানভাবে প্রয়োগ থাকে। বটুনৃত্যের শেষাংশে বন্দনা থাকে। ইহাকে 'মোক্ষনট'ও বলা হয়।

'ইষ্টদেব' বন্দনাতে ইষ্টদেবকে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। শ্লোক অথবা গীতের সাহায্যে এই নৃত্যাভিনয় করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় এই শ্লোক অথবা গীতিগুলি রচিত হয়।

'স্বরপল্লবী' নৃত্যে নৃত্য ও নৃত্ত উভয়েরই প্রয়োগ থাকে। স্বরপল্লবীর অর্থ হইতেছে 'ব্যাখ্যা'। আলাপের সহিত নৃত্যের আরম্ভ হয়। এইরূপে রাগের স্বরূপটি প্রকাশ পায়। ইহাতে সঙ্গীতাংশের প্রাধান্য থাকে এবং ইহাতে শিল্পী স্বয়ং গান করেন। আলাপের সহিত চক্ষু ও জ্রর চালনা করেন। ইহাকে 'নখী' বলে।

অতঃপর কতকগুলি ভঙ্গী প্রদর্শনের পর নৃত্ত সুরু হয়। এই নৃত্ত দুই প্রকারে করা হয়—স্বরপল্লবী এবং বাদ্য অথবা তালপল্লবী। স্বরপল্লবীতে রাগের প্রাধান্য এবং বাদ্যপল্লবাতে তালের প্রাধান্য থাকে।

'সাভিনয় নৃত্যে' সাহিত্য ও অভিনয়কে সমান প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইহাতে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য থাকে। সাভিনয় নৃত্যের শেষাংশকে 'তারিঝম্' বলা হয়। ইহাতে সম্পূর্ণভাবে নৃত্তের প্রাধান্য থাকে এই নৃত্য 'ঝুলা' অথবা 'পহপত' তালে দ্রুত লয়ে করা হইয়া থাকে। ইহাকে 'আনন্দ নৃত্য' অথবা 'নটঙ্গী' বলা হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। নাট্যশাস্ত্র—অভিনব গুপ্তের টীকাসহ (Gaekwad's oriental series) Vol. No. I & II.

২। অভিনয় দর্পণ—শ্রী অশোকনাথ শাস্ত্রী

৩। সঙ্গীত রত্নাকর—শার্ঙ্গদেব রচিত কল্লিনাথের টীকাসহ (দ্বিতীয় ভাগ)

৪। সাহিত্য দর্পণ—শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ

৫। সঙ্গীত মকরন্দ—নারদ (edited by Ramkrishna Telang)

৬। সঙ্গীত পারিজাত—শ্রী অহোবল পণ্ডিত (ভাষ্য—শ্রী কলিন্দজী)

৭। সঙ্গীত দর্পণ—চতুর দামোদর পণ্ডিত

৮। সঙ্গীত দামোদর—শুভঙ্কর

৯। শ্রী শ্রী উজ্জ্বল নীলমণি—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী (শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সম্পাদিত)

১০। বিদগ্ধ মাধব—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী (শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত)

১১। পদ্মপুরাণ (ভূমিখণ্ড)—শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত

১২। দত্তিলম্—দত্তিল

১৩। বিষ্ণু পুরাণ—শ্রী পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত

১৪। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ— ঐ

১৫। বাচস্পত্যভিধান—তারানাথ ভট্টাচার্য।

১৬। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমন্বিত (দশম স্কন্ধ)

১৭। মহাভারত—সংস্কৃত মূল (হিন্দী অনুবাদ গীতাপ্রেস, গোরখপুর)

১৮। মনুসংহিতা - শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত।

১৯। কথাসরিৎ সাগর—সোমদেব

২০। বৈষ্ণব পদাবলী—সাহিত্যরত্ন শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২১। ভারতের সংস্কৃতি—শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন

২২। পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি—শ্রী বিনয় ঘোষ

২৩। বাদশাহী আমল—শ্রী বিনয় ঘোষ

২৪। দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা—শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৫। ভারত সংস্কৃতি—ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
২৬। পৃথিবীর ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী
২৭। রবীন্দ্র রচনাবলী—(জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)
২৮। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—(উদ্বোধন কার্যালয়)
২৯। ভারতকোষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
৩০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রী সুকুমার সেন
৩১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ চন্দ্র সেন
৩২। বাংলার ইতিহাস—রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৩। বাংলার লোকসাহিত্য—শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য।
৩৪। অমিয় নিমাই চরিত—শিশির কুমার ঘোষ
৩৫। গৌড়ের ইতিহাস—শ্রী রজনী কান্ত চক্রবর্তী (১ম খণ্ড)
৩৬। মণিপুরের ইতিহাস—শ্রীমুকুন্দলাল চৌধুরী
৩৭। মণিপুর প্রহেলিকা—শ্রীজানকী নাথ বসাক
৩৮। নাটক ও নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ—৺ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য
৩৯। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা—ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য
৪০। নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ—ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য
৪১। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—প্রজ্ঞানন্দ স্বামী
৪২। রাগ ও রূপ—প্রজ্ঞানন্দ স্বামী
৪৩। বঙ্গশ্রী—(আশ্বিন ১৩২৮)
৪৪। গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
৪৫। ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ—শ্রীসুবোধ নন্দী
৪৬। Natyasastra—Translated by Manomohan Ghose.
৪৭। The Art of Indian Asia—Henrich Zimmer.
৪৮। A Book of Indian culture—D. S. Sarma
৪৯। Number of Rasas.—V. Raghavan.
৫০। A istory of fine art in India and Ceylon—V. A. Smith.
৫১। What is Art and Essays on Art—Leo Tolstoi.
৫২। Bhoja's Sringara Prakash—V. Raghavan.
৫৩। The Dance in India—Faubion Bowers.

৫৪। A History of South India—Nilkanta Sastri (second edition)
৫৫। A short History of the Muslim Rule in India—Ishwariprasad.
৫৬। Gateway to the Dance—Ruby Ginner.
৫৭। Dictionary of Thoughts—Tryon Edwards
৫৮। Transformation of Nature in Art—A. k. Coomar-Swamy
৫৯। Dances of Shiva—A. k. Coomarswamy.
৬০। Studies In Indian Antiquities—Hemchandra Roy Choudhury.
৬১। A Comprehensive History of India—Nilkanta Sastri.
৬২। Children's Encyclopedia—Originated and Edited by Arthar Mee Vol. IX
৬৩। On the Art of the Theatre—Edward Gordon Craig.
৬৪। Dance of India—Projesh Banerjee.
৬৫। The Folk Dances of Bengal—Gurusaday Datta.
৬৬। Classical Dances and Costume of India—Kay Ambrose
৬৭। The Art of Hindu Dance—Manjulika Bhaduri and Santosh Chatterjee.
৬৮। The Brief Description of the Manipuri Dance—Pandit Atambapu Sarma
৬৯। Nritta Manjari—Leela Row.
৭০। Manipuri Dances—Leela Row Dayal.
৭১। World Costumes—Angela Bradshaw
৭২। A History of Indian Dress—Dr. Charles Fabri.
৭৩। Costumes and Textiles of India—Jamila Brij Bhusan

৭৪। Parsian Miniatures—Basil Gray.
৭৫। Kathakali—K. Bharatha Iyer.
৭৬। The Art of kathakali—G. A. C. Pandeya.
৭৭। Bharat Natya and other Dances of Tamilnad—E. Krishna Iyer.
৭৮। Advanced History of India—R. C. Mazumdar.
৭৯। The Oxford Students History of India—V. A Smith
৮০। Language of Kathakali—Premkumar.
৮১। কথাকলি নৃত্যকলা (হিন্দী)—গায়নাচার্য অবিনাশ চন্দ্র পাণ্ডে
৮২। নৃত্যকলা বিজ্ঞান (হিন্দী)—বদ্রীপ্রসাদ শুক্ল
৮৩। নৃত্যঅঙ্ক (হিন্দী)—সঙ্গীত কার্যালয়, হাথরাস্
৮৪। রাজস্থান কী জাতিয়াঁ (হিন্দী)—বজরঙ্গলাল লোহিয়া
৮৫। নারী কা রূপশৃঙ্গার (হিন্দী)—সাবিত্রী দেবী বর্মা
৮৬। কথক নৃত্য (হিন্দী)—লক্ষ্মী নারায়ণ গর্গ
৮৭। হমারী নাট্যপরম্পরা (হিন্দী)—শ্রীকৃষ্ণ দাস।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠাঙ্ক
অন্তগিরি	অস্তগিরি	১১, ১৩ পৃ
ওতঃপ্রোতভাবে	ওতপ্রোতভাবে	১৪ পৃ
অন্ধ	অন্ধ্র	১৫ পৃ
সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ	৩৩ পৃ
বৈষ্ণবধর্ম্মের	বৈষ্ণবধর্মের	৩৫ পৃ
মৈথী	মৈতৈ	৩৭ পৃঃ
গুণাবলী	গুণাবলী	৩৮ পৃঃ
কতৃক	কর্তৃক	৪৯ পৃঃ
যথন	যখন	৫১ পৃঃ
আর্ব	আর্য	৫১, ৫৩, ৫৪ পৃঃ
শুধূই	শুধুই	৫১ পৃঃ
খৃঃ পূঃ ৪০০	খৃঃ পূঃ ৫০০	৫৩ পৃঃ
শৈলুষিক	শৈলুষিক	৫৪ পৃঃ
খৃঃ ২০০ অব্দে রচিত পূঃ	খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দে রচিত	৫৫ পৃঃ
মনূর	মনুর	৫৫ পৃঃ
সংযমী	সংযমী	১০২ পৃঃ
যন্ত্রের দ্বারা	শরীরের দ্বারা	১১৮ পৃঃ
1000IXX	1000IXIX	১৬৯ পৃঃ
পরিবতন	পরিবর্তন	১৯২ পৃঃ
ত্রিপুর তাণ্ডব	উমা তাণ্ডব	২৫৭ পৃঃ
সম্পূরণ	সম্পূরণ	৩৪২ পৃঃ
আভাষ	আভাস	২৮৪ পৃঃ